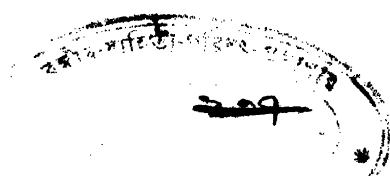


কুশদহ

সচিত্র মাসিক পত্র

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত

সপ্তম বর্ষ

১৩২২ সাল

কার্য্যালয়—২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

১৩২২ সালের বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

চিত্র-সূচী

ত্রিবর্ণে মুদ্রিত

একবর্ণে মুদ্রিত



মাতৃ সন্নিধানে ধ্রুব

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস অঙ্কিত ও চিত্রাধিকারী—
—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুমতিক্রমে।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"তোমারি নামে ফুটেছে ফুল,
গন্ধে প্রাণ করেছে আকুল,
যতনে গাঁথিয়া এনেছি মালা
আদর ক'রে একবার পরনা।"

সপ্তম বর্ষ, } বৈশাখ, ১৩২২ { প্রথম সংখ্যা

প্রারম্ভে

প্রভু পরমেশ্বর! তুমি সত্য—জীবন্ত জাগ্রত সত্য। তোমাকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু অন্তর্চক্ষে তোমার অনুভূতি হয়—অন্তঃকরণের মধ্যে তোমাকে বোঝা যায়। মানুষ বলে, তুমি অসীম অনন্ত, তোমাকে আমরা কিরূপে বুঝিব? সত্যই তুমি অসীম অপার—কিন্তু মিছিরির পর্ব্বত লইয়া পিপীলিকা কি করিবে, একদানাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। আমরা তোমার একবিন্দু ভাব—তোমার স্বরূপের একটু আভাস পাইলেই কৃতার্থ হইয়া যাই। তুমি যে করুণাময়—প্রেমময়! তুমি আমাদিগকে ভালবাস—কৃপা কর। তোমার ভালবাসার আকর্ষণে আমরা তোমাকে জানিয়া কৃতার্থ হই। তোমাকে জানিলে অন্তরাত্মা সুশীতল হয়। তবে যে মানুষ সহজে তোমাকে জানিতে চায় না, বা জানিতে পারে না কেন, এইটিই গভীর রহস্য! মনে হয়, মানুষ আগে সামান্য বস্তুই চায়। তুমি মহদ্বস্তু দুর্লভধন। অগভীর-চিত্ত তোমাকে চায় না, তাই পায় না। তুমি জীবাত্মা মানুষকে জড় দেহে সৃষ্টি করিয়া এই জগতকর্ম্ম-ক্ষেত্রে—পরীক্ষাক্ষেত্রে পাঠিয়েছ। জড় চৈতন্য মিশ্র মহাপরীক্ষাময় মানব জীবন, অগভীরতা হইতে ক্রমে গভীরতার দিকেই যাইতেছে মানব জীবনে একদিন তোমার মহিমার জয় হইবেই।

আজ তোমার কৃপা-বায়ুস্পর্শে আবার উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আজ নববর্ষে নবজীবনের আশায় তোমার কৃপা-ভিক্ষা করিতেছি। প্রভু আজ দুইটি বরদান কর। প্রথম,—যেন তোমার কৃপায় সম্বৎসরের সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারি। দ্বিতীয়,—যে জন্যে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছ, সে কার্য্য যেন জয়যুক্ত হয়। ইহা দ্বারা দেশের—জন্মভূমির যেন কল্যাণ হয়। ইহাই তোমার চরণে বিনীত নিবেদন।

আনন্দ স্বরূপ

মানুষ বলে "ভগবান্ এই জগতে মানুষকে এত দুঃখকষ্টের ভিতর কেন পাঠাইয়াছেন! এতে মানব-জীবনের সার্থকতা কি?" বাস্তবিক জগৎ-সংসারের দিকে কর্ণপাত করিলে যেরূপ দুঃখ কষ্টের বার্ত্তা শোনা যায়, তাহাতে মনে হয় এ সংসার কেবলই দুঃখময়। কিন্তু মানুষের পক্ষে আর একটা অবস্থা আছে, যখন মানুষ সেই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন এ সংসারের মধ্যে কেবলই যে দুঃখ আর কষ্ট তাহা বোধ হয় না। তখন দেখা যায় এই জগতের অভ্যন্তরে এক অনির্ব্বচণীয় আনন্দ বিদ্যমান। মূলে সেই আনন্দ-ধারা হইতেই মানবজীবনের উৎপত্তি।

এ কথা বোধ হয় অল্প বিস্তর সকলেই প্রতিনিয়ত অনুভব করিয়া থাকেন যে, দুঃখের পর যখন সুখানুভূতি হয়, তখন কেমন মধুর বোধ হয়। তা ছাড়া আর একটু স্থির-চিত্তে বুঝিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা তত কঠিন হয় না, দুঃখ বোধটা মূলে আনন্দ বোধের সৃষ্টি করে। দুঃখ বোধ আর কিছুই নয়—আনন্দ বোধকে আনিবার চেষ্টামাত্র, অথবা আনন্দের বিঘ্নকে পরিহার করিবার চেষ্টামাত্র।

আমরা সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে দেখিতে পাই, মানুষ কত নিকৃষ্ট আনন্দে মগ্ন। নিকৃষ্ট আনন্দের প্রাপ্তিও সুলভ। কিন্তু উৎকৃষ্ট আনন্দ বা বিমলানন্দ পাইতে হইলে গভীর দুঃখের ভিতর দিয়া, দুঃখ রহস্য ভেদ করিয়া তবে তাহার মূলসূত্র আয়ত্ত করিতে হয়—নচেৎ নয়।

এখন দেখা যাক, আমরা প্রতিদিন কত রকমে আনন্দ উপভোগ করি। আহারে, বিহারে ব্যবহারে, কার্য্য কর্ম্মে, কত রকমে আনন্দপ্রাপ্ত হই। কিন্তু

কোন আনন্দই স্থায়ী হয় না, আসে আবার চলিয়া যায়। ঘটনার স্রোতে কখন দুঃখ, কখন সুখের বোধ হয় মাত্র। এই অস্থায়ী ভাবই দুঃখের একটা মূল কারণ। আমরা সংসারিক ভাবে সুখই ভোগ করি অথবা দুঃখই ভোগ করি, তাহাতে আমাদের কোন উপকার হয় না। প্রকৃত জীবনের কোন গঠনও হয় না। তাহা কেবল স্রোতের ন্যায় জীবনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে। অথচ ক্রিয়াজনিত জীবনের যে ক্ষয় হইতে থাকে, তাহাদ্বারা একটা দুঃখের উৎপত্তি করে। কেননা, ক্ষয় যাহা, তাহা দুঃখজনক। গঠন যাহা, তাহাই আনন্দজনক।

কেবল ঘটনা ভোগে গঠন হয় না। গঠন হয়, সত্যের উপলব্ধিতে। ঘটনার স্রোতে ভাসিয়া সত্য ধরা যায় না। কেন না, ঘটনা-পুঞ্জ চঞ্চল, অস্থায়ী। সত্যকে ধরিতে হইলে ক্রিয়ার অন্তরালে কর্ত্তাকে ধরিতে হয়। কর্ত্তাকে ধরার প্রথম পন্থা—বিশ্বাস ; ক্রিয়ার পশ্চাতে কর্ত্তা আছেন ইহা বিশ্বাসের কথা হইলেও ইহার মূলে যুক্তি আছে। তবে খুব সহজ কথা এই যে, কর্ত্তা ভিন্ন ক্রিয়া হয় না। দ্বিতীয় পন্থা—জ্ঞান,—কর্ত্তার রূপ গুণাদি সম্বন্ধে জ্ঞান। তার পর ভক্তি, কর্ত্তার গুণে মুগ্ধ হওয়া। কর্ত্তার সকল স্বরূপের মূলেই আনন্দ। তিনি আপনার আনন্দ রূপেই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তগণ ভগবানের আনন্দরূপ দেখিয়া তাঁহারাও আনন্দময় হইয়া যান।

ঘটনার ভিতরও আনন্দ লাভ করিয়া আনন্দময়কে ধরিতে হইবে। আনন্দময়ে বিশ্বাস করিতে হইবে। আনন্দময়ের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আনন্দময়ে ভক্তিমান হইতে হইবে। আনন্দময়ই আনন্দদাতা আনন্দের মূল কারণ। সেই মূলে বিশ্বাস, ভক্তি ভিন্ন আনন্দের জীবন পাওয়া যায় না। কেবল ঘটনা স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া জীবনের উদ্দেশ্য নহে। আনন্দ স্বরূপকে লাভ করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। আনন্দময়কে ভাল বাসিলে তাঁহার সৃষ্টি এই জগৎ সংসারকেও ভাল বাসিতে পারা যায়। ঘটনা পুঞ্জ দুঃখজনক হউক বা সুখজনক হউক, সেও তাঁহার বিধান জানিয়া বিশ্বাসের জীবন গঠন হইতে আরম্ভ হয়। ভগবানকে জানাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। ভক্তগণ জাগতিক দুঃখের অতীত হইয়া যান। তবে কি তাঁহাদের কোন দুঃখ নাই? আছে। কিন্তু সে দুঃখ নিজের জন্য নহে। জগতের জন্য। জগতে শত কোটী নরনারীর দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া ভক্তগণ সর্ব্বদাই ব্যথিত। কিন্তু এ ব্যথা বোধই জগতের মঙ্গলের কারণ। ভক্তগণও এই ব্যথা বোধের ভিতরে পরম

সুখী। মনে হয়, আনন্দময় ভগবানও জীবের জন্য সর্ব্বদা ব্যথিত। মানব-সমাজ যে, তাঁহার অবাধ্য সন্তান!!

প্রার্থনা

আমারে করিয়ো শিশু,
কোমল করিয়ো প্রাণ ;—
স্নেহ প্রেম ভালোবাসা
জগতে করিতে দান।
আমারে করিয়ো পাখী,
মলয়ে ধরিব তান ;—
ললিত লহরী তুলি
গাহিব তোমারি গান।
আমারে করিয়ো প্রভু
তোমার পূজার ফুল,
যেন সতত চুমিতে পারি
তোমার চরণ মূল।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

পথ্য

(৩)

২৪। মহিষ দুগ্ধ গোদুগ্ধ অপেক্ষা গুরুপাক; ইহাতে তৈলময় পদার্থ অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক। এই দুগ্ধের উপাদান এইরূপ :—

জল	প্রতিশতভাগে	৮৪'১০
প্রোটীড	ঐ	৪
শর্করা	ঐ	৪
তৈলময় পদার্থ	ঐ	৭'১০
লবণ	ঐ	'৮০

পরিপাক করিতে পারিলে ইহা নষ্টশুক্র ও কৃশ ব্যক্তির পক্ষে উত্তম পথ্য। ধাতু দৌর্ব্বল্য রোগে গোদুগ্ধ যেমন ধারোষ্ণ অবস্থায় অমৃত তুল্য, ইহা সেরূপ নহে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে দোহনের পর শীতল হইলেই ইহা হিতকর।

অজীর্ণ রোগী কাঁচা দুগ্ধ কখনই পান করিবে না। আমাদের পাচক-রসে যে রেনেট্ (rennet) নামক পদার্থ আছে, উহা কাঁচা দুগ্ধে সংযুক্ত হইলেই দুগ্ধ জমাট বাঁধিয়া যায়।

সম পরিমাণ দুগ্ধ ও জল একত্র ফুটাইয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে এই দুগ্ধ লঘুপাক হয়।

২৫। ছাগদুগ্ধ গোদুগ্ধ অপেক্ষা লঘু, অথচ অধিক পুষ্টিকর। ইহা পরিপাক করিতে প্রায় নারীদুগ্ধের ন্যায়ই সময় লাগে। ইহাতে শতকরা নিম্ন লিখিত উপাদান আছে :—

জল	৮৬'৮৫
প্রোটীড	৩'৭৯
শর্করা	৩'৭৮
তৈলময় পদার্থ	৪'৩৪
লবণ	'৬৫

রুগ্ন ও ভগ্ন স্বাস্থ্য শিশুদিগের পক্ষে এই দুগ্ধ পরম হিতকর। তবে ইহাতে তৈলময় পদার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকায় এবং শর্করার ভাগ কিছু কম থাকায় নিতান্ত শিশুকে অল্প জল ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া খাওয়ানই সুব্যবস্থা। একটি ৩ মাস বয়স্ক শিশুর নিমিত্ত ছাগদুগ্ধ ৪ ছটাক, জল ৬ ছটাক এবং শর্করা ১॥ দেড় কাঁচ্চা মিশ্রিত করিলে উত্তম পথ্য প্রস্তুত হয়।

অনেকে বলেন ছাগের ক্ষয় রোগ হয় না। সে কারণ এই দুগ্ধ কাঁচা খাইলেও ইহাতে ক্ষয় রোগের বীজাণু থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

যক্ষা রোগীর পক্ষে ছাগ দুগ্ধ বিশেষ উপযোগী। রোগীর পাকযন্ত্র দুর্ব্বল থাকায়, চর্ব্বিজাতীয় খাদ্য সহজে পরিপাক করিতে পারে না, অথচ স্নেহ প্রধান খাদ্যই তাহার পক্ষে উপকারী। ছাগদুগ্ধে যে স্নেহ উপাদান আছে তাহার পরিমাণ গোদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক; কিন্তু উহা গোদুগ্ধ অপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

আমাশা ও অজীর্ণ রোগে এই দুগ্ধ রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে।

স্নেহ উপাদানের অভাবে যে সকল শিশুর অস্থি সম্যক্ পরিপুষ্ট হয় না

(Rickets), তাহাদের পক্ষে ছাগদুগ্ধ বিশেষ উপকারী, আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়, যক্ষা, কাস ও জ্বরনাশক। শাস্ত্রে ইহার গুণ এইরূপ লিখিত আছে :—

"ছাগং কষায়ং মধুরং শীতং গ্রাহিতথা লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাসজ্বরাপহম্" ॥

২৬। ভেড়ার দুগ্ধ বায়ু রোগে হিতকর। ইহা লবণ-মধুর রস, স্নিগ্ধ, পাথুরি নাশক এবং কেশ, শুক্র কফ ও পিত্ত বর্দ্ধক।

২৭। গর্দ্দভ দুগ্ধ নারী দুগ্ধের ন্যায় লঘুপাক। একারণ ইহা শিশুদিগের পক্ষে হিতকর পথ্য। শিশু মাতৃস্তন্য না পাইলে অথবা শিশুর যকৃৎ বিকৃত হইলে, তাহাকে এই দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। এই দুগ্ধে তৈলময় পদার্থের পরিমাণ সকল দুগ্ধ অপেক্ষা অল্প। ইহার প্রতি শতভাগে মাত্র এক দশমিক পঁচাশী অংশ মেদময় পদার্থ আছে। ইহাতে শর্করার পরিমাণ প্রায় নারী দুগ্ধেরই অনুরূপ।

উদরাময় রোগীর পক্ষে এই দুগ্ধ অধিক উপযোগী। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর এবং শ্বাস, বায়ু, কফ, ও কাস নাশক।

কেহ কেহ বলেন গর্দ্দভের কখনই বসন্ত-রোগ হয় না। একারণ গর্দ্দভ দুগ্ধ উক্ত রোগের প্রতিষেধক। তাঁহাদের মতে পল্লীতে বসন্তরোগ আত্ম-প্রকাশ করিলে বাড়ির প্রত্যেক লোককে প্রতিদিন অর্দ্ধ কাঁচ্চা গর্দ্দভদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত।

২৮। দধি সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে হিতকর পথ্য। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নিত্য দধি ভোজন করিলে বার্দ্ধক্য আসিতে পারে না। বুলগেরিয়া প্রদেশ বাসিগণ প্রতিদিন দধি ভোজন করে। এজন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা তাহারা কর্ম্মপটু ও দীর্ঘজীবী। মেচ্নিকফ্ বলেন আমাদের অন্ত্র মধ্যে নানা জীবের বসতি আছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল জীবাণু দলপুষ্ট হয়। তখন তাহাদের গাত্র নিঃসৃত রস সমস্ত মানব দেহে ব্যাপ্ত হইয়া বার্দ্ধক্য আনয়ন করে। দধি মধ্যস্থ দধিবীজ (strep to thrix Dadhi) অন্ত্রে ল্যাক্টিক্ এসিড উৎপাদন করিবা অন্ত্রবাসী জীব সমূহকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

দধিমধ্যে "কেজিন্" নামক পদার্থ থাকায় ইহা গুরুপাক। সর্দ্দি, কাশী, বাত, রক্তপিত্ত ও ম্যালেরিয়া জ্বরে দধি কুপথ্য।

যে সকল অম্লরোগীর পাকস্থলীতে অত্যধিক অম্লরস নিঃসরণ হয় তাহাদের পক্ষেও দধি হিতকর নহে।

"কলেরার" সময় দধি ভোজন করা ভাল; কারণ ইহা দ্বারা "কলেরার" বীজাণু ১২ ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। টাইফয়েড জ্বরের বীজাণু দধি দ্বারা বিনষ্ট হইতে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে দধি ভোজন নিষিদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদমতে দধি উষ্ণবীর্য্য, আগ্নেয়, স্নিগ্ধকর, গুরু, মলসংগ্রাহক এবং রক্তপিত্ত, শোথ, মেদ ও কফবর্দ্ধক। মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিসার, অরুচি ও কার্শ্য রোগে দধি হিতকর পথ্য। ইহা বল ও শুক্রবর্দ্ধক।

দুগ্ধ হইতে ছানা পৃথক্ করিয়া লইলে যে তক্র অবশিষ্ট থাকে তাহাকে "হোয়ে" বলে। টাইফয়েড জ্বরে, পাকস্থলীর প্রদাহ বা ক্ষতে, অন্ত্রের পীড়ায় হিক্কা ও রক্ত আমাশা রোগে "হোয়ে" সুপথ্য।

পেট ফাঁপা ও অন্যান্য পেটের পীড়াগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ঘোল উপকারী। ঘোলে দধির সমস্ত গুণই আছে, অথচ ইহা দধি অপেক্ষা লঘু।

২৯। অম্ল মাত্রই রুচিকর, অগ্নির উদ্দীপক, স্নিগ্ধ, বায়ুর অনুলোমক, বিরেচক এবং পিত্ত ও কফ বর্দ্ধক।

তেঁতুলে "টার্টারিক এসিড", "ম্যালিক এসিড" ও "সাইট্রিক এসিড" নামক অম্ল অছে। নেবুর অম্লত্বও "সাইট্রিক এসিডের" উপর নির্ভর করে।

পুরাতন কাশ ও হাঁপানির পীড়ায় পুরাতন তেঁতুলের সরবৎ বিশেষ উপকারী।

যকৃতের ক্রিয়া বিকার, বমন ও বিবমিষা প্রভৃতি রোগে নেবুর রস পথ্য ও ঔষধ। জয়পাল দ্বারা বিষাক্ত হইলে নেবুর রস খাইলে উদরের বেদনা, ভেদ, বমন প্রভৃতি শীঘ্রই নিবারিত হয়।

জ্বরে পিপাসা থাকিলে নেবুর রস বা তেঁতুলের সরবৎ উৎকৃষ্ট পানীয়। ইহা দ্বারা পিপাসা দূর হয় এবং মুখ বেশ সরস থাকে।

অনেকে মনে করেন জ্বরকালে অম্ল খাইলে মুখে ঘা ("জ্বরঠুঁটো") হয়। ইহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নাই। জ্বরের বিষ (Toxin) হইতেই ঐ সকল ঘার উৎপত্তি।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে অম্ল সেবন উপকারী। স্কর্ভি রোগে ঔদ্ভিজ্জ অম্ল সুপথ্য। মৎস্য, মাংস প্রভৃতি আমিষ খাদ্য আহারের পর অম্ল খাইলে শীঘ্রই

ঐ সকল খাদ্য পরিপাক প্রাপ্ত হয়। পাচক-রসের (Gastric Jcah) অল্পতা বশতঃ খাদ্যদ্রব্যের উৎসেচন ক্রিয়া দ্বারা যে সকল রোগীর পেটে "এসিটিক্", "বিউটিরিক্" প্রভৃতি অম্ল উৎপন্ন হয়, তাহাদের পক্ষে অম্ল সেবন হিতকর। তবে উহা আহারের পর সেবন করাই সুব্যবস্থা। পাকস্থলীতে অম্ল রসের আতিশয্য হেতু যাহাদের অম্ল জন্মে, তাহাদের পক্ষে আহারের পূর্ব্বে অম্ল সেবন করাই বিধি। সর্দ্দি কাশী ও বাত রোগীর পক্ষে কোন অম্লই সুপথ্য নহে।

৩০। গাউট, মধুমূত্র, জ্বর, অম্ল, অতিসার, ক্রিমি প্রভৃতি রোগে মিষ্ট কুপথ্য। মেদগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষেও ইহা অপকারী।

যাহাদের আহারের পর অম্ল ও উদরে বায়ু জন্মে তাহাদের পক্ষে মিষ্ট হিতকর নহে। ইহা পাকস্থলীতে উৎসেচন (Fermentation) উদ্ভব করে। অধিক পরিমাণে মিষ্ট ভক্ষণ করিলে উহা পাকাশয়ে "ল্যাক্‌টিক্ এসিডে" পরিবর্ত্তিত হয়। এই "ল্যাক্‌টিক্ এসিড" হইতেই অম্ল জন্মায়।

উদরস্ফীত হইলে এবং চোঁয়া ঢেঁকুর ও পাতলা ভেদ হইতে থাকিলে অনেকে মিছরির জল বা চিনির সরবৎ খাইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবস্থার কোন যুক্তি নাই। ঐ অবস্থায় মিষ্ট অপথ্য।

কৃশ, দুর্ব্বল ও অপুষ্ট বালকের পক্ষে মিষ্ট বিশেষ উপকারী। ক্ষয় রোগে ইহা বলকর হইয়া উপকার করে।

অবসাদ ও বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বলতায় মিষ্ট উত্তম পথ্য।

পেশীর দুর্ব্বলতাবশতঃ যে সকল ক্ষেত্রে জরায়ু সঙ্কুচিত হয় না এবং তজ্জন্য প্রসব হইতে বিলম্ব ঘটে তথায় রোগিণীকে মধ্যে মধ্যে চিনির সরবৎ খাওয়াইলে সুফল পাওয়া যায়। এই সরবতের প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ :—

শর্করা	৫০ গ্রাম
জল	২৫০ গ্রাম *

ডাক্তার বোসী ১০০জন রোগিণীকে এই সরবৎ পান করাইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে ৮০ জনের অবসন্নতা শীঘ্রই দূর হইয়াছিল। তাহাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতেও অধিক বিলম্ব হয় নাই।

আয়ুর্ব্বেদ মতে চিনির গুণ :—

"সিতা সুমধুরা বাচ্যা বাত পিত্তাস্র দাহজিৎ।
মূর্চ্ছা ছর্দ্দি জ্বরানহন্তি সুশীতলা শুক্রকারিণী"॥

* ১গ্রাম=১৫০৪৩২ গ্রেণ (ট্রয়)

চিনি সুশীতল, সুমধুর, রুচিকর শুক্রজনক এবং বাত, রক্তপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি ও জ্বরের শান্তিকারক।

আয়ুর্ব্বেদ মতে গুড়ের গুণ :—

"গুড়ো বৃষ্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতঘ্নো মূত্রশোধনঃ।
নাতি পিত্তহরো মেদঃ কফক্রিমি বলপ্রদঃ" ॥

পুরাতন গুড়ই অধিক গুণশালী। এক বৎসরের অধিক হইলে গুড় পুরাতন বলিয়া গণ্য হয়।

নূতন গুড় শ্বাস, কফ ও ক্রিমিজনক। অগ্নিমান্দ্য রোগীর পক্ষেও ইহা হিতকর নহে।

পিত্তজ্বরে ও বমন রোগে পুরাতন গুড়ের সরবৎ সুপথ্য। প্লীহা রোগে ইক্ষু গুড়ই উপযোগী।

বিবিধ ফল, তরকারী ও শাকসব্জীর কথা আগামী বারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

আত্মসংযম

(১)

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নীরোদবাবু গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতায় তদীয় বন্ধু, পাবলিক প্রসিকিউটার, রাজেন্দ্রবাবুর বাটীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার পত্নী কমলা, কন্যা সরলা এবং পুত্র মোহিতকুমার।

মোহিত চিন্তাশীল, কিশোরবয়স্ক; বোধ হয় দুই চারিটা কবিতা লেখে। পিতামাতা সে খোঁজ রাখিতেন না; কিন্তু দুষ্ট 'সর' মাঝে মাঝে দাদার কবিতার খাতা চুরি করিয়া পড়ে এবং তাহার সঙ্গিনী 'মেনিকে শুনায়। মেনি একটা কাবুলি বিড়াল! মেনি কবিতা বুঝিত কি না জানি না, তবে 'সর'র আদরটুকু ষোলআনা ভোগ করিয়া লইত। সরলাও বোধ হয় তার্কিক শ্রোতা বড় বেশী পছন্দ করিত না; কারণ কবিতা শোনার পর মেনির নীরবতায় সে এতটুকু আপত্তি করিত না।

রাজেন্দ্রবাবুর কন্যা মাধুরী, সরলার চেয়ে একবৎসরের বড় অর্থাৎ দ্বাদশবর্ষীয়া।

মোহিতকুমার তাহাকে একটিবার দেখিল। কুঞ্চিত কালো চুলে আধ ঢাকা মেঘাবৃত শুভ্রচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখখানি; মেঘান্তরিত শশাঙ্কের মত শান্ত পুলকোদ্ভাসিত। সে মুখশ্রীর একখানি নিখুঁত ফোটা বহুদিন পর্য্যন্ত কিশোর-কবির হৃদয়-ফ্রেমে দৃঢ় ভাবে আঁটা রহিল।

চারিদিন পরে নীরোদবাবু সপরিবারে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণগড়ে যাইয়া রাজেন্দ্রবাবুদের কথা প্রায় সকলেই ভুলিয়া গেল; ভুলিল না কেবল সরলা; সে চারিদিনের মধ্যে মাধুরীকে নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল।

মোহিত সে দিন কলেজে গিয়াছে; সরলা যথারীতি দাদার খাতা চুরি করিয়া পড়িতে বসিল। কিন্তু এ আবার কি? একি ছন্দ কবির হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইয়াছে! সরলা ইহা ভাল করিয়া বুঝিল না; তবে এটুকু বেশ বুঝিল যে কবির হৃদয়ে একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কতবার খাতা চুরি করিয়া আনিয়া সে পড়িয়াছে, কিন্তু এ নূতন সুর এমন করিয়া ত কোন দিন তাহার কানে উঠে নাই। নিরীহ নিদ্রিতা কাবুলী বিড়ালটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া সরলা বলিল, "বল্‌তে পারিস্, মেনি, কি এ?"

যথারীতি সকালে ডাক আসিয়াছে। মোহিত কতকগুলি চিঠি হাতে করিয়া ভিতরে আসিল—বলিল, সর, তোর চিঠি নে"। আগ্রহের সহিত ভগিনী চিঠি চাহিয়া লইল। মোহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কা'র চিঠি রে, নূতন হাতের লেখা দেখ্‌ছি যে।" "ইস্, তাই বলি আর কি; তুমি খাতায় কি লেখ, তা' আমাকে ব'লে থাক?" কথাটা বলিয়া সরলা একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল। হঠাৎ খাতার কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়া ভাল হয় নাই। যদি চুরি ধরা পড়ে! মোহিত জানিত সরলা তাহার খাতা চুরি করিয়া পড়ে। প্রকাশ্যে হউক, গোপনে হউক, তাহার যে একজন 'সমজদার' পাঠক আছে, ইহা জানিয়া মোহিত একটু গর্ব্ব অনুভব করিত! "আচ্ছা তোকে খাতা দেখাব, বল্, কে চিঠি লিখেছে।" "চাইনা, আমি তোমার খাতা দেখ্‌তে" বলিয়া সরলা ফিরিয়া দাঁড়াইল—চিঠি মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল,—"ছিঃ পরের চিঠি বুঝি দেখ্‌তে আছে!" আজ তাহার ধর্ম্ম-জ্ঞানটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মোহিত মনে মনে একটু হাসিল। পলকের মধ্যে 'সর' ছুটিয়া রান্না ঘরে মাতার কাছে উপস্থিত হইল, এবং "মা,

মাধুরীর চিঠি এয়েছে" কথাটা এমন ভাবে বলিল, যে মোহিত বাহির হইতে স্পষ্ট শুনিতে পাইল! তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত কেন যে আরক্তিম হইল, সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

চুরি করিতে যাইয়া একজন চোর নাকি অন্য একজন চোরকে ধরাইয়া দিয়াছিল। মোহিত আজ তাহার দেরাজের তালা চাবি বদলাইয়া ফেলিল; কি জানি, যদিইবা সরলা চুরি করিতে আসিয়া—চোর ধরাইয়া দেয়!

(২)

মোহিতকুমার স্থানীয় কলেজের ছাত্র। কলেজে "সেবক সমিতি" নামে একটি ছোট সমিতি ছিল। প্রতি বৎসর সেসন (Session) আরম্ভের সময়ে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইত। প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর উৎসাহী ছাত্রদিগকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইত। সমিতির উদ্দেশ্য পীড়িতের সেবা ও দুঃখের দুঃখমোচন। সহরে সাধারণ লোকে স্রোতের জল ব্যবহার করে। রাস্তার পাশে পাশে অপরিসর পয়ঃপ্রণালী চলিয়া গিয়াছে; পয়ঃপ্রণালী গুলি নদীর সহিত সংযুক্ত; এবং প্রত্যেক পুষ্করিণী এই প্রণালীর সহিত সংযুক্ত। প্রত্যেক পুষ্করিণীতেই জোয়ার ভাঁটায় জল বাড়ে ও কমে। তাই সহরটিতে প্রায় প্রতি বৎসরই ওলা দেবীর অনুগ্রহ একটু বেশী মাত্রায় বর্ষিত হইত। যিনি এই সমিতির সম্পাদক বা প্রাণ, সহরের কেহ কলেরায় আক্রান্ত হইলে প্রথমে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিত। সকলেই জানেন, কলেরা রোগীর সেবার জন্য সহজে লোক পাওয়া যায় না। যে স্থানে লোকাভাব বা যে সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করিত, সম্পাদক মহাশয় প্রয়োজন অনুসারে তথায় 'সেবক' পাঠাইতেন। কলেজের যুবকগণই স্বেচ্ছায় এই সেবাভার গ্রহণ করিত।

মোহিত প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হইল। সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সে তাহার নাম "কলেরা শাখায়" লিখাইয়া লইল। সমিতির দুইটি শাখা ছিল। একটিকে আমরা "কলেরা শাখা" বলিতে পারি। যাহারা অপেক্ষাকৃত নির্ভীক, তাহাদিগকেই "কলেরা শাখায়" লওয়া হইত। কলেজ হইতে আসিয়া মোহিত বলিল, "বাবা, আমি সেবক সমিতির কলেরা শাখায় নাম দিয়াছি।" নীরোদ বাবু পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন। "তোর ভয় ক'রবে না?"—কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন। মোহিতের উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, "ভয় কি মা, তোমার আশীর্ব্বাদ পেলে কিছু

গ্রাহ্য করি না।” “শোন, পাগল ছেলের কথা—” বলিয়া কমলা হাসিলেন। কমলার মুখের সে হাসিতে সত্যই যেন কমলার করুণ মুখের হাসিরাশির একটু আভাস ফুটিয়া উঠিল। “তা” বেশ, আমার কিছু অমত নাই, তবে সাবধানে থাকিস্।” “মানুষ অনর্থক ভয় পায়। কলেরা ছোঁয়াচে নহে।” নীরোদ বাবুর কথায় একটা বিশ্বাস ও নির্ভীকতা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সমিতির নিয়ম অনুসারে মোহিত প্রথম প্রথম রোগীর প্রথম অবস্থায় সেবা করিতে যাইত, তাহার পর সে ক্রমে ক্রমে সম্পাদক মহাশয়ের নির্দেশ অনুযায়ী কঠিন অবস্থাতেও যাইতে আরম্ভ করিল। সেবা কার্য্যে মোহিত-কুমারের অবস্থা অতুলনীয় ছিল; রোগীকে একটু আরামে রাখিবার জন্য তাহার প্রাণপণ যত্ন ও আগ্রহ অপর সেবকদের আদর্শ হইয়া উঠিল। কত রোগীর শিয়রে বসিয়া সে বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছে। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে দিন মোহিত দেখিত, রোগীর মুখে শান্তি ও আরামের চিহ্ন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেদিন তাহার অন্তর তৃপ্ত হইয়া উঠিত। তাহার প্রসন্ন অন্তরে দেবতার আশীর্ব্বাণী যেন সেদিন নিতান্ত সুস্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠিত। আত্মীয়গণের করুণ ক্রন্দন রোলের মধ্যে যে দিন রোগীর অবিনশ্বর আত্মা মৃত্যুর চির রহস্যময় রাজ্যে প্রবেশ করিত, সে দিন তাহার নয়ন যুগল অশ্রুতে আপ্লুত হইয়া উঠিত!

(৩)

মোহিতকুমার প্রথম বিভাগে এফ-এ, পাশ করিল। মাতা কমলা দেখিলেন মোহিত পাশ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের একটু অবনতি ঘটিয়াছে।

সরলা বাবার কাছে আবদার করিল, “বাবা, দাদার বে দাও, আমার সইয়ের সঙ্গে”—“সইকে?” সই, মাধুরী, রাজেন্দ্র বাবুর কন্যা। বাবা হাসিলেন, মা চুপ করিয়া রহিলেন; কারণ, কন্যার কথাটি তাঁহার নিকট ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার মৌনাবস্থা অনুমোদনসূচক। মাধুরী মেয়ে ভাল, চারি দিনের পরিচয়েও ইহা কাহারও অবিদিত ছিল না। নীরোদ বাবু আর একটু হাসিলেন, সেটুকু গম্ভীর মৌনভাব লক্ষ্য করিয়া। তিনি বলিলেন, “মোহিতের শরীরটা একটু খারাপ দেখিছি একবার পশ্চিম থেকে বেড়িয়ে আসুক; কালই যাবে বন্দোবস্ত করেছি।” ত্রস্তভাবে সরলা বলিল “বাবা আমার কথাটার উত্তর?” যেন দাদার বিবাহ আর হইল না—ভাবটা এমনই! “দিচ্ছি, দাও ত টেবিলের

উপর থেকে একখানা চিঠির কাগজ আর পেনটা”—নীরোদ বাবুর ওষ্ঠাধর রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

সতী কমলা বুঝিলেন, চিঠির কাগজে কি দরকার। শ্রীমতী সরলাও বাবার মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বুঝিল না। ভাবি[illegible]—প্রায় দশ মিনিট কাল নীরোদ বাবু কি লিখিলেন। তারপর চিঠিখানি সরলার হাতে দিয়া বলিলেন, “এইনে তোর উত্তর।” সরলা চিঠি পড়িল। আনন্দে তাহার সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর হইয়া উঠিল। “বাবা এই আমি তোমায় ‘আশীর্ব্বাদ কচ্ছি।” নীরোদ বাবু ও কমলা হাসিয়া উঠিলেন। “না বাবা প্রণাম করছি।” পিতার পায়ের কাছে ‘ঢিপ’ করিয়া এক প্রণাম করিয়া সরলা ছুটিয়া পলাইল। ভুলের লজ্জা ও প্রার্থিত লাভের আনন্দ তাহাকে চঞ্চল, অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। “পাগলি মা আমার” নীরদ বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন। কমলা সব বুঝিয়াছিলেন। তবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গো!” “এই রাজেন্দ্র বাবুর কাছে তাঁর মেয়েটির জন্য প্রস্তাব ক’রে পাঠালুম—হ’লত! এখন বোধ হয় রেতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দেবে।” কমলা হাসিলেন। প্রফুল্ল পঙ্কজের উপর প্রথম সূর্য্যরশ্মি পাতের ন্যায় সে হাসি বড় উজ্জ্বল, বড় মধুর! পত্নীর তৃপ্তি দেখিয়া নীরোদ বাবু তৃপ্ত হইলেন।

(৪)

যথা সময়ে মোহিত পশ্চিমে চলিয়া গেল। স্বাস্থ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে মোহিত দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, নীরোদ বাবুর সে ইচ্ছা ছিল এবং তদনুযায়ী বন্দোবস্তও তিনি করিয়া দিয়াছিলেন। মোহিত একস্থানে বসিয়া রহিল না, পশ্চিমের নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কয়েক দিন পরে রাজেন্ বাবুর নিকট হইতে পত্রের উত্তর আসিল। তিনি এই বিবাহ প্রস্তাবে যেন অনুগৃহীত হইয়াছেন, এমনই কৃতজ্ঞতার সহিত পত্রখানি লিখিয়াছেন। “জানি আমি রাজেন বাবুকে, অমন উদার প্রকৃতির লোক দুটি দেখিনি; দেখেছ চিঠি?—নীরোদ বাবু হাসিয়া চিঠিখানি কমলার হাতে দিলেন। কমলা চিঠি পড়িলেন; সরলা পিতার পশ্চাৎ হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া চিঠিখানি পূর্ব্বেই পড়িয়াছিল; এখন বলিল, “তবে এই মাসেই দাদার বে’ দাও”—নীরোদ বাবু হাসিলেন, কহিলেন, “সে বটে, কিন্তু তা’র যে এক বাধা আছে; দুবার ত’ আর খরচ ক’রে পেরে উঠ্‌ব না—একেবারেই দুজনের—” কমলার চক্ষু দুইটি প্রসন্নতা পূর্ণ হইয়া হাসিতেছিল।

সরলা কথাটা বুঝিল ; কি বলিবে 'দিশা' না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, "বাবা, তোমার মাথার সাম্‌নে ক'গাছি চুল পেকেছে দেখ্‌ছি, তুলে দিই ?" অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সরলা পাকা চুল তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পিতার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল !

(৫)

মানুষ কল্পনাই করিতে পারে, কিন্তু সে কল্পনাকে সার্থকতা দিবার ভার ভগবানের হাতে। কোন্ অলক্ষ্যে বসিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট একটু হাসিয়াছিল, তাহা আর উভয় পক্ষের কেহই জানিতেন না। বিবাহের প্রস্তাব সুস্থির করিয়া ফেলিবার জন্য উভয় পক্ষই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহা আর এখন একরকম কাহারও অবিদিত ছিল না যে, মোহিতের সঙ্গে মাধুরীর বিবাহ এক প্রকার স্থিরই হইয়া গিয়াছে। তবু আজ কাল করিয়া পূরা দুই বৎসর কাটিয়া গেল, আর মাধুরীবালা দ্বাদশ বৎসর পার হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল। যাহাতে শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায় উভয় পক্ষই এমত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। আর বিলম্ব করা চলে না। কিন্তু এমন সময় দেবতার বজ্রের মত আকস্মিক ও নিষ্ঠুর এক বিপদপাৎ হইল। সে বিপদ এতই অপ্রত্যাশিত যে, উভয় পক্ষীয় আত্মীয়গণই একান্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

সে দিন অপরাহ্ণে কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া নীরোদ বাবু বারান্দায় বসিয়া হাত মুখ ধুইতেছিলেন ; হঠাৎ তাঁহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল ; মুখ চক্ষুতে এক অস্বাভাবিক জ্যোতি ও ক্লান্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। নীরোদ বাবু পার্শ্ববর্ত্তিনী পত্নী কমলাকে সঙ্কেত করিলেন ; কমলা স্বামীর অবসন্ন দেহ জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নীরোদ বাবু সাধ্বী পত্নীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সেই বারান্দায়ই শুইয়া পড়িলেন। সরলা মাতার চীৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছিল ; পিতার অবস্থা দেখিয়া জল ও পাখা লইয়া আসিল। কিন্তু জলসেক ও পাখার বাতাস ব্যর্থ হইল। প্রায় পনের মিনিট পরে গণেন ডাক্তার আসিয়া রোগীর দেহ পরীক্ষা করিলেন—আপন মনে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "Ah ! past hope !" কমলার মূর্চ্ছিত দেহলতা স্বামীর শয্যা পার্শ্বে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া যখন ধরণীর উজ্জ্বল শোভা ম্লান করিয়া দিতেছিল, তখন নীরোদ বাবুর আত্মা কোন এক অজানা প্রদেশে চলিয়া গেল।

(৬)

গ্রামের বাড়িতেই শুদ্ধি কার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। পিতার মৃত্যুকালে মোহিত কাছে ছিল না, এই ক্ষোভ তাহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শেলের মত বিদ্ধ হইয়া রহিল। পল্লীর শান্ত মধ্যাহ্নে যখন মোহিত জননী কমলার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া অন্য মনস্কভাবে দূর আম্রকুঞ্জের শ্যামপল্লব শোভার দিকে চাহিয়া থাকিত, তখন তাহার চক্ষুর কাছে পিতার স্নেহদীপ্ত মুখ খানির স্মৃতি জাগিয়া উঠিত। তখন আর অশ্রু কোন মতেই বাধা মানিত না। জননী তাঁহার স্নেহহস্ত পুত্রের ললাটে ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিতেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত; উভয়ের তীব্র শোক যে পবিত্র নিস্তব্ধতার সৃষ্টি করিয়া তুলিত—তাহা অপার্থিব। আমার বোধ হয়, যে শোকে গঞ্জন নাই, ভাষা নাই, প্রকাশ নাই, সেই শোকই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র। যে দিন সরলা কাছে থাকিত, সে দিন সেই বুদ্ধিমতী বালিকা, আবদারের কথায় মার ও দাদার শোকের দারুণ নীরবতা বন্ধ করিত। শোক-প্রবাহ যখন হৃদয় মধ্যে একান্তই উদ্বেল হইয়া উঠে, তখন সান্ত্বনা লাভের জন্য বুকের কাছে গিয়া একটা কিছু আঁকড়াইয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই প্রবল হইয়া উঠে। কমলার ও মোহিতের স্নেহ, উন্মুখভাবে 'সর'কেই বুকের কাছে টানিয়া আনিল; সরলা প্রলেপের মত এই দুই শোকদিগ্ধ হৃদয়ে লাগিয়া রহিল। কিন্তু এই শোকের তীব্র আঘাতে পুনরায় মোহিতের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। আতপতপ্ত কমল পত্রের মত মোহিত শোকের তীব্র সন্তাপে ক্রমেই শুকাইয়া যাইতেছিল। কমলা অস্থির হইয়া উঠিলেন,—মোহিতকে পুনরায় পশ্চিম প্রদেশে স্বাস্থ্যান্বেষণে যাইবার জন্য ধরিলেন; কিন্তু মোহিত মাকে রাখিয়া আর কোন মতে যাইতে স্বীকৃত হইল না। তখন মোহিত, মা ও সরলাকে লইয়া পশ্চিমে কিছু কাল বাস করিয়া আসিবে, এমনই একটা বন্দোবস্ত হইয়া গেল। তাঁহারা কোথায় কিছু অধিক দিন বাস করিবেন তাহা আর স্থির হইল না; যে স্থান জননীর ভাল লাগিবে মোহিত সেই স্থানেই কিছু দীর্ঘ কাল বাস করিবে, মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া রাখিল। নীরোদ বাবুর মৃত্যুর পাঁচমাস পরে মোহিত মাতা ও ভগিনীকে লইয়া পশ্চিমে চলিয়া গেল।

(৭)

কালাশৌচের জন্য এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ কার্য্য হইতে পারিবে না বলিয়া রাজেন রাবু এই শোকের সময়ে বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি শুধু সান্ত্বনা ও সহানুভূতিসূচক চিঠি

লিখিতেন; সান্ত্বনা প্রদানের জন্য যে চিঠি লিখা যায়, তাহার প্রত্যেক খানির উত্তর কেহ আশা করে না; কারণ, শোকের কাছে ভদ্রতার ক্ষুদ্র খুঁটী নাটী হিসাবগুলি প্রায়ই লুপ্ত হইয়া যায়। রাজেন বাবু প্রায়ই মোহিতের পারিবারিক সংবাদ লইতেন না। সুতরাং কবে তাহারা পল্লীগ্রামের বাড়ি হইতে পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছে, সে সংবাদ রাজেন বাবু পাইলেন না। রাজেন বাবু যখন ছুটী লইয়া পল্লীগ্রামের বাড়িতে মোহিতের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তখন তাহারা তথায় ছিল না। রাজেন বাবু ফিরিয়া আসিয়া পশ্চিমের নানা স্থানে সংবাদ লইতে চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর পাইলেন না!

মাধুরী আর ছোট্টটি নহে; হিন্দুর ঘরের মেয়ে আর কতদিন রাখা যায়! রাজেনবাবুর আত্মীয়গণ বলিলেন, "আর মেয়ে রাখা চলে না। মোহিতের যখন খোঁজই নাই, তখন সে অপেক্ষায় বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে। ভালছেলে দেখিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেল।" রাজেনবাবু প্রথম প্রথম কথাগুলিতে কাণ দিলেন না, কিন্তু যাঁহারা আত্মীয়তা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাঁহারা সহজে পরামর্শ দানে বিরত হইবেন কেন?

এমনই করিয়া কিছু দিন কাটিয়া গেল; রাজেনবাবুর পত্নী স্নেহ বলিলেন, "ওগো, মেয়ের দিকে ত আর চাওয়া যায় না। মোহিতের আশায় আর কতদিন বসিয়া থাকিবে? মেয়ের অদৃষ্টে সুখ থাকিলে হইবে; একটা ঠিক করিয়া ফেল।" রাজেনবাবুর কেমন যেন একটা বিশ্বাস ছিল যে, মাধুরীর প্রতি মোহিত বোধ হয় একটু আকৃষ্ট। সেই পিতৃহীন যুবক মাধুরীর বিবাহ হইয়া গেলে যে আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপটুকু পাইবে, তাহা মনে করিয়াও রাজেনবাবু বুকের মধ্যে একটা অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু মোহিতের পক্ষে এই মনস্তাপ ও হতাশার পরিমাণ কতটুকু, তাহা রাজেন বাবু বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা আমরা করিতে পারি না। সুতরাং পত্নীর কাতর ক্রন্দন ও আত্মীয়গণের অযাচিত পরামর্শ তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত ও ক্লিষ্ট করিয়া তুলিলেও সাংসারিক হিসাবে তিনি সেগুলিকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।

পুরুষ পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, বিশ্বের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের যে সম্বন্ধ, যে রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহার একটা কিনারা করিতে চাহিবার স্পর্দ্ধাও রাখে; কিন্তু এতটুকু বালিকার কোমল হৃদয়ের

মধ্যে যে আকর্ষণ, যে বিশ্বপ্লাবী প্রেম গোপন রহিয়াছে, তাহা পুরুষের নিকট চিরদিনই রহস্যাবৃত থাকিয়া যাইবে। রাজেনবাবু ভাবিলেন, মাধুরীর হৃদয়ে মোহিতের জন্য যদি এতটুকুও আকর্ষণ থাকে, তাহা কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং এখন হইতে মাধুরীর বিবাহের চেষ্টা ও আয়োজন সবেগেই চলিতে লাগিল।

আর মাধুরী? হিন্দুকন্যার "বুক ফাটেত মুখ ফোটেনা"—সুতরাং সে নীরবেই সব সহ্য করিতেছিল।

(৮)

"আর কোন্ তীর্থে যাইবে মা?" "কোথাও আর যাইব না, বাবা বিশ্বেশ্বর চরণে স্থান দিন, এখানেই কিছু দিন থাকিয়া যাইব। আর যদি তুই বাড়ি ফিরিতে স্বীকার করিস্, চল্। কাশীও বুঝি আমার বাড়ির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নহে, যদি তুই ফিরিস্!" চক্ষু মুদিত করিয়া মোহিত ডাকিল, "মা!" মাতা কমলা বুঝিলেন, কোথায় পুত্রের আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি বলিলেন, "কি বাবা!" "মা তুমি যদি বল আমি বাড়ি ফিরিব। যেখানে তুমি, সেইখানেই আমার কাশী।" কমলা মোহিতের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহ কোমল স্বরে বলিলেন, "না বাবা, আমি কাশীতেই থাকিব; তোর যদি গ্রামে ফিরিতে ইচ্ছা হয়, তাই ও কথা বলিতেছিলাম।" মাতার স্বর গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। মাধুরীর বিবাহ সংবাদ মোহিত ও কমলা পাইয়াছিলেন। মাতার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, গ্রামে ফিরিয়া গিয়া মোহিতের বিবাহ দেন, কিন্তু তিনি স্পষ্ট করিয়া সে কথার উল্লেখ করিতে পারিতেন না। গ্রামে ফিরিবার প্রস্তাবের অর্থই যে মোহিতের বিবাহ দেওয়া। মোহিত ইহা বুঝিত।

কতদিন অকারণ অশ্রু আসিয়া মোহিতের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়াছে; মাতার অঙ্কস্বর্গে বালকের মত মোহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছে; মাতা কমলা শোকের সে নীরবতা ভঙ্গ করেন নাই। বুক ভাঙ্গিয়া যখন দীর্ঘ-শ্বাস বাহির হইয়া আসিতে চাহিত, তখন নীরবে মোহিতের মাথায় হাত বুলাইতেন।

মাতার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ এমনি করিয়া নীরবে পুত্রকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া, তাহার সকল দুঃখ ও কষ্টের অংশ গ্রহণ করিতে চাহিত। হায়, মাতার স্নেহ!

সে দিন অপরাহ্নে মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে ; দিনের আলো নিবিয়া যায় নাই ; তবু এক বিষাদ মাখা ম্লান আলোকে সমস্ত কাশী সহরটি আবৃত হইয়া রহিয়াছে। বাহিরের ঘরে বসিয়া মোহিত একটা খবরের কাগজ পড়িতেছিল। সদর দরজা হইতে একটা লোক ডাকিল, "বাবুজি, এ বাবুজি—" মোহিত বাহিরে আসিয়া দেখিল, টেলিগ্রাম আপিসের একটা পিয়ন, হাতে টেলিগ্রামের খাম। মোহিত খামখানি গ্রহণ করিয়া দেখিল, তাহার নামেই আসিয়াছে। কে এ টেলিগ্রাম করিল? কম্পিত হস্তে টেলিগ্রাম খুলিয়া মোহিত পড়িল ;—"Have come here with mother and wife, Latter seriously attacked with Cholera. Come at once." মর্ম্ম এই,—

"মাকে ও স্ত্রীকে লইয়া তীর্থে আসিয়াছি, স্ত্রী কলেরায় আক্রান্ত, শীঘ্র আইস।

সতীশ।"

নাম সহি করিয়া মোহিত বাড়ির ভিতরে ছুটিয়া গেল। পিয়ন বলিতেছিল, "বাবুজি বখশিস",—হায়, হায় তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সে চাহিয়া দেখিল, "বাবুজি" অদৃশ্য হইয়াছেন। "খবর তো জরুরি হ্যায়"—বলিতে বলিতে পিয়নটা চলিয়া গেল,—আজি আর সে কিছুই পায় নাই—সিদ্ধির কটা পয়সাও নহে।

"সতীশ আমাদের সঙ্গে পড়ত, তাকে তোমার মনে আছে ত, মা? তার মা ও স্ত্রীকে নিয়ে প্রয়াগে এসেছে, স্ত্রীর কলেরা, আমাকে যাওয়ার জন্য তার ক'রেছে।" মোহিত এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল।

"কি সর্ব্বনাশ, তারাত বিদেশে ভারি বিপদে প'ড়েছে,—তা, তুই যাচ্ছিস্ ত?" কমলার কথার মধ্যে একটা দারুণ উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। "তা', মা, তুমি বল্লেই যেতে পারি"—"ওমা, তা আর বল্‌ব না! এ বিদেশে তা'দের দেখ্‌বে কে?"

কুন্তী দেবী যে বিশ্বাস লইয়া তাঁহার মধ্যম পুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়াছিলেন, কমলার পক্ষে অবলম্বন করিবার ততটুকু বিশ্বাস ছিল কি? তবু কি প্রশান্ত হৃদয়ে তিনি একমাত্র পুত্রকে রাক্ষসের অপেক্ষাও নির্ম্মম ও ভীষণ এক অদৃশ্য দানবের সহিত সংগ্রাম করিতে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন! তাঁহার মাতৃ-হৃদয় মোহিতের সহপাঠীর বিপদ সংবাদে ব্যগ্র ও

প্রতীকারপরায়ণ হইয়া উঠিল। রমণীর এ মূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তি; রমণীর এ হৃদয় দেবীর হৃদয়। ইহার তুলনা অসম্ভব।

যথা সময়ে মাতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ অক্ষয় কবচে আবৃত হইয়া মোহিত তাহার সংগ্রাম ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সংগ্রাম ক্ষেত্র কি ?

(৯)

প্রয়াগে আসিয়া সতীশের বাসা খুঁজিয়া লইতে মোহিতের প্রায় রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল।

"বড় বিপদে পড়েছি, মোহিত,—মারও বোধহয় কলেরা হয়েছে।" —ঘরের বাহিরে আসিয়া মোহিতের হাত ধরিয়া সতীশ কহিল।

"তোমার স্ত্রীর অবস্থা কিরূপ সতীশ" মোহিতের স্বর সহানুভূতি পূর্ণ। সতীশ কহিল, "এখনও বেঁচে আছে—তবে বোধ হয় শেষ অবস্থা। আমি মার কাছে যাই, তুমি তার কাছে যাও। সঙ্কোচ ক'রোনা, মোহিত, শুধু তুমি আর আমি! দেখ, যদি রক্ষা ক'র্ত্তে পার। এমন বিপদে আর আমি পড়িনি।" মোহিত একটু মৃদু হাসিয়া কহিল," "কলেজে পড়বার সময় "সেবক সমিতি'র সভ্য হয়ে যে শিক্ষাটা হয়েছিল, এবার দেখ্‌ছি তা' কাজে লেগে গেল।"

মোহিত চিরদিনই একটু লাজুক প্রকৃতির; কিন্তু সেবাকার্য্যে যখন সে ব্রতী হইত, তখন তাহার সমস্ত সঙ্কোচ ও দ্বিধা কোথায় চলিয়া যাইত! রোগীর অবস্থার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে মোহিতের উৎসাহ বাড়িয়া চলিত!

কলেজে থাকিতে সতীশ ও মোহিত কত কলেরা রোগীর শয্যাপ্রান্তে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছে; তখন তাহারা স্বপ্নেও মনে করে নাই যে, কলেজের বাহিরেও এমন একটা দিন তাহাদের জীবনে আসিবে, যেদিন সুদূর প্রবাসক্ষেত্রে তাহাদেরই আপন জনের সেবায় তাহাদের দুই সতীর্থকে এমন ভাবে মিলিতে হইবে!

মোহিত ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, একখানি ছোট চৌকির উপর ঔষধের শিশিগুলি সাজান রহিয়াছে। পার্শ্বে কয়েকটা কাচের বাটীর মধ্যে প্লেট দিয়া ঢাকা, কিছু লেবু, বেদানা, ইত্যাদি। আর একখানি কাগজে কখন্ কোন্ ঔষধ খাওয়াইতে হইবে এবং খাওয়ান হইয়াছে, তাহারই একটা "চার্ট" লিখিত রহিয়াছে। একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই মোহিত বুঝিল, সবই ঠিক আছে; সতীশ "সেবা-সমিতি"র সেবাপ্রণালীর এতটুকুও ভুলিয়া যায় নাই!

সেই অতীত দিনের মত আজ আবার মোহিত সেবা করিতে পাইবে, ইহা

মনে করিয়া, তেমনই উৎসাহ জাগিয়া উঠিল! একটা ওয়ালল্যাম্পের মৃদু আলোকে গৃহটি অনুজ্জ্বলভাবে আলোকিত ছিল,—মোহিত আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে ভূ-নতজানু হইয়া উপবেশন করিল; নাড়ী দেখিবার জন্য রোগিণীর হাতখানি তুলিয়া লইল; সে হস্ত শীতল দেখিয়া মোহিত সেকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য উঠিল।

অস্পষ্ট ক্ষীণস্বরে "প্রাণ যায় মাগো—জল"—বলিয়া রোগিণী একবার মস্তক চালনা করিল। তখন তাহার অবগুণ্ঠনমুক্ত, মুখখানির উপর মোহিতের দৃষ্টি পড়িল; একটা অস্ফুট বিস্ময়সূচক শব্দ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

"এ যে মাধুরী!" কিন্তু তখন ত মোহিতের বিস্ময় প্রকাশের অবসর নাই!

আপনাকে সংযত, স্থির করিবার জন্য যে শক্তিটুকু সে তাহার জীর্ণ হৃদয়ের উপর প্রয়োগ করিল, সেই শক্তিই তাহাকে যেন মূর্চ্ছাতুর করিয়া তুলিতেছিল!

তাহার পদতল হইতে যেন হর্ম্যতল সরিয়া যাইতেছিল; সে একটা আল্‌নার কাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল। হায়, কি সংগ্রাম তাহার বুকের মধ্যে এই এক মুহূর্ত্তকাল চলিয়াছিল, কে তাহা বুঝিবে? হে করুণাময় পরমেশ্বর! তুমি মানুষের এই দুর্ব্বলতাটুকু ক্ষমা করিবে কি?

"জল"—আবার রোগিণীর মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। মোহিত চমকিয়া উঠিল; অনুতাপ ও লজ্জা আসিয়া যেন তাহাকে কশাঘাত করিল। বন্ধুপত্নী,—এবং বন্ধু বিশ্বাস করিয়া, এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু সঙ্কোচ না করিয়া তাহার উপর মৃত্যুপথযাত্রী পত্নীর শুশ্রূষাভার অর্পণ করিয়াছেন,—ইহাই কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে? বড় একটা গর্ব্ব, একটা সংযত আত্মসম্মান তাহার প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। আজ তাহাকে এ সংগ্রামে, এ পরীক্ষায় জয়লাভ করিতেই হইবে।

একটু লেবুর রস করিয়া সে রোগিণীর মুখের নিকট লইল। রোগিণী প্রায় সংজ্ঞাশূন্যা; কি বলিয়া সে ডাকিবে?

মোহিত দন্তে আপনার ওষ্ঠ চাপিয়া একবার উপরের দিকে চাহিল—তাহার পর হৃদয়ের সমস্ত বল একত্রিত করিয়া বলিল, "খাও ত লক্ষ্মী দিদিটি আমার!"

ঐ একটি আহ্বানেই যেন তাহার সমস্ত দুর্ব্বলতা কাটিয়া গেল;—তখন সে সহজ, শান্তভাবে নিঃশ্বাস ফেলিবার অধিকার পাইয়া, যেন একটি পরম নিশ্চিন্ততা অনুভব করিল! মোহিত যখন লেবুর রসটুকু মাধুরীর মুখে ঢালিয়া দিতেছিল,

তখন সে একবার মোহিতের মুখের দিকে চাহিল! দেখিল, স্বামী নহে,—আর কেহ,—কে সে?

সেই আধ জাগরণ, আধ তন্দ্রার মধ্যে, সেই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াও মাধুরী চিনিল,—কে সে!!!

সে যে মোহিতকে চিনিতে পারিল, সে অপরাধ তাহার নহে। তাহার জীর্ণ নারীহৃদয়ের অন্তরালে, যে মূর্ত্তিখানি সে বিস্মৃতির নিম্নে, সবলে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, আজ সেই মূর্ত্তি তাহাকে দুর্ব্বল পাইয়া, বিস্মৃতির স্তূপ ঠেলিয়া, বাহির হইয়া আসিয়াছে কি? সে শুনিয়াছে, বিকারের মোহে, মানুষ নানা-প্রকার মূর্ত্তি দেখে, স্বপ্ন দেখে; তবে কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে?

তন্দ্রার ঘোরে তাহার চিন্তার শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল; তবু সে বুঝিতে-ছিল, স্বামীর হস্ত হইতেও সেবা-নিপুণ দুইখানি হস্ত তাহার শুশ্রূষার প্রাণপণে নিযুক্ত রহিয়াছে।

দুইবার সে নিষেধ করিবে মনে করিয়াছিল; কিন্তু তখনই রোগ যন্ত্রণার আকুলতায় সে ভুলিয়া গিয়াছে, কি বলিবে। শুধু পিপাসা; আর সেই পিপাসার শান্তির জন্য জল—একটু জল।—ইহা ব্যতীত তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির হইল না!

শেষ রাত্রিতে মাধুরীর অবস্থা একটু ভাল দেখা গেল। সতীশ ধীরে ধীরে আসিয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল, ডাকিল, "মোহিত!" মোহিত তখন সেক দিবার জন্য একটা কেট্‌লিতে জল গরম করিতেছিল, ফিরিয়া উত্তর দিল, "কি সতীশ?"—তার পর ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল, "মা'র অবস্থা কেমন?" "বুঝিতে পারিতেছি না, একবার যাইও।" পীড়িতার কাণে কথা না যায় এমনই মৃদুস্বরে সতীশ কথা কহিল। মাধুরীর জ্ঞান সঞ্চার হইতেছিল। স্বামীর অস্পষ্ট কথার স্বর তাহার কাণে গেল। সংজ্ঞালুপ্তির আবেশ তখনও তাহার দৃষ্টিতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান!

এই স্বামী—কি প্রেমময় তাঁহার হৃদয়! বিবাহিত জীবনের এই বৎসরাধিককাল সে তাঁহাকে আদর ও যত্নের এতটুকুও প্রতিদান করে নাই। স্বামী যখন হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ লইয়া তাহার কাছে আসিয়া ডাকিয়াছেন, তখন সে কতবার কাজের—'অছিলা' করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হায়,কেন সে গিয়াছে? সে ত নিজেই তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই।

স্বামীর হৃদয়ের পরিপূর্ণতা তাহাকে একান্তভাবে কুণ্ঠিতই করিয়া তুলিয়াছে—

তাহার হৃদয়ের দৈন্য আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে যে অকপটচিত্তে স্বামীকে সবটুকু দিতে পারে নাই! কেন পারে নাই, কোথায় তাহার বাধা, তাহা ত বলিবার নহে!

জীবণ ও মরণের সান্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আজ তাহার দুর্ব্বল হৃদয় আরও কাতর হইয়া উঠিল। মোহিত কাছে আছে, আজই স্বামীকে সবটুকু দান করিবার উপযুক্ত মুহূর্ত্ত আসিয়াছে,—ইহার পরেই হয়ত পৃথিবীর সঙ্গে তাহার সব সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইবে; তাহা হইলে ত আর এ জীবনে স্বামীকে সবটুকু দেওয়া হইল না!

মাধুরী একবার মোহিতের মুখের দিকে চাহিল; ক্লান্তির আবেশে তাহার চক্ষুর পাতা ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, তবু সে আবার স্বামীর মুখে দৃষ্টি স্থির করিল। পিপাসায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল।

ঘরের আলোটা যেন নিভিয়া গিয়াছে; এমনই ভাবে একটা কালো ছায়া তাহার চক্ষুর উপরে নাচিয়া উঠিল।—এই বুঝি মৃত্যু!—

ওগো, তাই কি? তবে ত আর অবসর হইল না!—মাধুরী প্রাণপণ করিয়া ডাকিল,—"বড় পিপাসা, একটু জল দিন দাদা!"—

তাহার অন্তরে কি সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহা কি কেহ বুঝিয়াছে? তখন তাহার তন্দ্রার মোহ আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিল!

চমকিত মোহিত শয্যার পার্শ্বে সরিয়া আসিল, তাহার চরণ টলিতে ছিল মাথা ঘুরিতে ছিল; সে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিল, "এই জলটুকু খাও, লক্ষ্মী দিদি আমার"—

মোহিতের দেওয়া জল এবার মাধুরীকে তৃপ্ত করিল; তাহার নিঃশ্বাস সহজ হইয়া আসিল, তাহার মুখ চক্ষুতে একটা আরামের ভাব ফুটিয়া উঠিল!

সতীশ কহিল, "মোহিত, ও ঘরে একবার মাকে দেখ্‌তে যাও"—তার পর সেই দেব প্রকৃতির যুবক মাতার সেবার জন্য পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেল! মোহিত ও মাধুরীর হৃদয়ের উপর দিয়া যে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে সতীশ তাহার কিছু জানিল কি? বোধ হয় না!

প্রবল ঝটিকান্তে পৃথিবী যেমন শান্ত, স্থির হইয়া নবোদিত সূর্য্যকে অভিনন্দন করিতে থাকে, মোহিতও সেদিনকার প্রভাতকে তেমনি করিয়া অভিনন্দন করিল। আজ তাহার হৃদয় শান্ত, স্থির, সম্ভ্রমময়!

(১০)

চারদিন পরে মোহিত বারাণসীধামে ফিরিয়া আসিয়া জননীর চরণে প্রণাম করিল, কহিল, "মা বাড়ি চল।"—

জননী কমলা মনে মনে বিশ্বেশ্বরের চরণ উদ্দ্যেশে প্রণাম করিয়া নাম জপ করিলেন,—তবে কি অনাদিনাথ তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন?

জননী বলিলেন, "বাবা, মোহিত,—বাড়ি কি আমার বারাণসী হবে?" 'তা' তুমি জান, মা। আমার মা যেখানে সেখানেই আমার বারাণসী"—বলিয়া মোহিত একটু হাসিল! সে হাসি কি মধুর, কি শান্তিময়!

"আর আমার মা,"—জননীর তৃপ্ত কণ্ঠের বাণী শেষ হইবার পূর্ব্বেই সরলা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "দাদা, সতীশ বাবুর স্ত্রী কেমন?" "আরাম হ'য়েছে?"

"সে যে মাধুরী, 'সর,"—মোহিত পুনরায় একটু হাসিল!

সরলা ও কমলাদেবী চমকিতা হইয়া উঠিলেন, জননী আর একবার পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সে মুখ নির্ম্মল, প্রশান্ত, গরিমাময় হাস্য-দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বসন্ত-আবাহন *

এস　শিশির অন্তে নব বসন্ত
　　মলয় পবন সঙ্গে
এস　নবকিশলয়ে তৃণ প্রান্তরে
　　কুসুম খচিত অঙ্গে,
এস　মুঞ্জরিত-চ্যূত-মুকুল-গন্ধে,
　　মুগ্ধ ভ্রমরা গুঞ্জনে

---

* এই কবিতাটি কম্পোজ হইয়াও স্থানাভাবে চৈত্র সংখ্যায় বার নাই।
(সম্পাদক)।

এস পলাশ-অশোকে-দাড়িম্ব গুচ্ছে
পিয়াল-রেণু-রঞ্জনে।
এস মিলন পিয়াসা জাগায়ে বিশ্বে
কোকিল পঞ্চমতানে,
এস ফুল্ল-বকুল-কুসুম ছড়ায়ে
গন্ধ-বিধুর-সমীরণে।
এস মাতায়ে কুঞ্জ অশ্রান্ত ঝঙ্কারে
আগমন সাড়া দিয়ে,
এস সুন্দর তুমি নয়নানন্দ
নন্দন সুষমা ল'য়ে;
এস লুপ্ত অতীত সুপ্ত স্মৃতি লয়ে
রুদ্ধ-হৃদয়-দুয়ারে,
এস বিভল চঞ্চল মত্ত চরণে
শ্যামল বন-কান্তারে।
এস নব পুষ্পিত বল্লরী বিতানে
আবেগ কম্পন দিয়ে,
এস রুদ্ধ-চিত্ত-নির্ঝরে আমার
প্রেম-হিল্লোল ছুটায়ে।
এস ভগ্ন শুষ্ক মম জীবন-কুঞ্জে
বিরহ-তপ্ত-পরাণে,
আজি ছিন্ন-জীর্ণ-চিত্ত-তন্ত্রী
বাজুক তব স্পন্দনে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।



আমার জীবন কাহিনী

সম্পাদক মহাশয়! আপনি আমার জীবন কাহিনী লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন, বোধ হয় আপনার মাসিক পত্রে তাহা প্রকাশ করিবেন। আমার দুঃখের কাহিনী পড়িতে আপনার পাঠক পাঠিকাগণ পছন্দ করিবেন কি? আজ কাল গল্প আর উপন্যাস পড়িতেই সকলে চাহেন। আপনি আমার দুঃখের জীবন বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন, এবং ইহা পাঠ করিলে অন্যেরও উপকার হইতে পারে এইরূপ আপনার ধারণা, কিন্তু আমার তেমন করিয়া লিখিবার সামর্থ আছে কি? যাহা হউক আপনার অনুরোধ এবং উৎসাহে আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলাম। সংক্ষেপেই লিখিতে চেষ্টা করিব, তবু বোধ হয় কিছু দীর্ঘ হইবে।

প্রথম অধ্যায়

বাল্য জীবনের কথা

অতি শৈশবে আমার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার চেহারা আমার ঠিক মনে নাই। কেবল মায়ের কান্না আমার বেশ মনে আছে। তাঁহার কান্না দেখিয়া আমিও খুব কাঁদিতাম, বোধ হয় সেই জন্য তাঁহার কান্না বেশী দিন স্থায়ী হইল না। তারপর আমি যখন ৫।৬ বছরের হইলাম, রাত্রে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া তাঁর মুখে বাবার কথা শুনিতাম। সকল কথা বুঝিতে পারিতাম না, কিম্বা বুঝিতে পারিলেও এখন ঠিক মনে নাই। তবে শুনিতে শুনিতে একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, মা আমাকে একথা সেকথা কত রকমে কত কথা শুনাইতেন কিন্তু তার মধ্যে বাবার কথাটাই কিছু বেশী।

মার মুখে শুনিয়াছি আমার আরো একটি ভাই ও একটি ভগিনী হইয়াছিল কিন্তু তাহারা অল্প বয়সে পর পর দু'জনই মারা যায়। তারপর আমি হইলাম। তাই বোধ হয় আমার নাম অক্ষয়কুমার রাখেন।

বাবা প্রথমে আমাদের গ্রামের জমিদার জয়শঙ্কর বাবুর সরকারে কর্ম্ম করিতেন। শেষে তিনি তাঁর সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইয়া ছিলেন। বাবা নাকি খুব বুদ্ধিমান বিচক্ষণ পরিশ্রমী ও সাহসী ছিলেন। তাঁহার সময়ে জয়শঙ্কর বাবুর ষ্টেটের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তবু নাকি মধ্যে মধ্যে বাবার সঙ্গে জয়শঙ্কর বাবুর মতের অনৈক্য ঘটিত। বাবা যে ভাবে কাজ করিতেন, তিনি সে ভাবে চলিতে চাহিতেন না, অথচ বাবার কাজে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিতেও পারিতেন না।

মার মুখে শুনিয়াছি বাবার এই রকম স্বভাব ছিল যে, তিনি ষ্টেটের পক্ষে যেমন দেখিতেন, প্রজার দিকটাও তেমনি দেখিয়া কাজ করিতেন। এইজন্য নাকি জয়শঙ্কর বাবু সময় সময় অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি এতটা উদারতা ভাল বাসিতেন না, কেন না তিনি জমিদার কিনা?

মানুষের মনে কিছুদিন ধরিয়া যদি একটা ভাব জমিয়া আসিতে থাকে তবে এক সময় তাহার ক্রিয়া হইবেই। সেই ভাবটা ভালই হউক আর মন্দই হউক। শেষে জয়শঙ্কর বাবুর অসন্তোষের ভাব বাবার প্রতি যখন স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িল তিনি তখন তাঁহার কাজ ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর তিনি আর কোথাও চাকরী করেন নাই।

জয়শঙ্কর বাবুর এক আত্মীয় ছিলেন তাঁহার নাম হরনাথ বাবু। তিনি মধ্যে মধ্যে বাবার খুঁটীনাটী দোষ দেখাইয়া তাঁহার প্রতি জয়শঙ্কর বাবুর অসন্তুষ্টি জন্মাইয়া দিতেন। এখন তিনিই বাবার স্থানে নিযুক্ত হইলেন।

বাবা এ পর্য্যন্ত যে ভাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন তাহাতে অনেক লোক বাবার অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জয়শঙ্কর বাবুর কাজ ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার সম্মানের কিছুই লাঘব হইল না। বরং পূর্ব্ব অপেক্ষা সাধারণের সহানুভূতি তিনি এখন বেশী পাইতে লাগিলেন। চাষী খেতয়ালেরা তাঁহার সহিত মিলিত [illegible] জ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রথমে তিনি সামান্য ভাবে একটা খরিদ বিক্রয়ের কাজ সুরু করিলেন। চাষী খেতয়ালাদিগের উৎপন্ন জিনিষ কিছু কিছু খরিদ করিয়া গঞ্জে চালান দিতে লাগিলেন। এ কাজে কখন কখন কিছু লোকসান পড়িলেও লাভের ভাগই বেশী হইতে লাগিল। তিনি সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে জয়শঙ্কর বাবুর নূতন কর্ম্মকর্ত্তা হরলাল বাবু নানা রকম মতলব আঁটিয়া বাবাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার একটা কারণ বাবা গরীব লোকদিগের নূতন কাজের পথ দেখাইয়া দিয়া তাহারা যাহাতে স্বাধীন ভাবে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে এরূপ সৎপরামর্শ সর্ব্বদা দিতেন। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া তাহাদিগের মোকদ্দমার খরচা বাঁচাইয়া দিতেন। জমিদার অন্যায় করিয়া কাহারও প্রতি অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিয়া সাহায্য করিতেন। ইহাতে জমিদারের স্বার্থেও অনেক সময় ব্যাঘাৎ ঘটিত। সুতরাং জয়শঙ্কর বাবু বাবার পরম শত্রু হইয়া

দাঁড়াইলেন। বিরোধের ভাবটা বেশ পাকাপাকি হইয়া পড়িল। এই জন্য নাকি অনেক দিন ধরিয়া সর্ব্বদাই একটা না একটা হাঙ্গামায় পড়িয়া ও অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং মনকষ্ট ভোগ করিয়া বাবার শরীর ভাঙিয়া পড়ে। সময় সময় আমাদের সংসারের কষ্টও উপস্থিত হয়।

একবার জমিদার বাড়িতে নাকি গহনা চুরী যায়। অনুমান করিয়া জনকতক চাকর বাকরকে মারপিট করা হয়। তাহার পর একজন রাঁধুনী ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত পীড়ন করা হয়। তাহাতে তাহার অবস্থা সাংঘাতিক হয়। অথচ সেই লোকটা বাস্তবিক নির্দ্দোষী ছিল, এরূপ শোনা যায়। সেই ব্রাহ্মণটির এক বড় ভাই ছিলেন, তিনি অন্য এক জমিদারের সরকারে কর্ম্ম করিতেন। ভায়ের অপমানে তিনি জয়শঙ্কর বাবুর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা করেন। আসামীদিগের মধ্যে জয়শঙ্কর বাবুর ম্যানেজার হরনাথ বাবু প্রধান ছিলেন। এই মোকর্দ্দমায় জয়শঙ্কর বাবুর বিস্তর টাকা খরচ হইয়াছিল, তা ছাড়া প্রকারান্তরে দোষটা হরনাথ বাবুর স্কন্ধে চাপাইয়া নিজে অব্যাহতি লাভ করেন। কেস যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে হরনাথ বাবুর গুরুতর দণ্ড হইবারই কথা কিন্তু অনেক চেষ্টা ও তদবির করিয়া পোনর দিন মাত্র কারাদণ্ড হয়। আর কয়েক জনের কিছু কিছু শাস্তি হয়। শুনিয়াছি এই মোকর্দ্দমার সময় বাবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অন্যের দ্বারায় হরনাথ বাবুকে সৎপরামর্শ দিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন; শেষে বাবার প্রতি হরনাথ বাবুর মনের ভাব ভাল হইয়াছিল। হরনাথ বাবু, জয়শঙ্কর বাবুর চাকুরী ছাড়িয়া পশ্চিম অঞ্চলে যান।

বাবা যখন যে কাজে অর্থব্যয় করিতেন, মা তাতে বাধা দিতেন না, এতে সময় সময় আমাদের সংসারের নাকি বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইত। মা কষ্ট করিয়া সংসার চালাইতেন তবু বাবাকে কিছু বলিতেন না। বাবার যখন ক্রমেই শরীর অসুস্থ হইতে লাগিল তখন সংসারে আমাদের আরো কষ্ট হইয়াছিল।

মা আমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে, বাবা তাঁহাকে কিছু লেখাপড়া শিখাইয়া ছিলেন; তা ছাড়া মা খুব পরিশ্রমী ছিলেন। বাবার যত্নে ও নিজের চেষ্টায় মা অনেক রকম হাতের শিল্প দ্রব্য তৈরী করিতে শিখিয়াছিলেন। সেলায়ের কাজ তিনি ভালই পারিতেন। বাবা নাকি সর্ব্বদা এই কথা বলিতেন যে, "স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিয়া মানুষ জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে তাহাতে কোন হীনতা হয় না, কিন্তু অপরের আশ্রিত বা অধীন হইলে তাহাতে মনুষ্যত্ব

বিকাশের ব্যাঘাৎ ঘটে। ইহা যেমন পুরুষের পক্ষে তেমন কখন কখন স্ত্রীলোকের পক্ষেও।”

বাবা যখন মারা যান, তখন আমাদের জন্য কিছুই সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ শেষকালে অনেকদিন তাঁহার শরীর ভাল ছিল না। তেমন কাজকর্ম্ম আর চলে নাই। তবু যতদূর পারিতেন অন্যের সাহায্য করিতেন। সে স্বভাব তাঁহার বরাবরই ছিল।

আমার এক কাকা ছিলেন। তিনিও জয়শঙ্কর বাবুর এক মহলের তহশীলদার ছিলেন। বাবা থাকতে কাকা ঐ কাজে প্রবেশ করেন। তারপর যখন বাবা চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন এবং জয়শঙ্কর বাবুর সঙ্গে বিরোধ চলিতে লাগিল, তখন কাকা চাকুরীর খাতিরে বাবার সঙ্গে বাহিরে কোন সহানুভূতি করিতে পারিতেন না। কাকীমাও নাকি মার উপর ভাল ভাব প্রকাশ করিতেন না। কাকার একটি মাত্র মেয়ে ছিল কাকা তার ছোটবেলায় বিবাহ দিয়াছিলেন। কিছুদিন বাদেই সে বিধবা হয়। কাকার বাড়ি আমাদের বাড়ি একই ভিটাতে, কেবল মাঝখানে একটা বেড়া দেওয়া ছিল। বাবা মারা গেলে আমরা কাকার সাহায্য বিশেষ পাই নাই। তাহা লইতে মাও তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন আমিও নিতান্ত শিশু। নিজের পরিশ্রমে মা কোন রকমে দিন কাটাইতেন, কিন্তু এখানে আমাদের আর শান্তি ছিল না।

বাবার একজন খুব অনুগত বিশ্বাসী বন্ধু তুল্য ছিলেন তাঁর নাম নফর ঘোষ। জমিদার জয়শঙ্কর বাবু একবার তাঁহার হাল গোরু ও জমি জমা বিক্রয় করিয়ালন। সেই বার তিনি আমাদের গ্রামের ১০ ক্রোশ দূরে দেবগ্রামে উঠিয়া যান। তাঁহাকে আমি কাকা বলিতাম। নফর কাকা মধ্যে মধ্যে আমাদের খোঁজ খবর লইতেন। তাঁহার মুখে আমরা দেবগ্রামের জমিদার বাবুদিগের সুখ্যাতি ও প্রজাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার কথা শুনিতাম। নফর কাকা আমাদিগকে তথায় যাইতে কয়েকবার বলেন। শেষে দেখা গেল, আমাদের পক্ষে এখানে বাস করা আর সম্ভব পর হইল না। বিশেষতঃ আমার লেখা পড়ার জন্য মা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাবিতে লাগিলেন। দেব গ্রামে সে বিষয় খুব সুবিধা হইবার সম্ভবনা জানিয়া আর এখানে স্কুলের দুরবস্থা দেখিয়া শেষ আমরা নফর কাকার পরামর্শে ও সাহয্যে দেবগ্রামে উঠিয়া আসিলাম। তখন আমার বয়স ৭ বৎসর মাত্র। অবশ্য আসবার সময় কাকা অনেক আপত্তি করিয়া ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শুভগ্রহ *

নাটিকা

চরিত্র

পুরুষ

দয়াল হালদার ... ... ধনাঢ্য প্রবীণ ব্যক্তি।
পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ... ... ঐ গৃহস্থ প্রতিবেশী।
মহেশচন্দ্র ... ... হাইকোর্টের উকিল।
যতীশচন্দ্র ... ... ঐ পুত্র।
ষষ্ঠী ... ... যতীশের বন্ধু।

নারী

সরযু ... ... দয়ালের পৌত্রী।
নিশি ... ঐ সহচরী ; দয়ালের দূরসম্পর্কীয়া পৌত্রবধূ।
হেমাঙ্গিনী ... ... পঞ্চাননের তরুণী স্ত্রী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সরযুর বসিবার ঘর

[একধারে খাট ; খাটের দক্ষিণে টিপয়, তাহারি সম্মুখে একখানি চেয়ার, চেয়ারে বসিয়া সরযু কার্পেট বুনিতেছিল। টিপয়ের উপর ছোট একটি বাস্কেটে নানাবিধ উল, প্যাটার্ণ প্রভৃতি]

সরযু। (কার্পেট বুনিতে বুনিতে) আবার গুলিয়ে গেল! যত মনে কচ্ছি, এ ফুলটা আজ শেষ করবোই, ততই একটা-না-একটা ভুল হচ্ছে! রঙের সেট না মিললে ভালোও লাগে না বুনতে! (বুনিতে লাগিল ; কিয়ৎক্ষণ পরে প্যাটার্ণের উপর ঝুঁকিয়া ঘর গুণিতে গুণিতে) নাঃ ; এখানটায় ফিকে আছে, আমি

---

* [এই নাটিকাটির তিনটি দৃশ্যমাত্র ১৩১৮ সালের 'ভারত-মহিলা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন নানা কারণে ইহা সমাপ্ত করিতে পারি নাই। এক্ষণে 'কুশদহ'-সম্পাদকের আগ্রহাতিশয্যে নাটিকাটি সমগ্রভাবে 'কুশদহে' প্রকাশের জন্য নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। নাটিকার পূর্ব্ব-নামই বাহাল রাখা গেল। পূর্ব্ব-প্রকাশিত তিনটি দৃশ্যেই যথেষ্ট সংশোধন করিয়াছি।]

লেখক।

ঘোর দিয়ে বসেছি ! থাকৃগে, ভালো লাগছে না আর বুনতে ! (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল ; বেড়াইতে বেড়াইতে গুণ্-গুণ্ স্বরে গান ধরিল)— "তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর

আমার সাধের সাধনা—

মম শূন্য গগন-বিহারী ! "

দাদু এখনো এল না কেন ? নাঃ,এ বড় দাদুর অন্যায় ! এ সময়টা দাদুর জন্য মনটা আমার অস্থির হয়ে ওঠে ! হাতে কাজ নেই, কিছু না—আর দাদুও তেম্নি এমন সময়ে বেরিয়ে আমায় জব্দ করবে ! আচ্ছা, আমিও শোধ নেব ! দাদু গাইতে বললে আর গাব না ত ! কথনো না ! ভালো কথা,—এ মাসের 'তরণীতে' শেলির সেই Love's Philosophyটার ছাঁচে বেশ একটা গানের স্বরলিপি বেরিয়েছে—সেটা একবার গেয়ে দেখা যাক ! সময়টা সুন্দর কেটে যাবে ! বাঃ, ভারী মনে পড়ে গেছে ত ! (টেবিলের উপর হইতে 'তরণী' মাসিক-পত্র টানিয়া চেয়ারে বসিয়া গান ধরিল)

(গীত)

নির্ঝর নদীতে চাহে মিশিবারে

নদী চলে পড়ে সাগর-গায় !

মলয়ে মলয়ে মধুর মিলন

কি সে অনুরাগ, প্রণয়-ছায় !

মিলন-রাগিণী ওঠে সারাবেলা,

প্রাণে প্রাণে সবে করে কত খেলা,—

নেহারিলে, হেরি, নাহিক একেলা—

আমার এ চিত, তোমাতে ধায় !

গিরি চাহে, হের, আকাশে বাঁধিতে,

ঢেউয়ে ঢেউ মিশে কায়েতে কায় !

ফুল-পরিমল ঢলি পড়ে ফুলে,

ঝরে মরে দল ফুলেরি পায় !

ধরণী হাসিছে রবি-কর পেয়ে,

শশী হেরি বারি নেচে চলে ধেয়ে,—

আকুল এ চিত তোমারি লাগিয়ে

তোমাতেই যে সে লুটাতে চায় !

নিশির প্রবেশ

[নিশি শ্যামাঙ্গী, কিশোরী, একহারা দেহ ; সরযুর সহচরী, সমপ্রাণা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—লেখাপড়াও সে অল্প-স্বল্প জানে। নিশি রহস্যপ্রিয়া। স্বামী বিদেশে চাকুরি করে এবং সে দয়ালের গৃহেই থাকে। নিজের বা স্বামীর অবস্থা তেমন ভালো নয়।]

নিশি। বাঃ, একলাটি বসে দিব্যি মনের মত গান ধরে দেছ ত !

সরযু। আহা, তাই বুঝি ! ও 'তরণী'তে একটা স্বরলিপি বেরিয়েছে—শেলির সেই পুরোনো গানের ভাবে লেখা—তাই গেয়ে দেখছিলুম !

নিশি। তা হলেও একলাটি বিজনে বসে ও গান গাইবার কি এত তাড়া পড়ে গেল, ভাই ?

সরযু। তাড়া আবার কি। গানটা মুখস্থ হয়েছে কি না তাই দেখছি। ধর, নয় গাইলুমই, তাতেই বা এমন কি চোর-দায়ে ধরা পড়তে হবে ! তুমি যেমন দিনরাত্রি স্বপন দেখছ, আমার ভাই তত স্বপন দেখার বাতিক নেই !

নিশি। তা নয় গো, মশাই, তা নয় ! স্বপন দেখে আর লাভ কি ? তুমি ত 'কেবলি স্বপন করিছু বপন বাতাসে, দিনগুলি আহা, কেটে যায় সবি হতাশে! হৃদয়-রতন তবুও দুয়ারে না আসে !'

সরযু। থামুন কপিবরা,সম্প্রতি হৃদয়-রতনের জন্য আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। তুমি যদি এক গ্লাস সুশীতল বারি এনে দাও, তাহলে সেটুকু পান করে তোমায় ধন্যবাদ প্রদান করি !

নিশি। যথা আজ্ঞা ! [গ্লাসে জল আনয়ন ও সরযুর পান] এখন বাজে কথা যাক !

সরযু। কাজের কথার জন্য আমিও খুব প্রস্তুত !

নিশি। আচ্ছা, এ রকম করে আর কতদিন কাটবে ? আমি ত কচি খুকী নই ! দাদু বিয়ে দিচ্ছে না বলে কি তোমার আর বিয়ে করতে সাধ যায় না ?

সরযু। বিয়ে ? ওঃ, বিয়ের জন্য ত আমার ঘুম হচ্ছে না ! আসল কথা, বিয়ে করবার আমি কোন প্রয়োজনই দেখছি না !

নিশি। (ভেঙচাইয়া) বটেই ত ! দেখা যাবেগো, দেখা যাবে। বলে, সেদো ভাত খাবি, না, হাত ধোব কোথা ?

সরযু। কেন ? বিয়ে না করলে বুঝি চলে না ? বিয়ে না করলে দেশের কত কাজ করা যায়, বল দেখি !

নিশি। সে কথাগুলো পুরুষদের ভেবে দেখা উচিত। মেয়েদের নয়। তার উপর বিধবারাও আছেন! তাঁদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে ত!

সরযু। না, বিয়ে যে সকলকে করতেই হবে, এমন কোন কথা নেই! মেয়েরা দু-এক জন নাই বা বিয়ে করলে! তা ছাড়া বিয়ে হলে দাদুকে দেখ্‌বে কে? দাদুকে ছেড়ে আমি শ্বশুরবাড়ি যেতে পারবো না!

নিশি। শ্বশুরবাড়ি তুমি নাই গেলে!

সরযু। ঘরজামায়ের স্ত্রী হতে হবে? পোড়া কপাল!

নিশি। তা হলে বাপু, দাদুকেই বিয়ে কর না কেন?

সরযু। কেন, বিয়ে না হলে বুঝি আর দাদুকে আদর-যত্ন করা যাবে না?

নিশি। ওগো, তবু যে বয়সের যা, বুঝলে! যতদিন দাদুরটি থাকলে মানায়, ততদিনই দাদুর, তারপর যাদুর মাণিক হতে হয়। জানো না, সেই গানটা—

সরযু। না, জানি না। তুমি গাও লক্ষীটি, গাও—

নিশি। হ্যাঁ, এখন আবার গাইতে যাই!

সরযু। কেন দোষটা কি? হ্যাঁ, তুমি যে বললে, যে বয়সের যা! আচ্ছা, তোমার ত বিয়ে হয়েছে তা তুমি ত এখানেই পড়ে আছ, বিপিনদা কোথায়—দেখা-সাক্ষাৎ ক্বচিৎ হয়, তোমার অবস্থাটা আর আমার চেয়ে কি এমন তফাৎ?

নিশি। তবু—বুঝলে, জোর চালাবার একটা লোক আছে, আর তা ছাড়া চিঠি-পত্তরে 'প্রিয়তমাসু' সম্বোধন আর 'তোমারি' বলে লেখাটুকু—তার দাম ত, বোঝ না! আর দেখাটাও ত ক্বচিৎ কখনো হয়!

সরযু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা ঠিক—তা ঠিক। এখন গাও, ভাই, গাও, লক্ষীটি—

নিশি। অচ্ছা, শোন তবে, কিন্তু দাদু এসে পড়বে না ত!

সরযু। এলই বা!

নিশি।

(গীত)

জীবনে সে দিন আসে!
হাসি-খেলা সব ঝরে যায়,
মনে হয় উপহাস এ!
শূন্য হৃদয় ভরিয়া উঠে,
যবে সখি, ফুল-বাসে!

মধু গীত, মধু গন্ধ, ললিত ছন্দ . . .

অম্বরে পরকাশে !

যা কিছু আঁধার চকিতে মিলায়,

প্রেমেরি আলো বিকাশে !

সরযূ। বাঃ বেশ !

নিশি। ঠিক মনের মত হয়েছে, না ?

সরযূ। সুরটুকু ভারি মিষ্টি ! তোমার গান আমার বেশ লাগে। এত বলি হার্ম্মোনিয়ম শিখতে !

নিশি। আর কাজ কি ভাই—অতিলোভে তাঁতি নষ্ট ! এই যে দাড় !

দয়ালচন্দ্রের প্রবেশ

সরযূ। দাড় (ছুটিয়া অগ্রসর হইল) এত দেরী ? বাঃও-কাল দুপুরবেলা কেমন বেরোও, দেখবো !

দয়াল। তোমার জন্যেই বেরিয়েছিলুম দিদি !

সরযূ। আমার জন্যে ? ও, তবে বুঝি সেই ছবি এনেছ ? ছবিতে কাপড় পরাব বলেছি, তোমার আর "অমনি" দুদিন তর সইল না ! দেখি !

দয়াল। সে ছবি আনিনি ; তবে তোমার জন্যেই আর এক ছবি এনেছি। (একখানি ফটো বাহির করিল)।

সরযূ। কার ছবি, দাড় ? (ছবি হাতে লইল)

নিশি। কার ছবি, দাড় ?

দয়াল। বরের, বুঝলি পাগলী ?

সরযূ। (ছবি ফেলিয়া দিয়া) যাও !

দয়াল। অমন করে ফেলে দিস নে। (নিশি ছবি কুড়াইয়া দেখিতে লাগিল)

নিশি। আমরা রয়েছি বলে ফেলে দিচ্ছে, জানলে দাড় ! আড়াল পেলেই বুকে তুলে নেবে।

দয়াল। (সহাস্যে) ঠিক বলেছিস্—(সুরে)

(আহা) লাজে বাধে—মরমেরি কথাটুকু সরমে কাঁদে !

সরযূ। (দয়ালের মুখে হাত চাপা দিয়া) যাও, আর গাইতে হবে না ! (টেবিলের উপর বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল)

দয়াল। আচ্ছা, আচ্ছা, আর গাব না। আমার গান গাওয়াটা তোরা নিষ্ঠুরতা বলে মনে করিস্—না ?

নিশি। কেন, দাদু, তোমার গান আমাদের ত বেশ লাগে!

দয়াল। সে তোরা আমার পাকাচুলের খাতিরে শুধু তারিফ করিস বই ত নয়! হ্যাঁ ভালো কথা, এখন ছবিখানার ইতিহাস তবে শোন্। পঞ্চাননের নাম দিয়ে খপরের কাগজে বরের জন্য যে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ছিলুম, তারি জবাবে এই ছবি এসেছে। ঐ যে X. y. Z. বলে Trumpet কাগজে বিজ্ঞাপন দিছলুম না! আঃ, হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল! যত রাজ্যের মেসের বাসা থেকে রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি চিঠি আস্‌ছে!

নিশি। আজ আবার বামালশুদ্ধ গ্রেপ্তার!

দয়াল। হাঁ, ওর সঙ্গে আবার একখানা চিঠি আছে—এই যে। পড়্‌ত ভাই—আমার আবার চশমা কাছে নেই বলে পড়তে পারলুম না!

(সরযূ নিশির দিকে আড়চোখে চাহিয়া ক্ষিপ্র গতিতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল; নিশি তাহাকে ধরিয়া বসাইল)

সরযূ। আঃ ছাড়ো। আমার কাজ আছে।

নিশি। হঠাৎ নিষ্কর্ম্মা থেকে বিয়াল্লিশকর্ম্মা হয়ে উঠলে যে। আমি ও সব শুনতে চাই না। সব ওঁর বাড়াবাড়ি, না?

সরযূ। না, ছাড়ো! দাদু, এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না হ্যাঁ!

দয়াল। কখনো ছাড়িসনে ভাই! (সরযূর হাত ধরিল; সরযূ মুখ বাঁকাইল)

সরযূ। (মৃদু হাসিয়া) সবাই আমার বিপক্ষে লাগলে? আচ্ছা!

দয়াল। নে, তুই এখন পড়্‌ত ভাই।

নিশি। (পত্রপাঠ) "আপনার বিজ্ঞাপনমত একটি পাত্রের ফটো পাঠাই-তেছি। পাত্রটি আমার বন্ধু! পাত্রের নাম যতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; এম্-এ পাশ; অবস্থা ভালো। বাপ হাইকোর্টে ওকালতি করেন। আপনার মত হইলে আমাকে পত্র লিখিবেন, পাত্রের পিতার সহিত পরে কথাবার্ত্তা স্থির হইবে। উপরে ঠিকানা লিখিয়া দিলাম। ইতি শ্রীষষ্ঠীচরণ চট্টোপাধ্যায়"।

এ কি রকম দাদু? ছেলের বাপ রয়েছে, অথচ বন্ধুতে আর নিজেতে মিলে বিয়ের ঠিক করছে।

দয়াল। যে কালের যেমন দস্তুর! আজকাল ত ঐ রকমই হয়েছে। বাপ পছন্দ করে মেয়ে দেখে এল, ছেলে বলে বসল, "সাদী নেহি করেঙ্গা"! হ্যারে নেহি করেঙ্গা কিরে? ওরা বলে কি, জানিস্? বলে, যাকে বিয়ে করব, তাকে

নিজে না দেখলে কি চলে! হাঁঃ, বাপের দৌলতে মানুষ হলি—আর ঐ মেয়ে দেখার সময়ই বাপ হল অর্ব্বাচীন, আর তুই চাণক্যপণ্ডিত!

নিশি। তা এ পাত্রটি একবার দেখ না,দাদু—

দয়াল। ঠিকানাটা কি লিখেছে?

নিশি। ৩২ নম্বর লোচন চৌধুরীর লেন, সিমলা। (সরযূর প্রতি) কিগো, সব ত শুনলে?

সরযূ। যাঃও। ছাড়বে না দাদু? হাতে লাগছে আমার, সত্যি বলছি!

দয়াল। তোকে কি ছাড়তে পারি, ভাই? বিয়ে যদি করতে হয়—

সরযূ। বিয়ে আমি করছি কি না!

দয়াল। বটে! কেন বল্ দেখি?

সরযূ। আমি বিয়ে করবো না।

দয়াল। কেনরে! এমন আশ্চয্যি কথা ত আমি কখনো শুনিনি।

সরযূ। আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। আমাকে বুঝি তাড়িয়ে দিতে চাও? এঁ্যা, বল।

দয়াল। সবাই এমন বলে রে, দিদি! তারপর একবার চারচক্ষুর মিলন হলে এখানে আর পা বাড়াবার সময় পাবিনে!

নিশি। তাই ত এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল, দাদু। ও তোমায় বিয়ে করবে। তা বরটি মন্দ হবে না।

দয়াল। মন্দ কোন্খান্টায়? মাথাটা কেমন ধপ্ ধপ্ করছে!

নিশি। আহা ও'ত কলি ফিরিয়েছ।

দয়াল। আর দাঁত পড়ে গেছে! তা হলেও অনেক ছোকরার চেয়ে ভালো রে! তাদের মাথার চুল কালো চক্চকে হলে কি হবে, মন গুমরে থেকে থেকে বুড়োর চেয়েও তারা পেকে গেছে, বুঝ্লি?

দাসীর প্রবেশ

দাসী। একটি বাবু এসে বসে আছেক বাইরে। বলছে, একটি পাত্র আছেক।

দয়াল। আবার পাত্র! মুখেই বলে পাত্র, আমি ত দেখি ভাঁড়!

নিশি। একটু উঠে-পড়ে লাগো, দাদু! একটা বিয়ে-থা না হলে আমোদ হচ্ছে না।

দয়াল। আমোদ করবার জন্য তা বলে ত আর অমনি যাকে-তাকে পাত্র

করা যায় না! তার চেয়ে বিয়ে না দেওয়াও ভাল! উপযুক্ত পাত্রে বয়স্থা কন্যা দেওয়া ঢের ভালো, তবু অপাত্রে গৌরীদান মহা পাপ!

নিশি। সে কথা ত ঠিক দাদু, কিন্তু পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে যে!

দয়াল! তা ত বলবেই দিদি—পাঁচজনে ভালোর বেলা ত কেউ নেই। হুঃ, এই সমাজটা আমাদের কি হীন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যাচ্ছে! যে তার খেয়ালমত না চলতে পারবে, তারি জন্যে তার বদ্‌ভাষা আর ইতরুমি জমা করা আছে! থাক্ জমা—সমাজ যদি আমায় ত্যাগ করে, তা'ও স্বীকার, তবু সরকে একটা অপাত্রে দিতে পারবো না।

দাসী। তা হলেক কর্ত্তাবাবু, আমি কি বলবগো তাকে?

দয়াল। চ'না আমি যাচ্ছি। হীরেকে তামাক দিতে বলেছিস্ ত?

দাসী। সে আমি বলতেক্ পারবুক না গো বাবু। আমার কথাটুক্ কাণে লিতে সে লারছেক।

দয়াল। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি!

দাসী। হাঁ-তাই আসুক! (দয়াল ও দাসীর প্রস্থান)

সরযূ। তুমি, ভাই, ভারী দুষ্টু, যাও—

নিশি। বটেই ত! এদিকে বসে বসে কথাগুলি সব শোনা হল ত! বিয়ের আগে বিয়ের কথা শুনতে সবারি ভারী ভাল লাগে গো, তোমারি যে, সেটা একচেটে, তা ভেবো না। আমার ত বেশ মনে আছে, ঘটকীগুলো এসে যখনি মা-টার সঙ্গে কথা পাড়তো—আমারো অমনি বোনাটোনায় এমন ভুল হত—ভুল ঠিক করে নেবার অছিলেয় সেখানে যা শিকড় গাড়তুম—যতক্ষণ না ঘটকী মাগী চলে যায়! এই ঠিক বিয়ের আগে ঘটক-ঘটকীগুলোকে এমন ভালো লাগে, যে সে আর কি বলবো!

সরযূ। আচ্ছা, আচ্ছা, সবাইকে নিজের মত ভেবো না, তা বলে!

নিশি। বলি, তুমি এ জায়গাটি ছাড়তে পারনি ত ভাই! যাক্, এখন ছবিখানি একবার নয়ন তুলে দেখ! দিব্যি চেহারা কিন্তু—(ছবি দেখাইল)

সরযূ। (আড়চোখে চাহিয়া) যাও, আমি দেখতে চাই না—

নিশি। বাঁকা কটাক্ষে কেন? সোজা চোখেই দেখ না! এ'ত ছবিমাত্র—কটাক্ষের আদর হবে কেন? দেখ, ভালো করে দেখ। বটে, না দেখ ত, মাথা খাবে!

সরযূ। দেখেছি, বেশ দেখেছি—খুব দেখেছি।

নিশি। কেমন ?

সরযু। অপরূপ ! আহা, অপরূপ ! (সুরে) আঁহা, অপরূপ [illegible]— না, ব্যাকরণ ভুল হয়ে গেল যে ! তবে—তবে ?

দাসীর পুনঃ-প্রবেশ

দাসী। নিখাপড়া কি ফুরোবেক না ? বাপুরে বাপু ! ধোপা মিন্সে চিকুড়িতে লেগেছেক—কাপড়-চোপড় কি দিবেক না-দিবেক পুছ করে করে ত মাথা জ্বলি উঠলোক্ ! কি নিখাপড়া রে বাপু !

নিশি। সত্যি, আমিও ভুলে বসে আছি—দেখিগে কি যাবে। [প্রস্থান]

দাসী। এ চাদরগুলো যাবেক না ?

সরযু। যাবেক্-যাবেক—তুই বালিশের ওয়াড়গুলো দে। আমি দাদুর কাপড়গুলো ততক্ষণ ঠিক করে দেখে দি। [প্রস্থান]

দাসী। খালি নিখাপড়া, খালি নিখাপড়া—চাকরি করবেক নাকি ? [বালিশের ওয়াড় খুলিতে লাগিল]   (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কুশদহ-বৃত্তান্ত

গৈপুর

ইছাপুরের যশোভাতি যখন সমস্ত কুশদহকে উদ্ভাসিত করিতেছিল এমন কি সেই রশ্মী সুদূর দিল্লীর সম্রাটের নিকট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইতেছিল, তখন গৈপুর ধীরে ধীরে নিজ উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছিল। এই সময়ের বহু পূর্ব্বে গৈপুরে সামান্ত কয়েক ঘর গোপ বাস করিত। প্রকৃতি দেবীর কোলে পালিতা এই ক্ষুদ্র গোপপল্লী প্রকৃত প্রস্তাবে একটি চির মধুময় স্থান ছিল। ইহার পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে চালুন্দিয়া নদী যমুনায় [illegible] হ[illegible]তে এবং পশ্চিম দিকে যমুনা নদী থাকায় স্থানটি উপদ্বীপের আকার ধারণ করিয়াছিল। দুইটি নদীর বাণিজ্য তরি আসিয়া এখানে মিলিত হইত। সেই স্মরণাতীত কালের প্রকৃতি-পালিতা, সরলা, গৃহকর্ম্ম-রতা গোপাঙ্গণাগণ যখন যমুনার নীল জলে নিজ প্রকৃতি-দত্ত সুষমা লইয়া গাত্র মার্জ্জনা করিত তখন তাহাদের হরিণ-নিন্দিত :—

"নয়ন অমৃত নদী,   সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজ পতি বিনা কভু অন্য দিকে যে'তনা"

তাহাদের সেই সরলতা, সেই নয়ন স্নিগ্ধকর রূপ-রাশি, এখনকার অলঙ্কার ভারে পীড়িতা, পাউডার, ল্যাভেণ্ডার, লাঞ্ছিতা, সুন্দরীর সহিত অনেক প্রভেদ। এই সময়ে এই স্থানের নাম—গোপীপুর রাখা হয়। কালক্রমে ইহা বিকৃত হইয়া গৈপুর নাম ধারণ করিয়াছে।

কোন প্রাকৃতিক শক্তি বলে যখন চালুন্দিয়া নদী জল শূন্য হইল, তখন গৈপুর গ্রাম দক্ষিণে একটু অগ্রসর হইল। এখন স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি লোকের বসতি এই চালুন্দিয়া গর্ভে। চালুন্দিয়া মজিয়া গেলেও যমুনা নদী যে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রবল স্রোতস্বিনী ছিল তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। তখন যমুনার তীরে সন্ধ্যার প্রাকালে সাত্বিক ব্রাহ্মণ-গণ নিমীলিত নেত্রে পরোপকাররত "প্রমথ নাথের" ধ্যানে নিরত থাকিতেন, আর এখন সেই স্থান থিয়েটার-সঙ্গীত দ্বারা মুখরিত। যে স্থানে এক সময় গোপ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, সেই স্থানে এখন একটিঘর মাত্রও গোপ নাই। এই শান্তিপ্রিয় জাতি নিকটবর্ত্তী বায়সা, কেমিয়া প্রভৃতি গ্রামে উঠিয়া গিয়াছে, বোধ করি এই স্থানর মায়া আজও পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া দুগ্ধ বিক্রয়ের ছলনা করিয়া প্রত্যহ গোপাঙ্গনাগণ এই গৈপুরে আসিয়া থাকে।

অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই কুশদহের নাম 'সমতট' ছিল। এই সমতট কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন। তৎপরে এই স্থানের নাম হয় "গঙ্গারিডি"; এবং এই গঙ্গরিডি দেশের লোককে গঙ্গারিডাই বলিত। ইহারা খুব প্রতাপশালী জাতি ছিল। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অবলম্বন করিয়া ডিয়োডোরস্ লিখিয়া গিয়াছেন "গঙ্গানদী গঙ্গরিডি দেশের পূর্ব্বসীমা দিয়া সাগরে মিশিয়াছে। অসংখ্য রণহস্তিগণের সাহায্যে এই রাজ্য অজেয় ছিল।"

"Gangaridai—This great people occupied all the country about the months of the Ganges. There capital was Ganje………"

Ancient India by Ptolemy.

গঙ্গরিডি নামের পরেই এই স্থান কুশদহ নামে অভিহিত হয়। কেন এইরূপ নামের পরিবর্ত্তন হইল? ইহার উত্তর কালের তিমির গর্ভে প্রোথিত।

আরও এক আশ্চর্য্যের কথা—অতি প্রাচীনকালে আফ্রিকার দেশ বিশেষ "কুশদহ" নামে অভিহিত হইত।

কুশদহের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম হওয়ার কারণ নির্ণয় করা কঠিন।

গৈপুর এক্ষণে দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধক্রোশ; যমুনার তীরে অবস্থিত। লোক সংখ্যা পুর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ ম্যালেরিয়া। যদি এইরূপে প্রতি দশ বৎসরে লোক সংখ্যার হ্রাস দেখা যায় তবে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলিতে পারি :—

" The result will be that in three generations this *Goipur* will be a depopulated one."

শুদ্ধ গৈপুর নয়—কুশদহের সমস্ত গ্রামগুলি এই দশাপন্ন। সুখের বিষয়—দশের বিদ্বান ব্যক্তিরা এ বিষয় চিন্তা করিতেছেন এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টায় আছেন।

গৈপুরের উত্তর সীমায়—যেখানে ঠাকুরবর সাহেবের আস্তানা রহিয়াছে, সেই স্থানকে কাছারি বাড়ি বলিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কাছারি বাড়ি ছিল। এক্ষণে যাহাকে ফকীর পাড়ার ঘাট বলে; পূর্ব্বে তাহাকে কাছারি বাড়ির ঘাট বলিত।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

"দাসের" কৈফিয়াৎ

দীর্ঘ সময় ব্যাপি "দাসের আত্ম-কথা" প্রকাশ হইল। "দাস" শব্দ কেন ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা কোথাও বলা হয় নাই। অবশ্য তাহার কেহ কৈফিয়াৎ চান নাই; অনেক অনেক রকম অর্থ করিয়া লইয়াছেন বোধ হয়।

আমি কি ভাবে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়াছি তাহা বলা আবশ্যক। অন্তত যাঁহারা শ্রদ্ধা বা আগ্রহ সহকারে "দাসের আত্ম-কথা" পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য। যে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সমগ্র আত্ম-কথা বলিয়াছি, ইহাও সেই বিশ্বাসের একটি অঙ্গ, সুতরাং তাহা প্রকাশ থাকা উচিত।

১ দাস শব্দের অনেক রকম চলিত অর্থও আছে। যথা "দাস ঘোষ" "দত্ত দাস" ইত্যাদি—জাতির বিশেষত্বে। ভক্তি পথাবলম্বীগণ "দাস" অথবা সেবক শব্দ ব্যবহার করেন। আমি এরূপ কোন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া দাস শব্দ ব্যবহার করি নাই।

"তুই জন্মভূমি দেশের নিকট আমার এই নবযুগের ধর্ম্ম-বার্ত্তা ঘোষণা করিবি, ইহার মধ্যে তোর পরিত্রাণ ফুটিয়া উঠিবে" এই ঈশ্বর-বাণীর কথা আত্ম-কথার মধ্যে বলিয়াছি। ধর্ম্ম-বার্ত্তা ঘোষণার মূল অর্থ নরনারীর আত্মার সেবা করা। ভগবান্ আমাকে দাসত্ব-ব্রত প্রদান করিয়া দেশের 'দাস' করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি আমার জন্মভূমির "দাস" প্রাণের এই বিশ্বাস লিখিয়া দিয়া আমি আপনাকে বন্ধনের মধ্যে ফেলিয়াছি। আর অস্বীকার করিবার—ভুলিবার উপায় নাই। এই বিশ্বাস মনের উপর জাগ্রত থাকায় আমার জীবনে অনেক উপকার হইয়াছে। "আমি যে দাস" এই আদর্শে আমাকে গঠিত হইতেই হইবে। এখন দেশবাসী দাসের প্রতি কৃপা করুন। ভগবানের পথে—শান্তির পথে সহায় হউন।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আজ আমরা বৎসরের প্রথমে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, খাঁটুরা নিবাসী পরলোকগত ডাক্তার অম্বিকাচরণ রক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিতের পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ রক্ষিত সম্প্রতি বসন্ত রোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিল। আশা ছিল কুশদহবাসি সে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হইবে, কিন্তু দেশের এমনই দুর্ভাগ্য বলিতে হইতেছে যে, যে বিষয়ে একটু ভাল দেখা যায়, অমনি তাহাতেই যেন ব্যাঘাৎ পড়িতেছে।

বাবু রামগোপাল রক্ষিত, আশা করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত খাঁটুরা-দাতব্য-চিকিৎসালয়ের কার্য্য তাঁহার জীবনান্তেও চলিবে, কিন্তু তাহা চলে নাই; কিছু দিন হইতে ঐ স্থানে, গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কার্য্য করিতেছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম সম্প্রতি স্বর্গীয় রামগোপাল বাবুর পত্নী তথায় হোমিওপ্যাথিক দাতব্য-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে।



কালিদাস ও সরস্বতী

বাছা, প্রাণত্যাগ করিও না। আজ হইতে আমার বর-পুত্র হইলে।

[শিশু হইতে গৃহীত]

Color Blocks & Printing by
K. V. SEYNE & Bros. CALCUTTA

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"তোমারি নামে ফুটেছে ফুল,
গন্ধে প্রাণ করেছে আকুল,
যতনে গাঁথিয়া এনেছি মালা
আদর ক'রে একবার পরনা।"

সপ্তম বর্ষ, | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ | দ্বিতীয় সংখ্যা

আত্ম-প্রকাশ

তুমি বড় বড় ধর্ম্মকথা বলিতে পার, গভীর নীতি উপদেশ দিতে পার, কিন্তু তুমি একটি প্রকৃত মানুষ তৈরী করিতে পার না যদি তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব না থাকে। তুমি একটি টাকা গ্রহণ করিবার সময় পাঁচ বার বাজাইয়া দেখ, আর মানুষ তোমার কোন পরীক্ষা না করিয়া তোমার কথায় সায় দিবে, এমন হয় না। তুমি অধ্যাপক হও, আচার্য্য হও, যাই হওনা কেন, মানুষ আগে দেখিবে তুমি কি পদার্থ। তোমার বাক্য, তোমার কার্য্য তোমাকে প্রকাশ করিবে। (সংগ্রহ)

সত্য-স্বরূপ

গতবারে আনন্দ-স্বরূপের কথা বলিয়াছি। এবার সত্য-স্বরূপের কথা কিছু বলিব। এক শ্রেণীর মানুষ বলে, "সত্য মিথ্যা আমরা কিরূপে বুঝিব; যখন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝি তাহাই করিয়া যাই। এইটিই খাঁটি সত্য এ কথা কে বলিতে পারে।" যে সত্য কথা বলে না, সত্য ব্যবহার করে না সেও কার্য্যকালে প্রয়োজন হইলে বলে, "সত্য কথা বল।" মানুষ সত্য বুঝিতে চেষ্টা করুক আর নাই করুক সত্যের গতি হইতে কেহই সম্পূর্ণরূপে আপনাকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে পারে না,—প্রত্যেক মানব জীবন সত্যেই রচিত। সত্য পরিশূন্য মানব-জীবন আকাশকুসুমবৎ। সত্য না হইলে মানবজীবন চলে না।

সত্যের প্রকাশ অনেক রকমে হয়। তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। মূল সত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। তবে প্রকাশিত সত্যের তিনটি প্রধান অবস্থা,—দেশ, কাল, আধার এই তিনের ভিতর দিয়া সত্য প্রকাশ পায়। প্রকাশিত সত্যের অন্তরালে আর একটি অবস্থা আছে তাহাকে নিত্যাবস্থা বলে, সে অবস্থা সত্য-স্বরূপ ভগবানের। সেই ভাবটি বুঝিতে না পারিলে ঠিক ভাবে সত্য বোঝা যায় না। মানবজীবন মাত্রেই বড় চঞ্চল; প্রকাশিত সত্য, যাহা স্থান, কাল বা সময়, এবং আধারে প্রকাশ, তাহাও স্থির ভাবাপন্ন নহ—পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং চিত্তের স্থিরতা সাধন করিতে হইলে সত্য-স্বরূপ ভগবানকে ধরিতে হইবে। মানবজীবনের পক্ষে এক অদ্বিতীয় সত্য স্বরূপ ভগবান ভিন্ন আর সার সত্য কিছুই নাই। এই বিশ্ব-জগত তাঁহারই প্রকাশ বটে, কিন্তু মানুষ কেবল জাগতিক বিষয় লইয়া তাহাতেই মুগ্ধ থাকিলে সত্য-স্বরূপ ভগবানকে বুঝিতে পারে না; শান্তিলাভ করিবেই বা কিরূপে? প্রকাশিত সত্য চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ভগবানের কোন পরিবর্ত্তন নাই। মানবের ব্যক্তিত্ব হিসাবে দেখিলেও দেখা যায়, যে মানুষ শিশু, সেই আবার যুবক, কিছুদিন পরে সেই বৃদ্ধ। পরিবর্ত্তন হয় তাহার অবস্থার, কিন্তু ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন হয় না।

সাধারণ মানুষ যে এত চঞ্চল তাহার একমাত্র কারণ, মানুষ মূল সত্যের জ্ঞান ছাড়িয়া প্রকাশিত সত্য লইয়াই ব্যস্ত। যাহা পরিবর্ত্তনশীল যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহাকেই চিরদিন ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহা হয় না, মানুষ ব্যর্থ মনোরথ হইয়া বলে,'—হা! ধন, মান, যৌবন বল, স্বাস্থ্য! তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। কিন্তু যাহা ধরিলে পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তিত অবস্থা উপলব্ধি হয় সে যে জ্ঞানের পথ—ভক্তির পথ। যিনি সে পথ ধরিয়াছেন তিনি মানবজীবনে ধন্য হইয়াছেন। তিনি প্রকাশিত সত্যে মুগ্ধ হন না, পরিবর্ত্তনে তাঁহার প্রাণে অস্থিরতা আনে না। তিনি স্থির সত্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া সেই সত্য-স্বরূপের প্রকাশ দৃশ্যমান লীলাতরঙ্গ দর্শন করেন। ভক্ত জনমে হৃষ্ট, মরণে বিমর্ষ হন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে লীলাময় সত্য-স্বরূপকেই অন্বেষণ করেন, ভক্তি বিশ্বাসের আরো উপকরণ সংগ্রহ করেন। মোহ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। মানব দেহধারী জীবের মধ্যে ভক্ত বিশ্বাসীগণ ধন্য; আমরা তাঁহাদের পদধূলী গ্রহণের যোগ্য হইলে কৃতার্থ হই।

মূল সত্য জানিবার পথ প্রধানত দুইটি, (১) স্বতঃসিদ্ধ "বিশ্বাস," (২)

নিত্যানিত্য বিচার "জ্ঞান"। মা আছেন, ইহা শিশুর স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। দার্শনিক বিচার করিয়া শিশু মাকে বোঝে না। সৃষ্টির মধ্যে অন্বেষণ করিয়া স্রষ্টার জ্ঞান লাভ করা জ্ঞানের পথ। দৃশ্যমান জগত বা প্রকাশিত সত্য দেখিয়া মূল সত্যে পৌছিতে হইবে, নতুবা এ চঞ্চল মানবজীবনে শান্তির আর অন্য পথ নাই।

ভগবান আছেন এ বিশ্বাস কাহার নাই? তবু কেন মানুষ শান্তিহারা! ভগবান আছেন কেবল মুখে বলিলে কি হইবে, ভগবান সত্য-স্বরূপ, জানিয়া তাঁহার সেই স্বরূপে ভক্তি প্রেমে মজিতে হইবে। জীবনের উদ্দেশ্য কি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

"সংসার আমার" দেহধারী আমি প্রকৃত "আমি," এই জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত কেহ শান্তি পাইতে পারে না। সত্য-স্বরূপ ভগবান সার "আমি" তাঁহায়, আমি দেহ নহি "আত্মা", এ সংসার স্ত্রী পুত্র আমার কেহ নয় সকলই ভগবানের, আমি "দাস" মাত্র, এই জ্ঞান না হইলে শান্তি পাওয়া যায় না। এই স্থির জ্ঞান লাভের মূল, সত্য-স্বরূপ ভগবান্।

অমর কবি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতি

আজি সেই প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্দ্ধানের তৃতীয় বর্ষ। অনেক দিন পর্য্যন্ত এই কবি বসন্ত কোকিলের ন্যায় পত্রান্তরালে অবস্থান করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার মধুর তানে বঙ্গনিকুঞ্জ মোহিত করিতেন। তাঁহার গানে আমরা যেমন মন খুলিয়া হাসিয়াছি, এমন আর কাহারও গানে নির্ব্বিকারচিত্তে হাসিতে পারি নাই। তাঁহার রসিকতা কাহারও শরীর অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করে নাই, কিন্তু প্রিয় বন্ধুর উপহাসের ন্যায় অকৃত্রিম আমোদপ্রদ। প্রথমে সেই আমোদের গানেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের পরিচয়, বঙ্গদেশের প্রতি জেলায় যখন তিনি গিয়াছেন, তখনই শিক্ষিত সমাজে হাসির ফোয়ারা উন্মুক্ত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে অনেক সঙ্গীত রচয়িতা আবির্ভূত হইয়াছেন, অমূল্য অতুল্য আধ্যাত্মিক গানই উনবিংশ শতাব্দীর গৌরব। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনটি কলকণ্ঠ কবি-বিহঙ্গ, বঙ্গ-নিকুঞ্জকে মোহিত করিয়াছেন, তিন জনই কবি ও সুগায়ক, বোধ হয় নিজে সুগায়ক না হইলে সঙ্গীত সুন্দররূপে প্রকাশিত হয় না। তন্মধ্যে কবিবর

রবীন্দ্রনাথ, প্রতিভাসম্পন্ন দ্বিজেন্দ্রলাল ও অকালমৃত সর্ব্বজন অনুশোচিত রজনীকান্ত। ধর্ম্ম-সঙ্গীত, স্বদেশ-সঙ্গীত ও আমোদ-সঙ্গীত, সর্ব্ব বিষয়েই ইঁহারা বরেণ্য, কিন্তু আমি তুলনা করিতে চাই না।



কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা প্রথমে সঙ্গীতে পরে নাটকে পরিস্ফুট হইয়াছিল। প্রথমে আমাদের দেশের অভাবানুসারে নাটক বিরচিত হইত, কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, সুরাপান, বিধবার দুঃখ, রাজনৈতিক নাটক সময়ের অভাব ও রুচি অনুসারে রচিত হয়। পরে কয়েকজন মহাকবি এই নাটকের দিকে আগমন করেন, অমর কবি মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমযুগের শ্রেষ্ঠ লেখক দীনবন্ধু ও ধর্ম্মপ্রচারক চিরঞ্জীব. তিনজনের

নাটক আমরা ছাত্রজীবনে প্রশংসা করিয়াছি। যখন ছাত্রজীবনে দীনবন্ধুর লীলাবতী ও বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী বাহির হইল,তখন আমার মৃত বন্ধু ও আত্মীয় কৈলাসচন্দ্র সেন কবিরত্ন, যিনি সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয়, অনেকদিন কলিকাতায় কবিরাজী করিয়া উপযুক্ত বয়সে স্বর্গগত হইয়াছেন, তাঁহার সহিত তর্ক করিয়াছিলাম, তিনি বলিতেন,—দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা লীলাবতী অনেক শ্রেষ্ঠ, কালে বঙ্কিমের প্রতিভা দীনবন্ধুর যশকে অতিক্রম করিয়াছে, বোধ হয় নাটকের প্রতিপত্তি ক্ষণস্থায়ী, মাইকেলের মেঘনাদ বধ না থাকিলে নাটক দ্বারা তাঁহার নাম থাকিত না। নাটককার-মধ্যে ইংলণ্ডে অসাধারণ সেক্‌সপীয়র ও সংস্কৃতে কালিদাস ও ভবভূতি জীবিত রহিয়াছেন, কিন্তু বাংলায় বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা কাব্যের নিকট কোন শকুন্তলা নাটক স্থান পায় নাই। এজন্যই শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় নাটকের কথায় বলিয়াছিলেন, ইহা না-টক, না-মিষ্ট।

ইহার পর শিশিরবাবুর নয়শো রূপেয়া, উপেন্দ্রবাবুর শরৎসরোজিনী প্রভৃতি, বৃদ্ধ পণ্ডিতের ভারতের সুখশশী যবন-কবলে। পরে মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইঁহারাও বঙ্গভাষায় স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইবেন কি না, কে জানে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' তাঁহার সঙ্গীত ও কাব্যের সহিত তুলনীয় নহে। কিন্তু শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক বিষয়ে যে অক্ষয় প্রতিভা দেখাইয়াছেন, তাহা বোধ হয় এই অনিত্য যশোপ্রাপ্ত নাটক মধ্যে স্থায়ী যশ প্রাপ্ত হইবে। কোথা হইতে স্বর্গীয় বচন-বিন্যাস ও ভাব আসিয়াছে, পড়িলেই বোধ হয় ইহা শ্রেষ্ঠ কারিকরের হাতের জিনিষ। আরংজীব লিখিয়া অনেকেই মুসলমানদের গালাগালি খাইয়াছে, কিন্তু ডি-এল রায়ের সাজাহান, যাহা আরংজীব নামে অভিহিত হইলে প্রকৃত নাম হইত, তাহা আরংজীবের গুণ ও দোষ এমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছে, যে আমরা আরংজীবের রাজনৈতিক চক্রগুলিও যেন প্রশংসমান চক্ষে দেখি। মেবার পতনের ভিতরে প্রাণে সেই চির স্বাধীনতা বিরাজিত মরকত-কুঞ্জ চিতোরের পতনে প্রাণে যে শোকানল প্রজ্বলিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই ধর্ম্মচ্যুত মহাবীর মহবৎ খাঁর ন্যায় অভিমানেও প্রাণ তেমনই কাঁদে। এইরূপে তাঁহার প্রত্যেক দৃশ্যে মহা কারিকরের লেখনীপটুতায় আমরা আকৃষ্ট হই। দ্বিজেন্দ্রলাল সুরুচির পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ কালে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত অনেক সামাজিক বিষয়ের আলোচনা হয়। আমি কখন বেশ্যাভিনীত থিয়েটার দেখি নাই, একথা শুনিয়া

তিনি ব্রাহ্মদের নীতি-বিষয়ে বেশ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। আমাকে 'ভারত-বর্ষে'র পুস্তক-সমালোচক হইতে বলিয়াছিলেন,কিন্তু আমি এ বয়সে আর অধিক পড়িতে পারিব না, বলিয়া আপত্তি করিলাম।

আর একদিন ভক্তিভাজন অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অভিনন্দন জন্য একগাড়ীতে দমদম যাই, ও একগাড়ীতে আসি। সেদিন জলে কলিকাতার রাস্তা পরিপূর্ণ আমরা প্রায় এক মাইল রাস্তা জল পার হইয়া বাসায় আসিলাম, বোধ হয় সেইরূপ কষ্টভোগের পরেই তাঁহার রোগজীর্ণ শরীর ইহকালের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিল। আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। সেইদিন ভারত অশ্রুজলে যে রত্ন বিদায় দিয়াছে কতদিন পরে তেমন রত্ন আর ভারত গগন উজ্জ্বল করিবে, যিনি অনন্ত আকাশে অনন্ত সৌন্দর্য্যের বিকাশে চিরদিন নিয়োজিত, তিনিই তাহা অবগত আছেন।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

শ্মশান

(১)

ওরে শ্মশান, তোর কি ভীষণ মূরতি!
যোগিগণ কুতূহলে,
প্রেমময়ে পাবে বলে'
করিছে সাধন অঙ্গে মাখিয়ে বিভূতি,
ওরে শ্মশান, তোর কি ভীষণ মূরতি!
রোদনের সনে মিশি,
'ববব্যোম' দিবা নিশি,
নিরন্তর নিনাদিত করিছে রে শ্রুতি,
ওরে শ্মশান তোর কি ভীষণ মূরতি!
শকুনি আকাশে ফিরে,
ভূতলে শৃগাল চরে,
বিচরিছে সারমেয় করি কত স্ফূর্ত্তি,
নরমাংসে রসনার সাধিবারে তৃপ্তি।
ওরে শ্মশান, তোর কি ভীষণ মূরতি

(২)

ওরে শ্মশান তোর কি ভীষণ মূরতি !
শূন্য করে' মাতৃ, অঙ্ক,
সাজায়েছিস্ চিতা-অঙ্ক,
কাঁদাস্ পুত্রের শোকে মাকে দিবা রাতি।
ওরে শ্মশান, তোর কি ভীষণ মূরতি !
শোকাতুরা কে অঙ্গনা,
বিলাপিছে স্বামী বিনা,
শূন্য গৃহে কেমনে রে ফিরে যাবে সতী ?
ওরে শ্মশান, তোর কি ভীষণ মূরতি !
মাতৃহারা 'মা, মা' বলে'
লুটা'তেছে ভূমি-তলে,
এবে কে চাহিবে স্নেহে তার মুখ-প্রতি ?
কেঁদে সারা হই হেরে তার দুর্নিয়তি।
ওরে শ্মশান, তোর কি ভীষণ মূরতি !

(৩)

ওরে শ্মশান, তোর কি ভীষণ মূরতি !
মণি-মাণিক্যের সাজ,
কত রাজা মহারাজ,
জীবনান্তে রেখে গেছে তব অঙ্কে স্মৃতি।
ওরে শ্মশান, তোর কি ভীষণ মূরতি !
কত বা দরিদ্র দীন,
মিশিতেছে প্রতিদিন,
বুঝেছি—বুঝেছি ওরে সংসারের গতি !
ওরে শ্মশান, তোর কি ভীষণ মূরতি !
তুই রাজা কি প্রজার
কভু করিস্ না বিচার,
সকলেরে সমভাবে দিস্ কোল পাতি';
তাই বুঝি এ শকতি দেছে বিশ্বপতি !
ওরে শ্মশান, তোর কি ভীষণ মূরতি।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

পথ্য

(৪)

৩১। শিশু ও রোগীর পক্ষে ফল উৎকৃষ্ট পথ্য। প্রায় সকল ফলেরই কিছু-না-কিছু সারকগুণ আছে। এজন্য কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ফলের রস হিতকর। পেঁপে, আঙুর, কমলা লেবু, কিশমিশ, মনেক্কা, পাকা বেল, খেজুর ও কলা কোষ্ঠবদ্ধে উপকারী। আম, কাঁটাল, তাল, তরমুজ, নারিকেল, খর্জ্জুর, আঙুর, পানিফল প্রভৃতিতে শর্করা আছে; সুতরাং ঐ সকল ফল মধুমূত্র রোগীর সুপথ্য নহে। এই রোগে ডালিম, পেস্তা, বাদাম আখরোট, কালজাম, টোপাকুল, দেশী আনারস, কমলা নেবু, ও বাতাবি নেবু প্রভৃতি ফল ব্যবহার করা যাইতে পারে। যকৃতের ক্রিয়া বিকারে অম্লমধুর ফল অধিক উপযোগী।

৩২। সুমিষ্ট ও সুপক্ক আম্র স্নিগ্ধ, বলকর, বাতঘ্ন, হৃদ্য, বর্ণ প্রসাদক এবং অগ্নি, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, অধিকাংশ রোগীকেই ইহা অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। অতিসার আমাশয় ও গ্রহণী রোগে আম সুপথ্য নহে।

কাঁচা আম অত্যন্ত অম্লরস যুক্ত, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক এবং রক্ত দূষক। সুতরাং ইহা রোগীর অপথ্য। যাহাদের শর্দ্দি, কাশী, বাত বা অম্লরোগ আছে তাহাদের পক্ষে ইহা কখনই হিতকর নহে। ইহার উপাদান এইরূপ:—

জল	...	প্রতিশত ভাগে	...	৯০-৬৯
প্রোটীড	...	ঐ	...	.৫৯
শর্করা	...	ঐ	...	৬.৩৮
লবণ	...	ঐ	...	.২৭
অম্ল	...	ঐ	...	১.৯৩

স্কার্ভি রোগে ইহা পথ্য রূপে দেওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন চৈত্র বৈশাখ মাসে যখন দেশে কলেরা আসিয়া দেখা দেয় তখন প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির কাঁচা আমের ঝোল নিত্য ব্যবহার করা উচিত;—ইহা দ্বারা কলেরা বীজানু ধ্বংশ হয়।

৩৩। কাঁঠাল, ফুটি, তরমুজ, খরমুজ, প্রভৃতি ফল অত্যন্ত গুরু পাক। ইহারা রোগীর পক্ষে হিতকর নহে। মূত্রকৃচ্ছ রোগে তরমূজের সরবৎ উপকারী।

৩৪। পেঁপে কাঁচা অবস্থায় পাচক এবং পাকা অবস্থায় সারক। শাস্ত্রে ইহার গুণ এইরূপ লিখিত আছে—

"পারীশং শীতলং রুচ্যং দীপনং পাচনং সরম্।
মধুরং রক্তপিত্তঘ্নং বিশেষাদর্শসে হিতম্॥"

ইহা শীতবীর্য্য, রুচিকর, আগ্নেয়, পাচক, সারক, মধুররস ও রক্তপিত্ত নাশক। অর্শ রোগে ইহা বিশেষ হিতকর পথ্য। পেঁপের আঠায় "পেঁপেইন্" নামক এক প্রকার পাচক বীর্য্য আছে। রোগীকে কাঁচা পেঁপের তরকারী দিতে হইলে পেঁপে কুটিয়া ধৌত না করিয়াই সিদ্ধ করা উচিত।

পুরাতন চাউল, কচি ছাগ অথবা কুক্কুট-মাংস এবং কাঁচা পেঁপে একত্র করিয়া অল্প মাখন, লবণ, মসলাক্ত জলের সহিত বহুক্ষণ কাষ্ঠের জ্বালে সিদ্ধ করিলে একপ্রকার পথ্য প্রস্তুত হয়। ইহার নাম "পিস্প্যাস্"। পুরাতন অজীর্ণ রোগে এই পথ্য পরম হিতকর।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগে জল খাবারের সহিত পাকা পেঁপে খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য আর কিছুই করিতে হয় না। উদরাময় রোগীর পক্ষে পাকা পেঁপে নিষিদ্ধ।

মনে রাখিয়ো কোন ফলই অত্যন্ত পাকিয়া যাইলে ভক্ষণ করা উচিত নহে।

৩৪। পাকা কলা পুষ্টিকর ও ঈষৎ রেচক। অরুচি, কার্শ্য, মেহ ও নেত্র রোগে ইহা উত্তম পথ্য। ভিন্ন ভিন্ন কলার উপাদান ঃ—

	জল প্রতিশত ভাগে	প্রোটীড	তৈলময় পদার্থ	শর্করা	লবণ
কাঁটালিকলা	৬৭·৬৮	১·৩৫	·৫	১৬·১১	·৭৭
চাটিম্‌কলা	৭৩·৩২	১·৫০	—	১৭·৭৮	·৭৩
চাঁপাকলা	৭১·৪৭	১·৮০	·১৩	১৪·১৫	·৯৭

পাকাকলা ও অন্যান্য সকল ফলই ভালরূপে ধৌত না করিয়া আহার করিতে নাই। অনেক সংক্রামক রোগের বীজাণু এবং ক্রিমি প্রভৃতির ডিম্ব ফলের গাত্রে লিপ্ত থাকে।

৩৫। আনারস আগ্নেয় ও স্নিগ্ধকর। ক্রিমি রোগে ইহা সুপথ্য। ডাক্তার বেলি বলেন সুপক্ক আনারস খাইলে পাণ্ডু রোগ আরোগ্য হয়। ইহা রোগীর পক্ষে বেশ মুখরোচক। জ্বর অবস্থায় বমন থাকিলে এই পথ্য বিশেষ উপযোগী। শ্লেষ্মাপ্রধান রোগীর পক্ষে ইহা সুপথ্য নহে।

৩৬। জাম আগ্নেয়, বায়ুনাশক ও সঙ্কোচক। ইহার বিলক্ষণ পাচক শক্তি

আছে। পরিপাক-বিকার, রক্তদুষ্টি ও দাহ রোগে ইহা সুপথ্য। গোলাপ জাম রুচিকর বটে কিন্তু গুরুপাক। বাতাবি লেবু, কমলা লেবু, দাড়িম ও বেদানা স্নিগ্ধকর, এজন্য প্রায় সকল রোগীকেই ঐ সকল ফল দেওয়া যাইতে পারে। কিশমিশ ও আঙুর সারক এবং পুষ্টিকর।

আতা হৃদ্য কিন্তু শ্লেষ্মাজনক। দাহ, তৃষ্ণা ও বমন রোগে ইহা সুপথ্য।

তাল, কুল, পেয়ারা, খর্জ্জুর, দুষ্পাচ্য।

ওলাউঠার সময় পেয়ারা খাইয়া ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে শুনা গিয়াছে।

তালশাঁশের জল বমন হিক্কারোগে উপাদেয় পথ্য।

৩৭। বেল সুপক্ব অবস্থায় মৃদু বিরেচক; অপক্ব ফল আগ্নেয় ও সঙ্কোচক। গ্রহণী, উদরাময় ও আমাশয় রোগে ইহা অদ্বিতীয় পথ্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"গুড়েন খাদিতং বিল্বং রক্তাতিসার নাশনম্"।

কাঁচা বেল-পোড়া ইক্ষুগুড়ের সহিত খাইলে আমাশয় রোগ বিনা ঔষধই প্রায় আরোগ্য হয়।

অর্দ্ধপক্ব বেলের শাঁস ১ ছটাক, জল ২ ছটাক ও শর্করা ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিলে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, উহা উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে বিশেষ উপকারী।

অভ্যস্ত কোষ্ঠবদ্ধে (Habitual Constipation) সুপক্ব বেল বা উহার সরবৎ মহোপকারক। কৎবেল ধারক; ইহা পিপাসা, হিক্কা, বায়ু ও পিত্তনাশক। তামিল দেশীয় চিকিৎসকেরা উদরাময় ও অতিসার রোগে ইহা ব্যবহার করেন। পাকা কৎবেলের সরবৎ রক্তাতিসার রোগে সুপথ্য।

৩৮। নারিকেল হৃদ্য, পোষক ও বস্তিশোধক! পিত্ত-জ্বরে কোমল শাঁস সুপথ্য। যক্ষ্মা রোগে শাঁস-নিঃসৃত সদ্যঃ দুগ্ধ হিতকর।

ডাবের জল উপাদেয় পানীয়। এই জল পাকস্থলী হইতে শীঘ্রই দেহাভ্যন্তরে শোষিত হয়। উহা শীতল, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নির উদ্দীপক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, পিপাসা-নাশক, পিত্তঘ্ন, মধুর রস ও বস্তিশোধক। এই জলে কোন প্রকার জীবাণু নাই। যে সকল রোগীর আহারের পর পাকস্থলীতে অম্লজনিত বেদনা উপস্থিত হয় তাহাদের পক্ষে আহারের পর ডাবের জল পান করা সুব্যবস্থা।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ডাবের জল সুপথ্য। ইহা দ্বারা প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

হিক্কা ও বমন রোগে ইহা হিতকর পথ্য। পাকস্থলীর উগ্রতা-নিবন্ধন কোনকোন শিশু দুগ্ধ পান করিবামাত্র তুলিয়া ফেলে তাহাদের মধ্যে মধ্যে এক এক চামচ

ডাবের জল পান করাইলে রোগের শান্তি হয়। কলেরারোগীর পিপাসানিবারণের জন্ত ইহাই উৎকৃষ্ট পানীয়। জ্বররোগে পিপাসা শান্তির জন্তও ইহা অনায়াসে পান করা যায়। এতদ্দেশীয় অনেক লোক মনে করেন যে জ্বর অবস্থায় ডাবের জল পান করিলে রোগ বৃদ্ধি হয়। ইহা কুসংস্কার মাত্র। ফলত ইহা দ্বারা কোনই অপকার হয় না। বাত রোগীও ঐ জল নিরাপদে পান করিতে পারেন।

ডাবের জলের উপাদান এই রূপ :—

জল	...	প্রতি শতভাগে	...	৯২·৩২
প্রোটীড	...	ঐ	...	·৬২
শর্করা	...	ঐ	...	৬·২০
লবণ	...	ঐ	...	·৮৬

ঝুনা নারিকেল নিজে গুরুপাক কিন্তু অল্প মাত্রায় মুড়ির সহিত খাইলে অম্ল রোগে বিলক্ষণ উপকার করে। ইহার জলে লবণের অংশ ডাবের জল অপেক্ষা কিছু অধিক এবং প্রোটীড ও শর্করা জাতীয় উপাদানের ভাগ কিছু কম। এই জল গুরুপাক ও মলভেদক।

৩৯। তরকারির মধ্যে আলু, মানকচু, কাঁচাকলা, কুমড়া, লাউ, বেগুণ, পটোল, উচ্ছে, মোচা, ফুলকপি সুপথ্য। মূলা, বাঁধা কপি, শশা, বিট্, পেঁয়াজ প্রভৃতি দুষ্পাচ্য। আলুতে শ্বেতসারের অংশ অত্যন্ত অধিক। একারণ ইহা মধুমূত্র রোগীর অপথ্য। ইহার প্রতিশত ভাগে ৭৪ অংশ জল, ২ অংশ প্রোটীড, দশমিক যোল অংশ তৈলময় পদার্থ, ২১ অংশ শ্বেতসার ও শর্করা এবং ১ অংশ লবণজাতীয় উপাদান আছে, আলু স্তন্তবর্দ্ধক। খোসা সমেত সিদ্ধ করিলে ইহা অপেক্ষাকৃত শীঘ্র পরিপাক হয়।

রাঙা আলু, বিলাতী কুমড়া, মানকচু, কাঁচাকলা এবং ওল মধুমূত্র রোগীর অপথ্য। এই রোগে পটোল, ডুমুর, যজ্ঞ ডুমুর, থোড়, ঝিঙে, উচ্ছে, কপি, সজিনার ডাঁটা উপকারী। কচি বেগুণ কফ ও পিত্ত নাশক। পাকা বেগুণ পিত্তকারক ও গুরু।

কুক্কুটাণ্ডের ন্তায় শ্বেত বেগুণ অর্শ রোগে হিতকর।

পটোল হৃদ্য, শুক্রকারক, লঘু, অগ্নিদ্দীপক স্নিগ্ধ এবং কাশ রক্তদোষ, জ্বর ও ক্রিমি নাশক।

উচ্ছে অগ্নিদ্দীপক ও লঘু; ইহা জ্বর পাণ্ডু ও ক্রিমিরোগে উপকারী। কেহ কেহ বলেন ইহা বসন্ত রোগের প্রতিষেধক।

ডুমুর পোষক ও মৃদু বিরেচক। রক্তোৎকাস ও মূত্রের বিবিধ পীড়ায় যজ্ঞডুমুর সুপথ্য।

শোথে মানকচু, রক্তপিত্তে থোড় এবং অর্শ প্লীহা ও গুল্ম রোগে ওল হিতকর পথ্য।

৪০। অধিকাংশ শাকই রোগীর অপথ্য। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"শাকেষু সর্ব্বেষু বসন্তি রোগা

স্তে হেতবো দেহবিনাশনা"।

সর্ব্ব প্রকার শাকের মধ্যে পল্‌তা জ্বর, কাশ ও ক্রিমি নিবারক।

হেলেঞ্চা শোথ, কফ ও পিত্তনাশক।

পুনর্ণবা পাণ্ডু ও শোথ হারক এবং ব্রহ্মীশাক স্বরভঙ্গ, অপস্মার ও উন্মাদ রোগে হিতকর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কর্ম্মফল

(গল্প)

হরিশ মুখোপাধ্যায় স্বকৃতভঙ্গ কুলীন, কিন্তু বিবাহ করিয়াছিলেন মোটে একটি, প্রজাপতির মর্জ্জি। বাল্যকালে মাছ ধরিয়া আর ঘুঁড়ি উড়াইয়া সময়ের সদ্ব্যবহার অনেক করিয়াছিলেন, তাই মা সরস্বতীর দৃষ্টিটা ভালরূপ তাঁর উপরে পড়ে নাই, সুতরাং অনেকগুলি অপগণ্ড আর স্ত্রী লইয়া যখন মহাবিব্রত হইয়া পড়িলেন তখন নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল নিরন্নের অন্নক্ষেত্র অন্নপূর্ণার রাজত্ব কাশীধামে গিয়া সংসার পাতিলেন। অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেহ উপবাসী থাকে না। হরিশেরও একটি পাণ্ডার আপিসে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে যাত্রীতোলায় কর্ম্ম জুটিল। শশী সধবা খাইত, নিজেরও দণ্ডিভোজন, ব্রহ্মচারী ভোজনে দু'পয়সা উপরি উপার্জ্জন হইত। যাহাহউক একরকম অন্নকষ্ট ঘুচিল। অন্নপূর্ণা কৃপা করিলেন বটে, কিন্তু মা ষষ্ঠীর ত্রিনেত্রের প্রখর দৃষ্টিতে হরিশের প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইল। পত্নী শশীমুখী চৌদ্দ মাস অন্তর একটি করিয়া পুত্র বৃদ্ধি করিতে লাগিল; কি করিবে হাত তো নাই। সংসারে কাজকর্ম্ম করিবার দ্বিতীয় লোক ছিল না। অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা লইয়া শশী বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। যখন দেশে ছিল, পাড়া প্রতিবাসীরা কত কাজ করিয়া দিত, কেলোকে তো হরিদাসীই কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। এ বিদেশে আর কেবা

স্নেহময়ী পল্লী নাই—তেমন স্নেহের ও পরিচিত চক্ষেও কেহ দেখে না, সুতরাং হরিশের পত্নীর একা সংসার করা বড় দায় হইয়া পড়িল। শশী বড় নিরীহপ্রকৃতি রমণী ছিল। তার মুখে কেহ কখন একটি উঁচু কথা পর্য্যন্ত শোনে নাই। গোপালপুরের লোকেরা তাহাকে মূক বধির বলিয়া জানিত। পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা যখন তাহার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইত, মারামারি করিত, উপরন্তু তাহাদের মা-মাসীরা আসিয়া গালি দিত, আর শশীকে পুত্র উৎপাদনের অপরাধে দশ কথা বলিয়া যাইত, কিন্তু শশী একটি কথারো প্রতিবাদ কখন করে নাই, সেই কারণে যাহারা গালি দিত, তাহারাই আবার শশীর সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিত না।

প্রথম প্রথম কাশীতে আসিয়া তাহার বড় কষ্ট হইয়াছিল তাহার সেই নির্জ্জন লোকবিরল গ্রাম্য বাসভূমি, সেই পুকুর পাড়ের দীর্ঘশাখ-নারিকেল-কুঞ্জ, সেই বিহঙ্গকুল-কাকলী-কলরিত নিবিড় আম্রবনের পরিবর্ত্তে বাঙালীটোলার দীপালোক-বিরল জনকোলাহল-মুখরিত দুর্গন্ধময় গলি, আর গোপালপুরের রৌদ্রালোক-আলোকিত মুক্ত সমীরণ-শীতল বিস্তীর্ণ অঙ্গনভূমির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরখানি, তাহার সেই নিকানো দাবাটি, অঙ্গন-পার্শ্বের তুলসীমঞ্চ, এগুলির পরিবর্ত্তে এক নিম্নতলস্থ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন সেঁৎসেঁতে ঘরে বাস, তাহার বড়ই বিরক্তিজনক হইল, কিন্তু "পেটে খেলে পিঠে সয়" অনাহার অর্দ্ধাহারের পরিবর্ত্তে পরিতৃপ্ত ভোজনারামে এ কষ্টটা শীঘ্রই তাহার অভ্যাস হইয়া গেল। সে আর পূর্ব্ববৎ ক্লেশানুভব করিত না। ক্রমে এক রকম করিয়া সব গুছাইয়া লইল, দু'এক জন প্রতিবাসিনীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হইল।

২

পাড়ায় হরিধন গাঙ্গুলীর নয়টি মেয়ে, প্রায় অর্দ্ধেকগুলি অবিবাহিতা। কুলীনের মেয়ের বর জোটে না, আর যদি দরিদ্র সংসার হয় তো কথাই নাই, নীরদার বয়স কুড়ি উত্তীর্ণ হয়, হরিধন পাগলের মতো বরান্বেষণে ব্যস্ত, কিন্তু কোন স্থান হইতেই বরের সন্ধান হইল না। কারণ, একে তো কুলীন তাতে আবার এক পয়সাও ব্যয় করিতে অক্ষম, এ-হেন হরিধনের জামাতা সংগ্রহ যে কি ভয়ানক অস্বাভাবিক ব্যাপার, তাহা কুলীনজাতির অজ্ঞাত নাই, অতএব হরিধনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

এদিকে শশী বছরে-বছরে একটি করিয়া পুত্র বৃদ্ধি করিয়া ভারি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। হরিশকে প্রায়ই বলিত, "গোপালপুর হইতে ওপাড়ায় লোকদিগকে

আস্‌লে হয় না ? তার তো বড় কষ্ট, এখানে যদি আসে ছেলেপুলে গুলোকে একটু দেখে, আর একলা আছি একটা কাজের দোসর হয়।" হরিশ বলিল, "এলে খাইবে কি ? সুবিধা তো হয়!" শশী কহিল, "কেন, খাবার ভাবনা কি, মাসে পঁচিশ দিন সধবা খাবে, পঁচিশ খানা কাপড় পেলে সোমবচ্ছরের মাথায় তেল পরনের কাপড় চলে যায়, তার একলা পেট বেশ চল্‌বে।" কিন্তু সেজদিকে আর আনা হইল না। এদিকে বিপন্ন হরিধন আসিয়া একদা হরিশকে ধরিয়া পড়িল, কহিল, "বাবাজি, তুমি আমাদের স্ব-ঘর আমার মেয়েটাকে উদ্ধার কর, তা নইলে যাই কোথা" হরিশ তো চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "সে কি মশাই, আমি অনেকগুলি ছাপোষা, একটা স্ত্রীকে ভাল রকম অন্নবস্ত্র দিতে পারি নে আবার দ্বিতীয় দারগ্রহণ ?" হরিধন কহিল, "বাবাজি, আমার মেয়েকে তোমার অন্নবস্ত্র দিতে হবে না, কেবলমাত্র আইবুড়ো নামটা ঘুচিয়ে দাও। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, মেয়েকে আমিই ভাত-কাপড় দেবো বাবা, তোমার সঙ্গে এই কথা," এই বলিয়া হরিধন হরিশের হাতে পৈতা জড়াইয়া ধরিল।

তখন নিরুপায় হরিশ মহাবিব্রত হইয়া অন্তঃপুরে শশীকে সমস্ত বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিল। শশী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, বলিল, "বাবা বিশ্বনাথ আমার পানে মুখ তুলে চেয়েচেন, আমি একটি লোকের জন্যে মরে যাচ্ছিলুম তুমি গাঙ্গুলী মহাশয়ের মেয়েকে ঘরে আনো আমার একটি কাজের দোসর হবে,আমরা দুটি বোনে বেশ থাক্‌বো ছেলেগুলো সময়ে ভাত জল পাবে।" হইলও তাই হরিশ হরিধনের কন্যাকে বিবাহ করিল, নববধূ স্বামী-গৃহে আসিল, শশী মহানন্দে সপত্নীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিল। পাড়ার লোকেরা শশীর কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইল, সকলে বলিল, "মাগী কি বোকা গা ?"

একবৎসর পর্য্যন্ত নীরদা নির্ব্বিবাদে শান্তশিষ্ট হইয়া স্বামীর ঘর করিল। হরিধন এতটা আশা করে নাই। এখন দেখিল, সে যথার্থই কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, কারণ সে ভাবিয়াছিল, হরিশ তাহার কন্যাকে লইয়া সংসারও করিবে না অন্নবস্ত্রও দিবে না ; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বিবাহান্তে নীরদা একদিন মাত্রও পিত্রালয়ে আসিতে পাইত না। ইহা দেখিয়া হরিধন মহা আনন্দিত হইল, এবং অপরা কন্যাগণের নিমিত্ত এইরূপ একটি সুপাত্র অন্বেষণে পুনঃপ্রবৃত্ত হইল। একবৎসর বেশ কাটিল, কিন্তু পরে বড় গোলযোগ হইতে লাগিল, হরিশের আর পূর্ব্ববৎ সংসারে টান নাই। ছেলেগুলো সময়মত দুধ পায় না, গায়ের জামাগুলো সব ছিঁড়িয়া গেছে। শীতে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া হরিশ ভ্রূক্ষেপও করে না, জ্যেষ্ঠ

ছেলেটা মাসাবধি জ্বর-আমাশয়ে শয্যাগত। শশী রোজ বলিত, কবিরাজের কাছ থেকে দুটো বড়ি এনে দাও না। হরিশ সে কথায় কান দিত না। তৎপরিবর্ত্তে দশাশ্বমেধের সেনকোম্পানির দোকান হইতে দিব্য একটি জ্যাকেট আসিল এবং নীরদা তাহা গায়ে দিয়া বাপের বাড়ি বোনদের দেখাইতে গেল,সেদিন রাত্রেও আসিল না, পরদিনও আসিল না। রুগ্ন শিশুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শশী যখন বলিল, "বেলা হইল একবার ছোটবৌকে আনতে যাও না," হরিশ অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "ওদের এখন অল্প বয়েস দিন রাত্তির রোগের সেবা আর সংসারের কাজ, এত ভার মাথায় চাপালে ভারি অন্যায় করা হয়, একটু বাইরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচুক দু'দশদিন পরে আসবে।" বোকা শশী ভাবিল, এ আবার কি হইল, কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

প্রায় ২০ দিন পরে নীরদা প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এবার তাহার প্রকোষ্ঠে দিব্য দুগাছি ডায়মণ্ডকাটা সোনার বালা দেখিয়া শশী বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিল এবং বালা দুগাছি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিল, "হাতে বেশ মানিয়েচে।" শশীর জীবনে এমন বালা পরা আর হয় নাই। নীরদা ভঙ্গিসহকারে কহিল, "বাবা এবারে গড়িয়ে দিয়েচেন।" নির্ব্বোধ শশী সেই কথা সত্য মানিল এবং হরিশই যে তাহার শিশুগণের এবং তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের অংশ হ্রাস করিয়া নবীনা পত্নীকে গোপনে বলয় গড়াইয়া দিয়াছে—দরিদ্র হরিধনের এ সামর্থ্য নাই,এ বিচার তাহার স্থূল মস্তিকে একবারও উদয় হইল না।

একদিন রাত্রে শশী ছেলের দুধ গরম করিতে রান্নাঘরে গিয়া শুনিতে পাইল, নীরদা স্বামীকে বলিতেছে, "তোমার এই দশটাকা মাইনে আর এতগুলো ছেলে ওদেরই বা খাওয়াবে কি, আমাকেই বা দেবে কি?" স্বামী বলিল, "একটা ভাল কাজের জন্যে অনেক চেষ্টা কচ্ছি কিন্তু কিছু করে উঠিতে পাচ্ছি না। একটু ভাল চাকৃরি পেলেই, তোমার কষ্ট ঘুচে যাবে।"

নীরদা কহিল, "এদেশে আর ভাল চাকৃরি কোথায় পাবে, বিদেশে না গেলে কিছু হয় না।" হরিশ বলিল, "বিদেশে আর কোথায় যাব। এদের দেখ্‌বে কে?" নীরদা কহিল, "তোমার যেমন বুদ্ধি ঐ জন্যেই তো এত কষ্ট, ওদের আবার দেখবার দরকার কি? কষ্টই বা কি? বেশতো সধবা খেয়ে পেট চলে যাচ্চে, বড় বড় চারিটি ছেলে গলায় এক গাছা পৈতে দিয়ে দিলেই রোজ আনা অধিষ্ঠান আনৃতে পারে। কষ্ট আমার,এই তুমি এত বয়সে আমায় বে কর্‌লে আর এ পর্য্যন্ত একটা ছেলে পুলেও তো হ'ল না,আমার আখেরে যে কি দশা হবে

কে ভাবে, এখন যদি দু'পয়সা বেশী উপার্জ্জন করতে আমার সংস্থান হ'ত, নইলে এর পরে ভিক্ষে করে খেতে হবে। এক পালের সঙ্গে আমারও কষ্ট তোমারও কষ্ট।" শশীর আর দুধ গরম করা হইল না। সে নিস্পন্দভাবে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। সকালবেলা যখন চারিদিকে রোদ ছড়াইয়া পড়িল তখন শশী উঠিল না। হরিশ আসিয়া কহিল, "এত বেলা হ'ল উঠ চনা কেন, একা এত কাজ ও করতে পারে না।"—শশী বলিল, "আমার বড় জ্বর হয়েচে।" হরিশ কহিল, "ভাল জ্বালায় পড়েছি, যাহোক্ নিত্যি একটা না একটা রোগ, যা রোজগার করি তোমাদের ওষুদে পথ্যিতে সব গেল, একটা ভদ্রলোকের মেয়ে গলায় করেছি, সেটার যে কি হবে তা জানিনে।" মূক শশী নীরবে উঠিয়া সংসারের কর্ম্মে রত হইল।

তার পর একদিন পাড়াপ্রতিবাসীসমেত শশীমুখী দেখিল, হরিশ নবীনা পত্নীকে লইয়া গোপনে নিশাযোগে দেশত্যাগ করিয়াছে।

৩

পাড়ায় সুশীলাসুন্দরী নামে এক বর্ষিয়সী রমণী বাস করিতেন। ইনি দয়া গুণে সকলের পরিচিতা ছিলেন, শশীর আকস্মিক বিপৎপাতের বার্ত্তা তাঁহার শ্রবণ গোচর হইলে তিনি শশীকে ডাকিয়া সান্ত্বনা ও অভয় প্রদান করিলেন এবং শশীর পাঁচটি পুত্রকে নিজের বাড়িতে স্থান দিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণ করিলেন। আর রাধাবল্লভবাবু বৃদ্ধ বয়সে সস্ত্রীক কাশীবাস করিতে আসিলে শশীকে তাঁহাদের পাচিকার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, শশীকে সুব্রাহ্মণের কন্যা ও নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহারা বড়ঃ সন্তুষ্ট হইলেন। শশীও নিজগুণে তাঁহাদের স্নেহ আকর্ষণ করিল। রাধাবল্লভের পুত্র কন্যা ছিল না।

শশীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার ছয় মাস পরে রাধাবল্লভ-গৃহিণীর কাশী লাভ হইল। শশী একা সেই বৃদ্ধের সেবা করিতে লাগিল। তাহার অকপট কার্য্য কুশলতা ও শুশ্রূষায় রাধাবল্লভ মনে করিতেন, তাহার কন্যা থাকিলেও এতদপেক্ষা যত্ন করিত না। পত্নী বিয়োগের এক বৎসর পরে রাধাবল্লভ স্বর্গারোহণ করিলেন। মৃত্যু কালে অনাথা শশীকে দশ হাজার টাকা দিয়া গেলেন। এতদিনে শশীর কষ্টের অবসান হইল।

প্রতিবাসীদের কেহ কেহ শশীর ঐশ্বর্য্য দৃষ্টে মনঃকষ্ট অনুভব করিল, কেহ কেহ সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু শশীর মনে সুখ ছিল না সে কেবল বলিত, "আহা,

মুখুর্য্যে যদি এ সময় থাক্‌ত, কেউ যদি তার খবর এনে আমায় দ্যায় আমার যথাসর্ব্বস্ব তাকে দি,—

কিন্তু এমন হিতৈষী বন্ধু শশীর কেহই মিলিল না—মুখুর্য্যের খোঁজ খবরও পাওয়া গেল না।

হরিশ নববধুকে লইয়া প্রথমে মথুরায় গেল পরে সেখানে কোন সুবিধা না হওয়ায় বৃন্দাবনে এক ধনবান শেঠের বাড়ি আশ্রয় পাইল। সেখানে তাহার ৩০৲ ত্রিশ টাকা বেতনে মুহুরীগিরি কাজ এবং মনিব-বাড়িতে দুইবেলা পুরী মালপোয়ার ভোজ যুটিল। বড় সুখেই দিন কাটিতে লাগিল, হরিশ ভাবিল শুভক্ষণে হরিধনের গৃহে তাহার এই ভাগ্যলক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। হতভাগী সাত ছেলের মা শশীর পাল্লায় পড়িয়া কি কষ্টেই না তাহার দিন কাটিয়াছে। স্বামীর নিকটে নীরদার আদর বেলা বিহীন মহা সমুদ্রের রূপ ধারণ করিল।

সুখ কখন চিরদিন থাকে না, এ কথা সকলেই জানে এবং মানিয়াও থাকে কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ কখন সুখান্বেষণে বিরত হইয়াছে? হরিশও সুখের অন্বেষণ করিয়াছিল, সুখও পাইয়াছে। এখন থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে হরিশের দোষ কি? হরিশের সুখও বেশি দিন টিঁকিল না। অল্পদিনেই হরিশ বুঝিল তার নবীনা পত্নীটিকে মনিব মহাশয় হাত করিয়াছেন। নীরদা এখন প্রায়ই শেঠজীর মহলে থাকিত, ক্রমে রাত্রিবাস পর্য্যন্ত হইতে লাগিল, হরিশ সব বুঝিল, একদা পত্নীকে তিরস্কার করিল। পত্নীও দু'কথা বেশ শুনাইয়া দিল, বচসার পরদিন যখন কর্ম্মস্থানে গেল ফটকে প্রবেশ করিবামাত্র এক বৃহৎ গুম্ফ দরওয়ান তাহাকে ধরিয়া খুব মার দিল অবশেষে তাহার পরিধৃত বস্ত্র পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইল, কহিল, "শেঠজিকা হুকুম হ্যায়, শালা ফিন্ তুঝে ইস্ নগর মে দেখা কী জান লে লুগাঁ" তারপর হরিশের গৃহ লুণ্ঠিত হইল হরিশের সুখ সূর্য্য অস্তে গেল অবশেষে প্রাণ ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া কে জানে কোথায় চলিয়া গেল।

(৪)

বৈশাখের দারুণ মধ্যাহ্ন, পশ্চিমের গ্রীষ্ম ঋতু যে কি ভয়ানক তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বোঝান যায় না। কাশীর পাথরের বাড়িগুলা পাথরের রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া যেন এক একটা আগ্নেয়গিরির মতো ঝলসিতেছিল। প্রখর রৌদ্রতাপে গঙ্গাজল জলিতেছিল, গাছে আর পাখীর রব নাই, বাতাস

অগ্নিময়—কাঙালীটোলার পল্লীগুলি প্রায় নীরব হইয়াছে। সকলেরই দ্বার বন্ধ কেহ বা নিম্নতলে আশ্রয় লইয়া নিদ্রামগ্ন, কেহ বা মধ্যাহ্নিক আহারাদি কর্ম্মে নিরত, কেবল পাড়ার দত্তদের পুঁঁবি ও বদির চখে ঘুম নাই, আর পায়েও আলস্য নাই, তারা অনবরত ছুটাছুটি করিয়া একবার এ বাড়ি একবার ও বাড়ি কড়া নাড়িয়া গৃহস্থকে বিরক্ত করিতেছে। কেহ সাড়া দিতেছে না—কেহ বা দূর পোড়ার মুখীরা এই দুপুরে একটু জিরেন নেই" বলিয়া তাড়াইতেছে। শশীর দুটি ছেলে এই মাত্র কুইন্স্ কলেজ হইতে পাঠান্তে বাড়ি ফিরিতেছিল, দেখিয়া পুষ্পবালা দোর খোলা পাইবে বলিয়া সেই আশায় শশীর বাড়ির দিকে দৌড়াইল হঠাৎ দ্বারের কাছে কি দৃশ্য দৃষ্টে পুষ্প থমকিয়া দাঁড়াইল, পরে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "অ শশী দি দেখ্ তোর মুখুজ্যে মশাই এসেচে।" শশী চীৎকার করিয়া উঠিল, মুক শশীর এত গলা পুষ্প পূর্ব্বে কখন শ্রবণ করে নাই। চীৎকার করিয়া শশী কহিল, "সত্যি রে—বলি সেও তো এসেছে, পুষ্প কহিল, "সে আবার কোথা একলাই তো। দাঁড়িয়ে রয়েচে, গায়ে একখানা দোছোট পর্য্যন্ত নেই, একখানা কোপ্‌নি পোরে হাপুষ নয়নে কাঁদ্‌চে। শশী ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

শ্রীসুকুমারী দেবী।

শুভগ্রহ

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৃশ্য। —কলিকাতা-হেদুয়া-দীঘির সম্মুখ। কাল—প্রত্যুষ। অনেকে প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। যতীশচন্দ্র ও ষষ্ঠী দুই বন্ধু বেড়াইতেছিল।

ষষ্ঠী। ফটো পাঠান হল, তবু তোমার সোয়াস্তি নেই ?

যতীশ। তুমি বুঝছ না, বাবা যে এদিকে এক বিভ্রাট ঘটাচ্ছেন!

ষষ্ঠী। বিভ্রাট আবার কি ?

যতীশ। লোকনাথ মুখুয্যে বলে এক জমিদার আছে। সে বাবার পুরোনো মক্কেল। তার ছেলে-পিলের মধ্যে আছে শুধু এক কালো মেয়ে। বাবাকে ধরে বসেছে, এখন সে তার সেই কালো মেয়ে আমার ঘাড়ে চাপাবে। বিষয় তার বিস্তর ; তাই বাবাও তাকে যথেষ্ট ভরসা দিয়েছেন!

ষষ্ঠী। তবে আর কি ? এত বিষয় যখন, তখন ত দুনিয়াটাই তুমি ফরসা করে দেবে। এ'ত ভালো কথা হে।

যতীশ। রাম বল ! সে কি মেয়ে ? তাকে উষ্ট্র বললেও চলে !

ষষ্ঠী। বেশ ত ভাই ! এ জীবন-মরুভূমিতে উষ্ট্রই ত উৎকৃষ্ট বাহন !

যতীশ। ও সব বাজে কথা রেখে দাও—সে মেয়ে আমি বিয়ে কচ্ছি না, বাপ, সে কালিন্দী !

ষষ্ঠী। আরে তাতে কি এসে যায়—স্ত্রী কালো বটে, কিন্তু আঁচলে করে যে মণিমাণিক্য তিনি আনবেন, তারি জলুসে যে চারিধার আলো হয়ে উঠবে !

যতীশ। না, না—কালো বৌ—ওঃ !

ষষ্ঠী। যা বলেছ ! কোন কবিত্ব নেই, না ? জ্যোৎস্নায় স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন, চাঁদে অমনি গ্রহণ লাগল। আপিস থেকে গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে বাড়ি ফিরলুম, জল-খাবারের থালাখানি হাতে নিয়ে স্ত্রী এসে নথ নেড়ে দাঁড়ালেন, মনে হল, শ্যামা-ঠাকরুণ সেজে বহুরূপী এল যেন ! কালো স্ত্রী নিয়ে কি কবিত্ব হয় !

যতীশ। দেখ, বাবা ঠিক করেছেন ঐ লোকনাথের কালিন্দীর সঙ্গে আমাকে সংসারের ঘানি গাছে জুড়ে দেবেন, তা কিন্তু হচ্ছে না ! আসল কথা, আমি সুন্দরী স্ত্রী চাই, টাকা চাই না ! তাই বলছি আর কি, তুমি ফটো পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে চলছে না, তাদের ঠিকানাটা Trumpet আপিস থেকে খোঁজ নিয়ে বার কর।

ষষ্ঠী। তোমার বাবাকে তা হলে এ কথা একবার জানাও না !

যতীশ। সে আমার দ্বারা হবে না, প্রাণ থাকতে নয়। আরে সেই জন্যেই ত—

ষষ্ঠী। আমার সঙ্গে প্রেম ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল !

যতীশ। বাবা রোজই এ ধারে মর্নিং ওয়াকে আসেন, তুমি এ কথা সে কথা কইতে কইতে, এ বিষয়টাও পেড়ে দেখো—বুঝলে !

ষষ্ঠী। (সুর করিয়া)

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি—
মনপ্রাণ যাহা ছিল,—

যতীশ। আবার বখামি সুরু করলে ! মোদ্দা ষষ্ঠী, তোমাকে আমার আর একটা কথা রাখতে হবে।

ষষ্ঠী। কি ?

যতীশ। তোমাকে আবার বিয়ে করতে হবে। তোমার মত বয়সে বিপত্নীক হলে আবার বিয়ে করায় আমি কোন দোষ দেখি না!

ষষ্ঠী। ধন্যবাদ! আমার জন্যও যে "হৃদয়-সিন্ধু উঠিল আজি কাণায়-কাণায় তরি"—

যতীশ। না, না, তুমি যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছ! বিয়ে হলে তোমার জীবনে একটা শৃঙ্খলা আসবে! তোমার দ্বারা একটা আদর্শ সংসারেরও সৃষ্টি হতে পারে, তার প্রভাব কি অল্প, মনে কর? তা ছাড়া স্ত্রী না হলে জীবনটাই বিড়ম্বনা!

ষষ্ঠী। সত্যই ত, সে কি জীবন,—

"যদি না উড়ে নীলাঞ্চল,
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল,
যদি না বাজে কাঁকণ-মল,
রিণিকিঝিনি!"

এই জ্যোৎস্না-রাত্রিগুলা তাহলে যে নেহাৎ মাঠে মারা যায়! বসন্ত, মলয় সমীরণ, কোকিলের ঝঙ্কার এগুলো একদম্ নিরর্থক হয়ে পড়ে!

যতীশ। অত কাব্যির কথা আমি বলছি না! তবে খেটেখুটে পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে এলে, স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথাবার্ত্তা কইলে, সে একটু বাতাস করলে—

ষষ্ঠী। আহা, সঙ্গে সঙ্গে চুড়িগুলো টিংটাং মধুর রাগিণীতে বেজে উঠল, আবেশে চক্ষু দুটি অমনি মুদে এলো—

যতীশ। যাই বল, এ সব ঠাট্টার জিনিস নয়। আর এ কি—না বাড়ীতে থেকেও যেন মেসে আছি—অসুখ করলে, মাথা ধরলেও কেউ দেখবার নেই! বল কি হে, সুখে দুঃখে প্রাণ খুলে সহানুভূতি করতে এক স্ত্রী ছাড়া আর কে আছে, বল ত!

ষষ্ঠী। ইস্, তবু এখনও একটা বিয়েও করনি! স্ত্রী জিনিসটির সঙ্গে পরিচয়ের অবসরই মেলেনি, এতেই এই! তবে হক্ কথা বলি, শোন। তুমি শুধু একটা দিক দেখেছ, দোসরা দেখনি ত। এ বেশ আছি, দাদা, নিঃঝঞ্ঝাট! বিয়ে করলে বিস্তর ভাবনা বেড়ে যায়। বিরহ-বেদনা ত আছেই, তা ছাড়া এই দেখ না, নিজের শরীরটাকে নিয়েই ত সামলে বেড়ানো কত দায়—আজ সর্দ্দি, কাল জ্বর, পরশু ফোড়া, তরশু বাত, এমনি নানান্ উৎপাত আছে। বিয়ে করলে যে-সে-নন্ সাক্ষাৎ শ্রীরত্ন আসেন! তখন কি আর ভাবনার বিরাম

আছে। তিনি যদি একবার কাশলেন ত অমনি মনে হল, সর্ব্বনাশ, বুঝি নিউমোনিয়া হয়! মাথা ধরলে ভয়, বুঝি এটা টাইফয়েডের পূর্ব্বলক্ষণ—গায় ব্যথা হলেই ভাবলুম, বুঝি প্লেগ হ'ল! একটুতেই চোখে সর্ষে ফুল দেখিয়ে দেয়! তা ছাড়া ভালবাসার পান থেকে চুণটুকু খসলে তা নিয়ে মান-অভিমান ঝগড়া ঝাঁটি এসব ত আছেই। দিনের ভেতর সাতশ' সতেরোবার মনে হয়, আত্মহত্যা করি—কি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাই! আমার ও ঠেকে শেখা দাদা, তাই, নেড়া আর বেলতলা মাড়াচ্ছেন না! ও 'দিল্লীকা লাড্ডু' যা বলেছে, তা ঠিক। যো খায়া ও পস্তায়া, যো ন খায়া উওভি পস্তায়া!

যতীশ। ছিঃ, স্ত্রী জাতটার সম্বন্ধে তোমার এমন বীভৎস ধারণা!

ষষ্ঠী। মোটেই নয়, ভাই! স্ত্রীজাতটাকে আমি ভারী ভালবাসি! কিন্তু তুমি স্ত্রীজাতটাকে খালি কাব্যের ভিতর দিয়ে দেখেচ—ভাব, সবাই ডেস'ডেমনা, ওফেলিয়া, কুন্দ, আয়েষা! কিন্তু জেনো, দাদা সংসারে এঁদের দেখা কখনো পাবে না। সাগরবৌ, কি কমল গিন্নিজায়ার সন্ধান বরং মিল্‌লেও মিলতে পারে, তবে বেশীর ভাগই দেখবে, জগদম্বা, কাদম্বিনী, ক্ষান্তমণি কি বিরাজকামিনী—বুঝলে?

যতীশ। তুমি নেহাৎ বেল্লিক! এই জন্যই তোমার স্ত্রী বেচারী সয়ে পড়ল আর কি! ওহে, ঐ বুঝি বাবা আসছেন—তুমি এধার-ওধার একটু পায়চারি কর! তার পর দেখা দিয়ো—বুঝলে! তার পর Trumpet এর সেই মেয়ের খপরটা নিও, সে মেয়ের বিয়ে হতে আবার ভাবনা! কাগজে বিজ্ঞাপনই ত দিয়েছে—খুব সুশ্রী, সুশিক্ষিতা—

ষষ্ঠী। ওরে অনড্বন্, সকলেই ত আর সুশ্রী সুশিক্ষিতা খোঁজে না—বেশীর ভাগই খোঁজে, Money, money, money,—brighter than sunshine, sweeter than honey এই খাঁকৃতির দিনে চাকৃতি ছাড়া বুদ্ধিমান লোক আর কিছু খুঁজতে পারে, কখনও?

যতীশ। তাদের চাকতিরও অভাব নেই। খপরের কাগজে যখন বিজ্ঞাপন দিয়েছে—না! বাবা এসে পড়লেন, আমি সরি। তোমাদের বাড়ীতেই দেখা করব। খোদা Trumpet এর খপরটা নিতে ভুলো না।

(দ্রুত প্রস্থান।)

ষষ্ঠী পায়চারি করিতেছিল। ভিন্ন দিক দিয়া মহেশচন্দ্র প্রবেশ করিলেন, পশ্চাতে এক ঘটক।

ঘটক। একবারটি দেখলে হতো না ? কোষ্ঠীর সঙ্গে মিল ছিল, দেনা-পাওনাও সবিশেষ রকমের তাঁরা করবেন। মেয়েটিও সাক্ষাৎ ভগবতী।

মহেশ। না গো বাপু, না, বলছি, অন্যত্র ঠিকঠাক হয়েছে এক রকম ! সকালে বেড়াতে বেরুব তাতেও নিস্তার নেই !

ঘটক। আজ্ঞে—

মহেশ। আজ্ঞে-কাজ্জে নয়, পথ দেখ বাপু !

ঘটক। যে আজ্ঞে। তবে একবারটি দেখলে হতো—পরীর মত মেয়ে—একেবারে নিখুঁৎ—

মহেশ। কোন ব্যগ্রতা নেই, বাপু ! তুমি এস !

(ঘটকের প্রস্থান)

কে, ষষ্ঠী যে ?

ষষ্ঠী। (প্রণামান্তে) আজ্ঞে, হ্যাঁ !—আপনি ভাল আছেন ?

মহেশ। হাঁ বাপু ! তুমি ভাল আছ ? বাড়ীর সব খপর ভাল ? বেড়াতে এসেছ ? তা এখন কচ্ছ কি ?

ষষ্ঠী। আজ্ঞে, এটর্ণির বাড়ী আর্টিক্‌ল্‌ড্‌ ছিলুম। তা ভালো লাগল না, সম্প্রতি এক 'সেবা-সদনের' কাজ নিয়ে পড়েছি।

মহেশ। "সেবা-সদনের" অর্থটা কি ?

ষষ্ঠী। আজ্ঞে, এই অসুখ-বিসুখের সময় মধ্যবিৎ গৃহস্থরা অবস্থার জন্য পথ্য চিকিৎসা করাতে পারেন না, কষ্ট হয়, অল্প আয়ে ঠিক ব্যবস্থাও হয় না—তাই রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় যদি কিছু সাহায্য করতে পারি, সেই জন্যই আমরা এই "সেবা-সদন" খুলেছি।

মহেশ। বাঃ, বাঃ, বেশ ideaটি ত ! তা ডাক্তারের ভিজিট, ওষুধ, এ সবে ত খরচ-পত্র আছে হে। এত টাকা—

ষষ্ঠী। আজ্ঞে, আমাদের মধ্যে দু-একজন বড় লোকের ছেলেও আছেন, তাঁরা ডাক্তার, তাঁরা যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

মহেশ। বাঃ, শুনে ভারী খুসী হলুম ! এই সবই হল প্রকৃত দেশের কাজ ! তা না, ঘরে কচকচ্ খাব, আর আদালতে গিয়ে জ্ঞাতি-কুটুমের মাথা ভাঙ্‌ব—ঝাড়ু মার ; ঝাড়ু মার !

ষষ্ঠী। যতীশের মার্জিন নেবার কি হল ?

মহেশ। না বাপু—ও মোসাহেবি আমার দ্বারা পোষাবে না, আর তা-ছাড়া

প্রোভিন্স্যাল সার্ভিসে সুবিধা আর বড় নেই! ঐ চাপরাশি নিয়ে বাইরেই যা বড়াই—না হলে উপরওয়ালার গুঁতোর চোটে ভদ্রতা থাকে না! ও ঐ ল'টাই দেবে। আটকুল্ করে দেব, ভাবছি!

ষষ্ঠী। ওর বিয়ের কিছু ঠিক করলেন—?

মহেশ। হ্যাঁ, একরকম কথা দেওয়া আছে। আমারই এক মক্কেল—

ষষ্ঠী। ও, সেই লোকনাথ বাবুর মেয়ের সঙ্গে! তা লোকনাথ বাবু বেশ ভদ্র লোক! Desirable connection বটে!

মহেশ। টাকা-কড়িও খুব আছে, আর একটা বনেদী ঘর,—ছেলে-পিলে নেই, শুধু ঐ এক মেয়ে!

ষষ্ঠী। মেয়েটি একটু ময়লা শুনেছি, না—? তা—

মহেশ। তাতে কি? রঙটা ময়লা হল, ত তাতে কি এসে গেল! বাজার ত দেখছ আজকাল! কাজকর্ম করে মানুষ আর কত রোজগার করছে! ঐ শ্বশুরের বিষয়-আশয় পেলে তবু যা হোক, একটা ব্যবস্থা হয়! তা ছাড়া আরও কি জান—রঙ ময়লা হলে বউগুলো একটু দাবে থাকে, ফ্যাকাসে রঙ হলে তাদের কিছু অহঙ্কার হয়।

ষষ্ঠী মৃদু হাসিল।

মহেশ। না হে, এ আমার চোখে দেখা!

ষষ্ঠী। তা, কালো মেয়ে যতীশের পছন্দ হবে?

মহেশ। তার আবার পছন্দ-অপছন্দ কি? বাপ বিয়ে দেবে, তার উপর কথা। কেন, সে কি তোমায় কিছু বলেছে না কি?

ষষ্ঠী। আজ্ঞে না, আমিই এমনি বলছি।

মহেশ। কিছু বললে দেখিয়ে দেব না! আজকাল ঐ হয়েছে, ডেঁপো ছোঁড়াগুলো বিয়ের ব্যাপারে বাপ-মার সঙ্গে তর্ক করতে আসে, দেখে আমার হাড় জলে যায়! যার মাথার উপর বাপ-খুড়ো কি তেমন অভিভাবক আছে, সে আবার বিয়ের কথায় থাকবে কি? কি জানে সে, বিয়ের? লজ্জা করে না?

ষষ্ঠী। আজকাল এরা সব বলে কি, জানেন? বলে, যাকে নিয়ে আজীবন ঘর করতে হবে, তাকে পছন্দ করে নেব না—পছন্দ না হলে সারা জীবন অশান্তি ভোগ করতে হবে।

মহেশ। আগেকার লোক সব অশান্তিতে জলে মরত, না? আর যত শান্তির

পাগল হয়েছেন, আপনাদের এ'রা ! আলো বাপু, আমার ঐ সেজ মেয়ের বিয়ের সময় বাড়ীর সকলে মেয়ে দেখে গেল। কথাবার্ত্তা সব ঠিক ! এমন সময় পাত্র নিজে বন্ধু সেজে মেয়ে দেখতে এল ! আমি অবশ্য বাড়ী ছিলুম না, জানতুমও না ! তারপর দিন ঘটকী মাগী এসে দাঁত বের করে হেসে বলচে কি, ছেলে নিজে দেখে গেছে, তার খুব পছন্দ হয়েছে'—ভাবলে, শুনে আমি অমনি জল হয়ে যাব। হুঁঃ ! তখনি আমি চিঠি লিখে সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলুম ! বাড়ীর অভিভাবকদের উপর টেক্কা দেবে ছেলে ? সে ছেলে কখনো ভালো দাঁড়ায় না ! এত বড় আস্পর্দ্ধা ! আমার ছেলে অমন করলে আমার বাড়ীতে স্থান হবে, তার আর ? এই রকম এ্যালাকাড়ায় আজকালকার ছেলেদের মধ্যে শতকরা নিরেনব্বইটা বেহায়া বেল্লিক হয়ে উঠেছে ! গুরুজনকে এতটুকু সম্ভ্রম নেই !

ষষ্ঠী। বটেই ত !

মহেশ। এঃ, আজ একটু বেলা হয়ে গেছে, দেখছি, বেশ রোদ উঠেছে। তা হলে আসি, বাপু। এদিককার কাজ-কর্ম্মও আছে আবার।

ষষ্ঠী। আজ্ঞে হাঁ। তা হলে প্রণাম—(প্রণাম করিল।)

মহেশ। এসো বাপু ! একদিন তোমাদের সেবা-সদন দেখতে যাব, তা হলে—বুঝলে !

ষষ্ঠী। আজ্ঞে বেশ ত—বেশ ত ! সে'ত অনুগ্রহ !

(মহেশচন্দ্রের প্রস্থান)

নাঃ, গর্দ্দভ, নেহাৎ গর্দ্দভ ! এত যার বাড়ীতে কড়াকড়ি, সে আবার প্রেমে পড়ে কি বলে ? (প্রস্থান)

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আমার জীবন কাহিনী

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবগ্রামের কথা

দেবগ্রামের জমিদার দুই ভাই যেন রাম লক্ষ্মণ। বড় ভাই শচীন্দ্রবাবু শিবতুল্য। জমিদারীর কাজ কর্ম্ম আর প্রজাদের নিয়ে থাকেন; প্রজার প্রতি কোন জুলুম নাই। নানা প্রকার সৎকার্য্যের দ্বারা গ্রামের উন্নতি সাধন, দেশের সুখ

সুবিধার ভাবনা লইয়াই দিন কাটান। জমিদারীর উন্নতি কোথা দিয়া হয় কেহ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ছোট ভাই মণীন্দ্র বাবু দেশহিতৈষী ও সাহিত্যিক।

বাড়ির নিকট এক উদ্যান-বাটীকায় তাঁহার "বিশ্বধর্ম্ম সভা", পার্শ্বের ঘরে প্রকাণ্ড এক লাইব্রেরীও ফ্রি রিডিং-রুম। অন্য ঘরে সঙ্গীতশালা—ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা। উদ্যান-মধ্যে এক ব্যায়ামশালা নূতন্ রকমে বিভিন্ন প্রণালীতে শরীরচালনার উপায় তিনি নিজেই উদ্ভাবন করিয়াছেন। দেশের সর্ব্বশ্রেণীর যুবকদের লইয়া তাঁহার এক সুদৃঢ় সেবক-দল—তাহারাই সকল কাজে অগ্রণী হইয়া দেশের উন্নতি সাধনে রত। বিশ্বধর্ম্ম সভায় সকল ধর্ম্মের আলোচনা হয়, কিন্তু কোন ধর্ম্মের নিন্দা করা নিষিদ্ধ। উহার মধ্যে বিশেষ একটি শ্রেণী আছে—যাঁহারা বিশেষভাবে যোগ-ভক্তি-সাধনপ্রয়াসী তাঁহারাই তাহার সভ্য। তাহার কার্য্য ভিন্ন সময়ে হয়। এতদ্ভিন্ন সাধারণের জন্য একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি স্কুল ও তৎসহ ছাত্রাবাস একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল। মিউনিসিপালিটী ও একটি দাতব্য ভাণ্ডার।

দেবগ্রামে আসিয়া প্রথমে আমরা কিছু দিন নফর কাকার বাড়িতে রহিলাম। আমাদের জন্য তাঁহারা একখানি ঘর ছাড়িয়া দিলেন। নফর কাকা ও তাঁহার স্ত্রী ও একটি কন্যা মাত্র। নফর কাকা প্রথমে আমাদের জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন, যে যত দিন আমরা এবাড়িতে থাকি ততদিন ধান চাউলের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আমরা যেন না করি, একত্র এক সংসারের ন্যায় চলিবে। কিন্তু মা বিস্তর কাতরতা জানাইয়া বলিলেন, "যখন তাঁহার সাহসেই এই নাবালককে লইয়া এখানে আসিয়াছি তখন সকল ভার সকল ভাবনা তাঁহারই উপর, তবে যত দিন পারি ততদিন চলুক দান গ্রহণ করাটা আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ, অতএব আমাদের জন্য কিছু ধান কিনিয়া দেওয়া হউক বাড়িতে বরং চাউল তৈয়ার করিয়া লওয়া হইবে, ছোট বৌ একটু সাহায্য করিবেন।" মার কথার মধ্যে এমন একটা ভাব প্রকাশ পাইত যে, তিনি যেটা বলিতেন তাহার উপর প্রতিবাদ করিতে কেহ সহসা সাহস করিত না। যাহাহউক আমরা যত দিন নফর কাকার বাড়ি ছিলাম ততদিন তাঁহারা আমাদের সঙ্গে অতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কাকীমা মায়ের একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, সাংসারিক অনেক কাজে তিনি মায়ের উপদেশ ও আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কাকার মেয়ে পুঁটু আমারি কাছে কাছে থাকিত। ক্রমে ক্রমে তাহাকে আমি

অ, আ, ক, খ পড়াইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম ভাগ শেষ করিয়া দ্বিতীয় ভাগ ধরাইয়াছিলাম।

জমিদার বাবুদিগের নিকট আমাদের কথা নফর কাকা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, তার পর আমি মণীন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া আমাদের কথা বলিলাম। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "কি করিলে আপাতত আমাদের সুবিধা হইতে পারে?" মার উপদেশ মত আমি বলিলাম, "আপাতত আমাদের বসবাসের জন্য কিছু জমি ভদ্রপল্লীর মধ্যে দিলেই হইবে, আমরা কোন রকমে একটু ঘর করিয়া লইব, আর আমার পড়ার জন্য স্কুলে যদি ফ্রি করিয়া দিবার সুবিধা হয় তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার হইবে।"

মণীন্দ্র বাবু বলিলেন, "তাহাই হইবে, আর যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে আমাদের যে ছাত্রবিভাগ আছে তথায় থাকিয়াও পড়াশুনা করিতে পার, সেখানে আহার ও বাসস্থান ফ্রি হইতেও পারে।" তাহাতে আমি বলিলাম, "আপাতত বোধহয় ততদূর প্রয়োজন হইবে না, পরে—নিতান্ত অভাব হইলে আপনাকে জানাইব।"

মার মুখে শুনিয়াছিলাম, বাবা তাঁহাকে বলিয়াগিয়াছেন, সাধ্য থাকিতে অন্যের সাহায্য লইবে না। প্রাণান্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াও স্বাধীনভাবে থাকিতে চেষ্টা করিবে। আমার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, কখন কোন ধনীর বা অপর আত্মীয়ের হাতে উহার শিক্ষা বা ভরণপোষণের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়ো না। নিজে কায়িক শ্রম করিয়া বরং সামান্য অন্ন-সংস্থানের উপর নির্ভর করিয়া সেই অন্ন নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে। নিজের নিকটে রাখিয়া সমস্ত বাল্যকালটি অতিবাহিত করিয়া আত্মনির্ভর আত্মসম্মান বোধ জন্মাইয়া দিয়া তবে উচ্চশিক্ষার জন্য সহরে পাঠাইবে।

আমরা পূর্ব্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া দেবগ্রামে আসিয়া আমার পড়াশুনার বিশেষ সুবিধা হইল, তা ছাড়া আমাদের বসবাসের জন্য আর একটা সুবিধাও হইল; একখানি ছোট বাড়ি খালি ছিল, তাহার শেষ অধিবাসীর আর কেহ উত্তরাধিকারী না থাকায়, মৃত্যুকালে মণীন্দ্র বাবুকে দিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি এই বাড়ি কোন সৎলোকের বাসের জন্য দান করিবেন। সুতরাং মণীন্দ্র বাবু এবং বড় বাবু পরামর্শ স্থির করিয়া বাড়িখানি আমাদের বাসের জন্য দিলেন। কেবল আমরা নিজের খরচে মেরামত করিয়া লইলাম। তা ছাড়া মণীন্দ্র বাবুর সৎসঙ্গে আমি অনেক উপকৃত হইলাম। তবে আমাদের স্বাধীন ভাবে থাকা ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিল। মা অনেক সময় এমন কোন কাজ পান

না বা অনেক কাজ করিতে বাধা পান, যাহাতে আমাদের দুটি প্রাণীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়। সঞ্চিত অর্থ ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল।

জমিদার শচীন্দ্রবাবুর পত্নী অতি উদার প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি সমস্ত দিন সংসার পরিজন অভ্যাগত আত্মীয়—দাস দাসীগুলির পর্য্যন্ত তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত থাকিতেন। তা ছাড়া দুঃখ জানাইয়া কেহ কখন তাঁহার নিকট বিফল-মনোরথ হইত না। পরদুঃখ তিনি হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতেন। মা তাঁহার ভাব দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। কেন জানি না তিনিও মাকে বড়ই যত্ন করিতেন। আমাকেও তিনি হাত ধরিয়া টানিয়া নিজের কাছে লইতেন। আমি যেদিন তাঁহার নিকট কোন কাজে যাইতাম সেইদিনই আমাকে কিছু খাইতে হইত। মণীন্দ্রবাবু কোন কথা বলিয়া আমাকেই অধিকাংশ সময় বড় বৌ-ঠাকুরাণীর নিকট পাঠাইতেন, আমি যাইতে ইতস্তত করিতাম; বৌ-ঠাকুরাণী বলিতেন "অক্ষয় ভারি লাজুক।"

মণীন্দ্রবাবু আজো বিবাহ করেন নাই, তার জন্য বড়বাবু, বড় বৌ-ঠাকুরাণী ভারি দুঃখিত, কিন্তু মণীন্দ্রবাবু বলিতেন, "এ বিষয়ে তিনি ভগবানের কোন সায় পান নাই।" তিনি যত দিন ভগবানের আদেশ না পাইবেন ততদিন বিবাহ করিবেন না; তাঁহার তো কোন অভাব নাই। কাজেই তাঁহার কথার উপর কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না।

ক্রমে ভিতরে ভিতরে আমাদের অবস্থার বিষয় বুঝিয়া বড় বৌ-ঠাকুরাণী মাকে একদিন বলিলেন, "আপনি ছেলেটিকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে এক পরিবার হয়ে থাকুন। তাতে আমারও অনেক কাজের সুবিধা হইবে।" মা একেবারে ততটা প্রস্তুত হইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু বাড়ির ভিতর একটা যে রসুই হইত তাহার ভার লইয়া মা প্রায় সমস্ত দিন জমিদার-বাড়িতেই কাটাইতে লাগিলেন। খুব প্রাতে আমার জন্য চারটি রান্না করিয়া দিয়া সেখানে যাইতেন আবার অপরাহ্নে আসিয়া নিজের আতপ অন্ন আর আমার জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করিতেন। এক একদিন আমিও তাঁহার আতপ অন্নের ভাগী হইতাম। প্রাতে ও মধ্যাহ্নে স্নান ও মধ্যাহ্নে কিছু পানীয়, অপরাহ্নে একাহার এই মায়ের নিয়ম চলিয়াছিল।

এই ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল, তারপর আমি একেবারে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পড়িলাম। আমি যেবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম সেইবার এক প্রচণ্ড উত্তপ্ত দিনে মা আমার বিসূচিকা রোগে সহসা সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে

নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া আপনার চিরবাসস্থান—ভগবানের নির্দিষ্ট স্থানে বা অবস্থায় ইহলোকের অন্তরালে চলিয়া গেলেন।

আমার এই সাঙ্ঘাতিক অবস্থার সময় মণীন্দ্রবাবু আমাকে আপন সহোদরের ন্যায় কোলে টানিয়া লইলেন। সকল রকমে আমার মন-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার নির্ম্মল ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরিচয় আমি কিঞ্চিৎ পাইলাম। এত দিনে তাঁহার অন্তঃকরণ আমার নিকট যেটুকু খুলিয়াছিল আর এই কয়দিনে কতখানি খুলিয়া গিয়াছিল! আমাকে তাঁহার বুকের মধ্যে লইবার জন্য যেন সে-হৃদয় আপনি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। এই অবস্থার মধ্যে তাঁহার জীবনাদর্শ হইতে যেটুকু স্থায়ী সম্বল জীবন-পথে পাইয়াছিলাম তজ্জন্য মণীন্দ্রবাবু যেমন একদিকে আমার নিকট চিরবন্ধু চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, আর একদিকে আমি সেই উপকৃত বন্ধুর আদর্শেই সকল দুঃখ বিপদে অটল থাকিয়া জীবন-পথে চলিতে সক্ষম হইয়াছি।

যখন মা মারা গেলেন তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। আমি ধর্ম্ম বিষয় তেমন কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু মণীন্দ্রবাবুর অদ্ভুত ধর্ম্ম কর্ম্ম মিলিত জীবনের প্রতিভা-মণ্ডিত স্নেহ-ক্রোড়ে পড়িয়া কি এক অজ্ঞাত আদর্শ বীজ প্রাণের সঙ্গে সংস্পর্শ হইয়াছিল, তাহা তখন আমি ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারি নাই; তবে এত বড় শোকের তাপ মায়ের অভাব যেন আমাকে ভুলাইয়া সেই স্থানে ধীরে ধীরে পরম মাতৃভাবের বীজ রোপিত হইয়াছিল।

আমি যথাসময়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। তাহার পর এফ-এ পড়িবার জন্য মণীন্দ্রবাবুর পরামর্শ মতে কলিকাতায় প্রেরিত হইলাম। তিনি সকল বিষয় উৎসাহ ও সাহায্য দিয়া আমাকে পাঠাইলেন।

(ক্রমশ)

কুশদহ-বৃত্তান্ত

কুশদহের মধ্যে এইরূপ একটী জনশ্রুতি আছে যে, এই স্থান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল ছিল। এই জন্য গোপীপুর; গোবরডাঙ্গা, গোপিনীপোতা, কানাই নাট-শাল, ঘোষপুর প্রভৃতি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। এইরূপ জনশ্রুতির মধ্যে একটু সত্য নিহিত আছে। যেসময়ে এই প্রবাদ এই দেশে প্রচলিত হয়,

সেই সময়ের লোক সরলবিশ্বাসী ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণব ছিল। যখন এই স্থানের পরম ভক্ত গোপগণ দেখিল যে নীল যমুনার জলে চালুন্দের শ্বেত জল মিশ্রিত হইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত এক মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে তখন তাহারা এই যমুনা-চালুন্দের মিশ্রণকে কৃষ্ণ-রাধিকার মিলন আখ্যা দিল। সেই দিন হইতে—সেই অতীত সুখের দিন হইতে এই স্থানের এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। ভগবৎভক্ত সেই গোপগণ মানস-চক্ষে এরূপ রাসলীলার রূপ দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়াছিল। এই সরল বিশ্বাস-যুগের পরেই এখানে বৌদ্ধ-যুগের আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধ-যুগ আবির্ভাবের সময় এই কুশদহ কর্ণ-সুবর্ণের বৌদ্ধ রাজা হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। এই কর্ণ-সুবর্ণ মহাভারতের দাতাকর্ণের রাজত্ব ছিল। এক্ষণে ইহাকে রাঙামাটি বলে। রাঙামাটি নামে অনেক স্থান আছে। আসাম ধুবড়িতে এবং দিনাজপুর আতরাই এর নিকটও রাঙামাটি নামে কয়েকটী স্থান দেখা যায়। কিন্তু বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে প্রাচীন ঐতিহাসিক কর্ণ-সুবর্ণ (বর্ত্তমান নাম রাঙামাটি) অবস্থিত।

কিপ্রকারে বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ণ-সুবর্ণ রাজ্যে প্রবেশ করিল, "সিওকী" গ্রন্থকার তাহার একটী গল্প দিয়াছেন। নিম্নে সেই গল্পটী লিখিত হইল :—

যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের মর্ম্ম সকলে অবগত ছিল না, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে একজন দিগ্বিজয়ী হিন্দু প্রচারক আসিয়াছিলেন। তিনি বিচারার্থে ঢোল বাজাইয়া সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার উদর তাম্রপাত-মণ্ডিত ছিল এবং মস্তকের উপর এক মশাল জ্বলিতেছিল, কেন তিনি এরূপ সাজ করিয়াছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে, তিনি অনেক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার জ্ঞান যথেষ্ট আছে। সুতরাং তিনি ভীত হইয়াছেন যে বিদ্যার জোরে তাঁহার পেট ফাটিয়া যাইবে। মনুষ্যদিগের অন্ধতা দূর করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান-জ্যোতি প্রদান করিবার জন্য তিনি মস্তকে মশাল ধারণ করিয়াছেন। দশ দিন পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে তর্কে পরাজয় করিতে পারে নাই। এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কথা শুনিয়া রাজা হর্ষবর্দ্ধন হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন—আমার রাজ্যে এমন কি কোন জানা নাই যিনি এই পণ্ডিতকে তর্কে পরাজয় করিয়া আমার মুখোজ্জ্বল করেন? রাজার এই কথার পর রাজানুচরেরা গঙ্গার পূর্ব্ব পারে এক বনের ভিতর একজন অলৌকিক শ্রমণ (বৌদ্ধসাধু) দেখিতে পাইয়া রাজাকে সংবাদ দিলে রাজা তাঁহাকে আনিবার

জন্য স্বয়ং সেই বনে গেলেন। রাজাকে দেখিয়া শ্রমণ বলিলেন—আমিও দক্ষিণ ভারত হইতে আসিয়াছি। আমার শিক্ষা যৎসামান্য। যাহাহউক আমি আপনার আদেশ পালন করিব। কিন্তু আমার একটী নিবেদন এই যদি আমি সেই ব্যক্তির নিকট পরাজিত না হই, তাহা হইলে আপনাকে একটী বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে এবং সেই মঠে বৌদ্ধ নীতি শিক্ষা ও প্রচার করিবার জন্য সাধু সন্ন্যাসীদিগকে তথায় আনিতে হইবে। রাজা এই কথায় সম্মত হইলে "শ্রমণ" বিচারে সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া দিলেন। রাজা তাঁহার প্রতিশ্রুত মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই মঠটীর নাম ছিল— লো-টো-ওয়ে-চি-সেং-কিয়ালান্ (Lo-to-wei-chi-seng-kialan) এই মঠের অধীন তাঁহার রাজ্যের যাবতীয় মঠ ছিল। এই সময় হইতে কুশদহের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তার হয়। উপরি উক্ত গল্পটী পায়েন্কী নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক "সি-ও-কী" নামক পুস্তকের মুখবন্ধে লিখিত আছে এবং উক্ত শ্রমণ স্বয়ং হুয়েংসিয়াঙ্ ছিলেন। হুয়েংসিয়াঙ্ যখন গঙ্গার পূর্ব্ব পারে কোন বনে ছিলেন তখন সেই বনটী যে কুশদহের অন্তর্গত ছিল তাহা জানা যাইতেছে। উক্ত বৌদ্ধ মঠটী এক্ষণে রাঙামাটির "রাক্ষসী ডাঙ্গা" নামে অভিহিত।

গত সংখ্যায় যে ঠাকুর বরসাহেবের আস্তানার কথা লিখিত হইয়াছে সেই আস্তানার পার্শ্বেই একটী ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মঠ ছিল; আজও সেই স্থানের নিকট প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় "ধর্ম্ম দেবের" পূজা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম দেবের মূর্ত্তি মহাদেবের মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উক্ত ঠাকুরবর সাহেবের প্রধান আস্তানা চারঘাটে। হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদ, চারঘাটের ঠাকুর বরসাহেব ও গৈপুরে এই আড়ম্বররহিত ঠাকুর বরসাহেবের আস্তানা এই সকলই সম সাময়িক। যখন প্রথমে এই স্থানে ঠাকুর বর সাহেবের জাহির হয় তখন হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই সমানভাবে এখানে হাজৎ (পূজা) দিত। এই জাহিরের কয়েক বৎসর পরে গৈপুরের কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি এখানে মসজিদ বা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবে কৃতসঙ্কল্প হইলে ঠাকুর বরসাহেব স্বপ্নে তাহাকে জানাইলেন যে "'আমি এখানে অনাবৃত অবস্থায় থাকিতে ভালবাসি," এই স্বপ্নের পর আর কেহ ভয়ে এই স্থানের সংস্কার করে নাই।

এই পর্য্যন্ত যেসমস্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল তাহার অনেকটা আভাষ ১৬৬০ খৃঃ অব্দের ম্যাথিউ ভ্যান্ডেন ব্রুকের মানচিত্রে ও ভ্যালেণ্টাইনের ৫ম খণ্ডের ১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। তৎপরে মুসলমান রাজত্ব শেষ হইলে উক্ত ঠাকুর

বয়সাহেবের আস্তানার আদর একে একে মন্দীভূত হইতে থাকে। এক্ষণে ইহার নিকট "ওলা বিবির মেলা" নামে একটী বিখ্যাত মেলা প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে হইয়া থাকে। এই ওলা বিবির একটী ঘর খাঁটুরার স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ রক্ষিত করিয়া দিয়াছেন।

গৈপুরে গোপের বসতি উচ্ছেদের পরেই কায়স্থ বংশ-সম্ভূত মজুমদার বংশ পরে গৈপুরের বিখ্যাত মিত্র বংশ এখানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ধরিতে গেলে এই মজুমদার ও মিত্র বংশই এখানকার গোপের পরেই আদি বাসিন্দা। দুঃখের বিষয় মজুমদার-বংশ চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

"যাহা সুখ তাহা শুভ নয়"

সুখের লাগিয়া ভ্রমে ভূমণ্ডল
কেহ পায় কেহ পায় না,
না পাইয়া শুভ, পাইয়া অশুভ
সুখ-আশা তবু ছাড়ে না।
সুখ-আশা ছাড়ি কঠোর শাসনে
সতত শাসিত যে চিত্ত,
লভে সেই জন পরম মঙ্গল
সুখ নয়, সে শুভ নিত্য।

প্রেরিত পত্র

গোবরডাঙ্গা হাই স্কুল

স্কুলটি খুব পুরাতন; ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত। এসব জিনিষ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদর আধিপত্য ও সম্ভ্রম লাভ করে কিন্তু এই স্কুলের ভাগ্য অন্যরূপ। এখন ইহার অবস্থা শোচনীয়। ইউনিভার্সিটির নূতন রেগুলেসন অনুসারে পরিচালিত করা দুরূহ হইয়াছে।

স্কুল গৃহটি পুনঃপুনঃ জীর্ণ সংস্কৃত হইলেও শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের মনঃপূত

হইতেছে না। স্কুলে উপযুক্ত লাইব্রেরী নাই, ছাত্রদিগের মলমূত্র ত্যাগের নির্দিষ্ট স্থান নাই। ব্যায়ামশিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। স্কুল-প্রাঙ্গণের আয়তন সম্প্রতি সংকীর্ণ করা হইয়াছে। নানাকারণে চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু দূষিত হইয়া স্থানটি অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। শিক্ষা কথা ভাল জানি না, কেননা স্কুল-কমিটির রিপোর্ট কখন হস্তগত হয় নাই। স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা কম, শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। মাষ্টার মহাশয়দের বেতনের হার মন্দ নহে। ছাত্রদিগের বেতনের হার উচ্চ। স্কুলের আয় আশানুরূপ নহে।

এতদ্দেশে বারো চৌদ্দ মাইলের মধ্যে এই একমাত্র হাইস্কুল। এই স্কুলের উন্নতির জন্য অধিবাসীগণের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারা যায় না। এই স্কুল লোপ পাইলে দেশের কি অভাব ও দুর্দ্দশা হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না।

স্কুলটির উন্নতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। স্কুলের উন্নতির অন্যতম উপায় ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি। সেন্সাস রিপোর্টে প্রকাশ এদেশ শনৈঃ শনৈঃ জনশূন্য হইতেছে। দেশের এরূপ অবস্থায় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির আশা কম।

পার্শ্বস্থ গ্রাম খাঁটুরা ও ইছাপুরে দুইটি Middle Vernaculer স্কুল আছে এ দুটির অবস্থাও তত ভাল নয়। যদি এই তিনটি স্কুল একত্রিত। (amalgamated) হইয়া একটি হাই স্কুল হয় তবে ছাত্রসংখ্যা রীতিমত হইতে পারে ও স্কুল সুচারুরূপে চলিতে পারে। আশা করি স্কুল-কমিটির মেম্বরগণ এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র।

সম্পাদকীয় মন্তব্য—গোবরডাঙ্গা স্কুল সম্বন্ধে ডাক্তার বাবু সুরেশচন্দ্র মিত্রের পত্রখানি আমরা যথাযথভাবে প্রকাশ করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "স্কুলের উন্নতির জন্য অধিবাসীগণের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক।" তাহা অত্যন্ত সত্য কথা। তিনি আরো লিখিয়াছেন "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারা যায় না, এই স্কুল লোপ পাইলে দেশের কি অভাব ও দুর্দ্দশা হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না।" এ কথাটিও খুব মূল্যবান। কিন্তু তিনি যে উপায় নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ।

গোবরডাঙ্গা ও খাঁটুরা পাশাপাশি গ্রাম বটে কিন্তু প্রকৃতিতে অনেক ভিন্নতা দেখা যায়। খাঁটুরায় ব্যবসায়ীশ্রেণী অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। পূর্ব্বে তাঁহারা স্কুলে পড়ার আবশ্যকতা বোধ করিতেন না। পাঠশালার শিক্ষাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এজন্য একসময় খাঁটুরা স্কুল যায়-যায় হইয়াছিল। সে সময় পরলোকগত বাবু রাসবিহারী দত্তের অনেক চেষ্টায় এবং সময়ের কিছু কিছু পরিবর্ত্তনে স্কুলটি কোনরূপে টিকিয়া যায়। এখনো সেইভাবে কতকটা চলিতেছে। কিন্তু যদি খাঁটুরা স্কুল, গোবরডাঙ্গা স্কুলের সঙ্গে মিশিয়া যায় তবে খুব সম্ভব গ্রামের

মধ্যে আবার পাঠশালা বসিবে এবং অধিকাংশ ছেলে সেই খানেই যাইবে। মাঝে হইতে খাটুরা স্কুলের দ্বারা যেটুকু কাজ হইতেছিল তাহা লোপ পাইবে। অথচ এজন্য গোবরডাঙ্গ স্কুলের ছাত্রসংখ্যা তেমন বৃদ্ধি হইবে না।

ইছাপুর স্কুলও যদি গোবরডাঙ্গা স্কুলের সঙ্গে মিলিত হয়,তাহাতেও গোবরডাঙ্গা স্কুলের তেমন কোন সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না, বরং দূরতার জন্য ইছাপুরের ছেলেদের মহা অসুবিধা হইবে।

আমাদের মনে হয় গোবরডাঙ্গা স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে যদি স্কুলের সঙ্গে একটি ছাত্রাবাস (বোর্ডিং) হয়।

মফস্বলের ছাত্রগণ আসিয়া যাহাতে অল্প ব্যয়ে থাকিতে পারে তাহার যদি ব্যবস্থা হয়, তবে ছাত্রবৃদ্ধি ও স্কুলের অবস্থা অনেকটা ভাল হইবার সম্ভাবনা।

এইকার্য্যে অগ্রে জমিদারবাবুদিগের অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। তাহা দেখিয়া দেশের লোকেরও উৎসাহ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা কি এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন?

বনগ্রাম স্কুলের এত উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহার কারণ কতকটা স্থানের অনুকূলতা বশত বটে। কিন্তু কেবল সেজন্য এত ছাত্রবৃদ্ধি হইত না যদি স্কুলের সঙ্গে বোর্ডিং না থাকিত। দ্বিতীয় কথা—সকল কাজের মধ্যে তাহার একটা প্রাণ থাকা চাই। তবেই তাহার উন্নতি হয় এবং বাঁচিয়া থাকে। বনগ্রাম স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয় ছাত্রাবাসের সঙ্গে থাকিয়া স্কুলের জন্য যেপ্রকার প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যত্ন চেষ্টা করিতেছেন, তাহার ফলও তদ্রূপ দেখা যাইতেছে। আর গোবরডাঙ্গার সকল বিষয়েই প্রাণহীন অবস্থা দেখিয়া আমরা কেবলই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছি।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এবার সম্রাটের জন্মদিন-উপলক্ষ্যে, ধানকুড়িয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার এবং ব্যবসায়ীশ্রেষ্ঠ সুশীল সজ্জন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ বল্লভ, 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করিয়াছেন।

কুশদহ-অন্তর্গত কত ছেলে কোথা হইতে কে কি বিষয়ে এবারকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা সমস্ত জানিতে পারা সহজ নয়। তবে যাঁহারা জানাইবেন এবং আমরা জানিতে পারিব তাহাই কুশদহে প্রকাশিত হইবে। এবার যে কয়টির বিষয় জানিতে পারা গেল তাহাই নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আই, এস, সি,—শ্রীমান্ চারুকর আশ প্রথম বিভাগে স্কটিস্‌চার্চ্চেশ কলেজ। আই, এ, স্বর্গীয় ভূতনাথ পালের পুত্র শ্রীমান কাঙ্গালীচরণ পাল প্রথম বিভাগে মেট্রপলিটান কলেজ। স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র রক্ষিতের পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র রক্ষিত, দ্বিতীয় বিভাগে, ঢাকা কলেজ।

শ্রীযুক্ত পাঠাগার এখন পুস্তকালয়ে (লাইব্রেরীতে) পরিণত হইল। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এখন শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান প্রবোধচন্দ্র রক্ষিত বিশেষ চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়া পুস্তক সংগ্রহ করিতেছেন। ইহার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য স্থানীয় ব্যক্তিগণের সম্মিলনে একটি কমিটী গঠন করা হইয়াছে। কিন্তু প্রবোধবাবু এখনো মেডিকেল কলেজের ছাত্র, তিনি দেশে থাকিয়া লাইব্রেরীর কাজ কিছু করিতে পারেন না, তিনি কলিকাতায় থাকিয়া যাহা করিতেছেন তাহাতে তিনিই যে, ইহার প্রাণ স্বরূপ একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু একজন স্থানীয় লোক ইহার দায়িত্বভার লইয়া পুস্তকগুলি রক্ষা করা এবং যাহাতে সকলে পাঠ করে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। দেশের মধ্যে এমন কি কেহ নাই যিনি এই কাজের ভার গ্রহণ করিতে পারেন।

সাহায্য-প্রাপ্তি

কুশদহে সাধারণ চাঁদা প্রাপ্তি-স্বীকার করার নিয়ম নাই, যেহেতু স্থানাভাব। তবে ২৲ টাকা হইতে অতোধিক যাঁহারা প্রদান করেন তাহারই প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়।

১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিত	২৲
„ সুরেন্দ্রনাথ পাল	২৲
„ দুর্লভচন্দ্র পাল	২৲
„ যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৲
„ কাঙ্গালীচরণ পাল	২৲
„ সুবোধচন্দ্র কুণ্ডু	২৲
„ নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এল, ...	২৲
শ্রীমতী স্নেহময়ী দেবী (পরগ্রাম)	১॥০
শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (জমিদার)	২৲
„ [illegible] বসু (রাঁচি)	২৲
„ [illegible] সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (চারঘাট) ...	২৲
„ [illegible]লাল চট্টোপাধ্যায় (সীমলা পাহাড়) ...	২৲



শৈব্যা ও হরিশ্চন্দ্র

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস অঙ্কিত ও চিত্রাধিকারী-
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুমতিক্রমে

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"তোমারি নামে ফুটেছে ফুল,
গন্ধে প্রাণ করেছে আকুল,
যতনে গাঁথিয়া এনেছি মালা
আদর ক'রে একবার পরনা।"

সপ্তম বর্ষ, | আষাঢ়, ১৩২২ | তৃতীয় সংখ্যা

গান

কোন্ মায়া-বলে বাঁধিয়াছিলে এ ছিন্ন বীণার তার,
সুর সপ্তক বাজায়ে মধুরে হে চির প্রিয় আমার!
বেদনার সুর, বিষাদের গান,
ক্রন্দনরোল-পূর্ণিত প্রাণ,
শান্ত করিলে, তুলি' কি মধুর, অভিনব ঝঙ্কার,—
কোন্ মায়াবলে বাঁধিয়াছিলে এ ছিন্ন বীণার তার।

বীণার আমার ছিলনা ত কিছু—ছিলনা তালের ছন্দ,
রন্ধ্র যেগুলি জালজঞ্জালে সকলি আছিল বন্ধ,
গৈরিক ভরা গিরিগুহামত
উচ্ছ্বাস ভরে কাটিতে চাহিত,—
সে বেসুরো বাঁশী বাজায়েছিলে, কি প্রাণ করি সঞ্চার,
কোন্ মায়াবলে বাঁধিয়াছিলে এ ছিন্ন বীণার তার।

সেই সমসুরে বাঁধা আছে মোর সকল বীণার তন্ত্রী,
ওগো সুন্দর! অমোঘ-মন্ত্র-মোহিত-মানস-যন্ত্রি!
সেই সুরে ধীর ললিত আবেশে
উদারা মুদারা তারা গেছে মিশে,
সেই সুর বুঝি অসীমে মিলেছে, হয়ে মহা ওঁকার!
কোন্ মায়াবলে বাঁধিয়াছিলে এ ছিন্ন বীণার তার!!

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

জ্ঞান-স্বরূপ

ভারতের ঋষি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ধ্যানযোগে ভগবানের স্বরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া বলিলেন,—"সত্যং জ্ঞানমন্তং ব্রহ্ম"। যিনি সত্যস্বরূপ, তিনি জ্ঞানময়, অসীম, অনন্ত। জ্ঞানময় কখন সসীম হইতে পারেন না। যাঁহারা বলেন, অনন্তের ধারণা কি রূপে হইতে পারে, তাঁহারা এ স্থলে কি বলিবেন? বাস্তবিক কি কোন জড় সাকার সসীম বস্তু মানবের উপাস্য হইতে পারে? যাহার আকার জড় পদার্থের দ্বারা গঠিত, তাহাতে অসীম জ্ঞান-স্বরূপের কল্পনা করা ভ্রান্তি মাত্র। ভারতের ঋষিগণ কি অনন্তের উপাসনা করেন নাই? তবে তাঁহারা অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপের কথা বলিলেন কেন? জ্ঞানের স্বরূপ কি? তাহা কি কোন জড়িয় উপাদানে গঠিত? কিংবা, জড়ে জড়িত? সে যে মুক্ত অনাদি —অনন্ত। অনন্তের ভাব ছাড়িয়া জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা। জগতের সর্ব্বত্র একমাত্র জ্ঞানেরই বিকাশ দেখা যায়। জ্ঞান ভিন্ন কিছুই সৃষ্টি হইতে পারে না! জ্ঞানই সকলের পরিচালক। জ্ঞানই সার সত্য বস্তু। জ্ঞানের স্বরূপ ছাড়িয়া কেবল ভাবের দেবতাকে ভক্তি করিতে অভ্যস্ত হইলে প্রকৃত পক্ষে আত্মার মুক্তি কোন দিন হইতে পারে না। জ্ঞানের পথ ছাড়িয়া মুক্তি অসম্ভব। বিশ্বাসের একটা শক্তি আছে সত্য কিন্তু জ্ঞানের ভূমি ছাড়িয়া যে বিশ্বাস, তাহা পঙ্গু! কার্য্যকালে তাহার চলচ্ছক্তির অভাব হয়, অর্থাৎ অনেক স্থলে দেখা যায়, বেশ ভাব-ভক্তির উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু ধর্ম্ম-জীবনের সার জিনিষ যে চরিত্র, তাহার একান্ত অভাব। এদেশের ধর্ম্মে ভক্তির পথ বলিলেই যেন জ্ঞানের সঙ্গে তাহার বিরোধ বোঝায়। বস্তুত জ্ঞানের পথ ছাড়িয়া প্রকৃত ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে না। ভগবানের স্বরূপে কল্পনা মিশ্রিত করিয়া জ্ঞানও দাঁড়াইতে পারে না। বিশুদ্ধ জ্ঞানের মূল জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান্। ভগবানের স্বরূপে কোন আবিলতা নাই। আমরা কল্পনা করিয়া ধর্ম্মে বা ভগবানের স্বরূপে আবিলতা সংযোগ করিয়াছি। তাই ধর্ম্মে এত গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে।

যিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" তিনিই "আনন্দ রূপমমৃতম্।" যিনি আনন্দময় তিনিই শান্তং শিবমদ্বিতীয়ম্।" অর্থাৎ সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময় অদ্বিতীয় মঙ্গল-স্বরূপ।

যাঁহারা বলেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না, তাঁহারা সাকারেই বা কোন্ স্বরূপের উপাসনা করেন ? জড় না চৈতন্যের—রূপ না গুণের ? কেবল কি রূপের উপাসনা হয় যদি গুণ না থাকে ! বোধ হয় এ কথা কেহই স্বীকার করিবেন না। শাস্ত্রও এমন কথা কোথাও বলেন না যে, যাহা জড় অনিত্য—আজ আছে, কাল নাই, এমন বস্তুর উপাসনা হয়। তবে যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, প্রেম-স্বরূপ, পবিত্র-স্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ এমন যে সচ্চিদানন্দময় পুরুষ তাঁহার উপাসনা হইবে না কেন ? যদি গুণময়ই প্রকৃত উপাস্য হইলেন, তবে আবার তাঁহাকে কল্পনা-জালে জড়িত করিবার প্রয়োজন কি ? ঐ খানেই তো জ্ঞানের মস্তকে পদাঘাত করা হয়। আমরা অনন্ত ভগবান্‌কে গড়িতে পারি না, কিন্তু অনন্ত ভগবানের হাতে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, তিনি আমাদিগকে গড়িবেন। এই গঠনের মধ্যে যে কি শক্তি থাকে তাহা বক্তৃতা দ্বারায় কিংবা লিখিয়া বুঝাইবার বিষয় নয়,যিনি সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই জানিতে পারিয়াছেন যে, অসার মানুষ সত্যস্বরূপ ভগবানের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া কি শক্তি লাভ করে ; এবং তাঁহা দ্বারা কত অসাধারণ কার্য্য সমাধা হয়—জীবন কত সুন্দর মধুর হয়।

মানবাত্মাকে তিনি তাঁহার স্বরূপের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়াছেন। তিনি অনন্ত জ্ঞানময়, মানবাত্মাও জ্ঞানকণা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ সত্য স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, প্রেম-স্বরূপ, পবিত্র-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ। মানবাত্মাও তেমন নিত্যবস্তু অর্থাৎ মানবাত্মা ভগবানের মধ্যে অনন্তকাল থাকিয়া অনন্ত উন্নতি লাভ করিবে। মানবাত্মায় জ্ঞান আছে, প্রেম আছে, পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা আছে, আনন্দ আছে। তাই মানবাত্মাই ভগবানের উপাসক। উপাস্য উপাসকে যদি উপযোগিতা না থাকিত তবে সে অর্থে তাহা সৃষ্ট হইতে পারিত না, অতএব আমরা জ্ঞান-স্বরূপেরই উপাসনা করিব, কিন্তু কোন জড়ের উপাসনা যেন না —করি। ইহাই মানব জীবনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সার লক্ষ্য।

সম্রাট্ আকবর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

এই নশ্বর জগতে কত মানুষ আসে, আবার কাল-সমীরণ-স্পর্শে জল বুদ্বুদের ন্যায় কত জন অদৃশ্য হয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অবনী বক্ষে এমন দুই একজন মহা-পুরুষের আবির্ভাব হয় যে, তাঁহাদের জীবন লীলা সমাপ্ত হইলেও জগৎ তাঁহাদের স্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারে না। মোগল সম্রাট্ আকবর এই মহাপুরুষগণের

অন্যতম। কতদিন হইল তিনি, সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে তাঁর"।

আকবর জন্মাবধি দারিদ্রের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহার পরিণত জীবনে দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা ও সহানুভূতি প্রদর্শন জীবনের বিশেষ অলঙ্কার ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় তিনি এক হস্তে শাণিত তরবারি এবং অপর হস্তে কোরাণ লইয়া দেশ শাসনে প্রবৃত্ত হন নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শিয়ান, সকলেই তাঁহার সমান স্নেহ ও আদরের পাত্র ছিলেন। কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব-প্রদর্শন করিয়া তিনি তাঁহার যশোরশ্মি স্তিমিত করেন নাই। সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে লইয়া তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মের সারতত্ত্ব অবগত হইতেন। এই ভাবে তিনি "দীন—হি—ল্লাহি" নামে এক নূতন ধর্ম্ম গঠন করিয়াছিলেন। তিনি আত্মার অবিনাশিতায় বিশেষ বিশ্বাসী ছিলেন। সংস্কৃত, পার্শী, প্রভৃতি পুস্তক সাদরে আপন পুস্তকালয়ে রক্ষা করিতেন। দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদ করাইয়া তিনি তাহা অবকাশ সময়ে শ্রবণ করিতেন। আকবর মুসলমান তীর্থযাত্রীদিগের সুবিধার জন্য যেমন একদিকে তীর্থকর (Pilgrimmage tax) লোপ করিয়াছিলেন, তেমনিই অন্যদিকে হিন্দু প্রকৃতিপুঞ্জের স্কন্ধ হইতে "জিজিয়া" নামক করভার উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আকবর হিন্দুদিগের ন্যায় শুভদিনে বড়ই আস্থাবান ছিলেন। তিনি দৈনিক একবার মাত্র ভোজন করিতেন এবং মাংসাদিভক্ষণে নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। তিনি ফলমূল ভক্ষণে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁহার জন্য কাবুল, কান্দাহার, সমরখন্দ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি মাসে প্রচুর পরিমাণে ফল আসিত। তিনি নিজেও ইরান্ এবং তুরান্ দেশ হইতে কৃষিবিদ্‌দিগকে আনাইয়া ফতেপুর সিক্রী ও আগরাতে ফলোদ্যান রচনা করাইয়াছিলেন। তিনি ইবাদৎ খানায় গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ শ্রবণ করিতেন এবং প্রাতঃকালে "গোসলখানায়" যাইয়া স্নান করিতেন, এবং তদনন্তর দরবার গৃহে সমাগত হইয়া সভাসদ্‌গণ ও প্রজাপুঞ্জের আবেদন নিবেদন ও অভিযোগাদি শ্রবণ করিতেন। তিনি প্রায় মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত দরবার গৃহে অবস্থান করিয়া দৈনিক রাজকার্য্য সমাধা করিতেন। সাধারণতঃ অপরাহ্নেই তিনি নিদ্রা যাইতেন। কখনো কখনো তিনি প্রভাতকালে ময়দানে ক্রীড়া দেখিতেন এবং কখনো কখনো বা সন্ধ্যাবেলায় পলাশ কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত "পোলো" বা চৌহান্ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেন।

আকবর সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন নিবিষ্ট মনে সূর্য্যোপাসনা করিতেন। পারস্ত সাহের ন্যায় তিনি আপন হর্ম্ম্য মধ্যে সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতেন। এই হুতাশন প্রজ্জলিত রাখিবার ভার তিনি আবুল ফজলের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ব্যতীত তিনি কখনো মূল্যবান পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতেন না। কোন বড় উৎসবের সময় আকবর রত্নাদি খচিত সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে স্ব স্ব আসনে ওমরাহ, সভাসদ্, উজীর, অমাত্যগণ বসিতেন। তাহার পর তাঁহার সম্মুখ দিয়া ক্রমান্বয়ে গজ, অশ্ব, কুক্কুর, চিতাবাঘ প্রভৃতির বিরাট্ শোভাযাত্রা যাইত। আকবরের উত্তরাধিকারীদিগের সময়েও এইরূপ শোভাযাত্রা বাহির হইত। হকিং, রো, টেরি প্রমুখ বৈদেশিক পর্য্যটকগণ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

আকবর অতিরিক্ত মাত্রায় উপাসনা, উপবাস, এবং তীর্থ-পর্য্যটনের বিরোধী থাকিলেও কখনো কাহাকেও এ সকল হইতে নিষেধ করেন নাই। হিন্দু জাতির প্রাণে আঘাত লাগে বলিয়া তিনি গোবধ নিষেধ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা কুকুরকে অস্পৃশ্য বলিত ; কিন্তু আকবর শারমেয়জাতিকে স্পৃশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। হিন্দু-বালবিধবার অশ্রু দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি বিধবা-বিবাহের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্য আকবর চরিত্রে অনেকে দোষারোপ করেন। সতীদাহ প্রথা নিষ্ঠুরাচরণ মনে করিয়া তিনি বিনীতভাবে হিন্দুসমাজের নিকট এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—এ সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করেন নাই।

সঙ্গীতাচার্য্য ফৈজী ও মন্ত্রী আবুল ফজলের পাণ্ডিত্য দর্শনে তিনি বিদ্যানুশীলনে সাতিশয় যত্নপরায়ণ ছিলেন। তিনি ভণ্ডামি ছলনাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এই কারণেই তিনি আপন দরবার হইতে ভণ্ড উলামাদিগকে একে একে বিদায় দিয়াছিলেন! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আকবর হিন্দী, পার্শী, সংস্কৃত, গ্রীক্, কাশ্মীরী প্রভৃতি নানা ভাষায় লিখিত পুস্তক আপন পুস্তকালয়ে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পুস্তক উর্দ্দূতে অনুবাদ করাইয়া তিনি প্রতিদিন বিজ্ঞ পাঠকের মুখে শুনিতেন এবং যে দিন যে পুস্তকের পাতা পর্য্যন্ত পড়া হইত, তিনি স্বহস্তে সেই পাতায় মসী অঙ্কিত করিতেন এবং পাঠককে সুবর্ণমুদ্রা পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় দিতেন। তাঁহার সময়কার পৃথিবীতে যত প্রকার ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক পুস্তক ছিল, তিনি তাহার প্রায়

অধিকাংশই পড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার গুণধর পুত্র জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি (আকবর) আদৌ লেখাপড়া জানিতেন না। *

জাহাঙ্গীর বলেন যে, আকবর মৃত্যুর প্রাক্কালে ইস্‌লাম ধর্ম্মে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বদৌনি এ কথার যথার্থ্য স্বীকার করেন না। আকবর হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক শ্রদ্ধাবান্ হইলেও কোন ধর্ম্মকেই ঘৃণা বা অবহেলার চক্ষে দেখিতেন না। তিনি বলিতেন সমস্ত ধর্ম্মেই সার আছে। মানুষ যে কোন ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া জীবনের চরমোন্নতি লাভ করিতে পারে।

বাল্যে আকবর বিদ্রোহী বৈরাম খাঁকে ক্ষমা করিয়া যে সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও সেই ক্ষমাশীলতা তাঁহার অন্তর হইতে তিরোহিত হয় নাই। তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ আবুল ফজলের হন্তা জাহাঙ্গীরের মস্তকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া আকবর ক্ষমাশীলতার কি অপূর্ব্ব উদাহরণই দেখাইয়া গিয়াছেন !

টোডর মল্লকে রাজস্ব-সচিবের পদ প্রদান করিয়া আকবর হিন্দু-প্রীতি ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেখাইয়া গিয়াছেন। এই টোডর মল্ল ভূমি-সর্ভের যাহা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, আজিও তাহা ভারতে বিগুমান রহিয়াছে।

মহারাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আকবরেরও নবরত্ন সভা ছিল। তানসেন, মানসিংহ, ফৈজী, বীরবল, আবুল ফজল, টোডর মল্ল প্রভৃতি এই সভাস্থল উজ্জ্বল করিতেন।

"নৌরাজার" দিনে কোন রমণী বিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত করায় অনেকে আকবর চরিত্রে দোষারোপ করেন, কিন্তু নাটক, নভেল ভিন্ন কোন প্রামাণিক ইতিহাসে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি আকবরের মহা নিন্দাবাদী বদৌনীও এ বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই ; সুতরাং এটি যে নিন্দাবাদীদের স্বভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কবি বলিয়াছেন—"সাধুত্বে দুর্জ্জনোজনঃ"।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অকবর কষ্টের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার শৈশব ও বাল্যজীবন শিবির হইতে শিবিরে অতিবাহিত হইয়াছিল। বৈরামের কর্তৃত্বাধীনে অবস্থান কালে তাঁহার সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

* Private memoirs of Jahangir.

তিনি সুপুরুষ ছিলেন, সমস্ত প্রকার শারীরিক ব্যায়াম এবং অশ্বগজাদি পশুপালনে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা যাইত।

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসকগণ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিবর্গকে পারশ্রমিকের বিনিময়ে জায়গীর প্রদান করিতেন; কিন্তু আকবর এই প্রথা তুলিয়া দিয়া তাঁহাদিগের বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

আকবরের সাম্রাজ্য পঞ্চদশ সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সুবাতে একজন করিয়া রাজ-প্রতিনিধি থাকিতেন, এবং সেই রাজ-প্রতিনিধি সম্রাটের নির্দ্দেশমত দেওয়ানি ও সামরিক উভয় বিভাগেই অপ্রতিহত প্রভাবে ক্ষমতা পরিচালন করিতেন।

এতাদৃশ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আকবর সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু লেখা অসম্ভব। তজ্জন্য এইস্থানে পাঠকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।*

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

অদ্ভুত জয়

(সত্য ঘটনা)

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানব-জাতির ইতিহাস, এক সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক জাতি অপর জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, পরাজিত জাতির রক্তে ধরাতলকে রঞ্জিত করিয়া স্বীয় বিজয়-নিশান ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়াছে। একটী জাতিকে ধ্বংশ করিয়া আততায়ীরা বিজয় দুন্দুভিতে দিগ্‌সকল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ ভীষণ সংগ্রাম জগতের সর্ব্বত্রই চলিতেছে। কত দিন পরে যে এই সংগ্রামের যবনিকা পতিত হইবে! কত কাল পরে, কে জানে, কত যুগযুগান্তর গত হইলে জগতের ইতিহাস আর মানব-জাতীর শোণিত কালিমায় কলঙ্কিত হইবে না? মানবের নিখিল কার্য্যের মধ্যে তাহার পশুভাব জাজ্বল্যমান হইলেও সময়ে সময়ে দেবভাব দেখা যায়। গভীর গর্ব্বান্ধকারের মধ্যেও প্রেমের রবি হাসিতে হাসিতে উদয় হইতেছে। লক্ষ লক্ষ লোকের হত্যায় যাহা সংসাধিত

---

* এই প্রবন্ধ কম্পোজ হইবার পর দেখিলাম, ১০ আষাঢ়ের হিতবাদীতে "আকবরের মত পরিবর্ত্তন" লেখকের আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এক সময়ে এক প্রকারের প্রবন্ধ, উভয় কাগজে প্রকাশার্থে পাঠান লেখকের উচিত হয় নাই। (সম্পাদক)

না হইয়াছে, একটী প্রেমের কার্য্য দ্বারা তদপেক্ষা অনেক অধিক সামগ্রী আমরা লাভ করিয়াছি। এইরূপ একটী প্রেমের কার্য্যের কথা আমি আজ বলিব।

প্রায় চারি শত বৎসর অতীত হইতে চলিল জর্ম্মাণ দেশে এক সময়ে চেরীফল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। একরূপ ভীতিজনক রোগে সমস্ত চেরী বৃক্ষই আক্রান্ত হইয়া তাহাদের ফল সকল নষ্ট হইয়া যায়। এই সময় তথাকার ধনী লোকেরা যদি দৈবাৎ একটী উৎকৃষ্ট চেরীফল দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা ফলসম স্বর্ণগোলের বিনিময়ে ফলটী ক্রয় করিতেন। যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহার মূল্যও যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তেমনি তাহাকে লাভ করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সকলের আগ্রহও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, চতুর্দ্দিক হইতে লোক চেরীফলের জন্য চীৎকার করিতে লাগিল! যখন ফলগুলি একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়া উঠিল, সেই সময় হাম্বার্গ নগরে ওলফ্ নামে একজন ধনশালী বণিক তাঁহার চেরী কাননটীকে রোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছিলেন। উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বৃক্ষগুলি মুকুল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল সকল যে তাঁহারই চেরী কাননে হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। দিগন্তব্যাপী মরুভূমির মধ্যে ফলফুলশোভিত সামান্য ভূখণ্ড যেমন নয়নের তৃপ্তি সাধন করে, তাঁহার চেরী কাননটীও তেমনি তৃপ্তিকারক ছিল। প্রকৃতই মুকুলগুলি ক্রমে ফলে পরিণত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তৎকালে যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহারা বলেন যে, ঐরূপ উৎকৃষ্ট ফল আর তাঁহারা কখনও চক্ষে দেখেন নাই। বণিকরাজ মনে করিয়াছিলেন যে, এই সময়ে তিনি চেরীফল বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিবেন এবং তদ্দ্বারা দেশের কোন একটী ভাল কাজ করিয়া যাইবেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ হামবার্গবাসীগণ এই সময়ে শত্রুর সহিত এক ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। চারিদিক হইতেই তাঁহাদের নগর অবরুদ্ধ হইল। কাহারও নগরের ভিতর আসিবার অথবা নগর হইতে বাহিরে যাইবার উপায় রহিল না। নগরবাসীরা সকলেই শত্রুবেষ্টিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। শত্রুরা যাহাতে হঠাৎ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অহরহ সৈনিক বেশে সশস্ত্র থাকিতে হইত এবং সময়ে সময়ে শত্রুর সহিত ভীষণ যুদ্ধও করিতে হইত। নগরবাসীদিগের অসীম বীরত্ব ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অদ্ভুত রণকৌশল বহুদিন পর্য্যন্ত নগরটীকে শত্রুহস্ত হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া দিবারাত্রি ভীষণ যুদ্ধের পরও নগরটী শত্রুদিগের করায়ত্ত হইল না।

দেখিয়া শত্রুসৈন্যাধ্যক্ষ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে মুহূর্ত্তে নগরটী তাঁহাদের হস্তে পতিত হইবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তিনি নগরের সকলকেই হত্যা করিবেন।

হামবার্গ বাসীগণ যে সময়ে শত্রুর সহিত এইরূপ যুদ্ধে লিপ্ত সেই সময়ে নগরের মধ্যেও এক ভীষণতর শত্রুর আবির্ভাব হইল। সে মহাশত্রু দুর্ভিক্ষ। কোন স্থান হইতে এক মুষ্টি অন্ন পাইবার সম্ভাবনা নাই। পৌরগণ পূর্ব্ব হইতে যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল তাহা সব নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে কোন রূপে যে খাদ্যদ্রব্য ভিতরে আসিবে তাহারও উপায় নাই। দুই এক দিনের মধ্যে হয় নগরবাসীদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে, না হয় শত্রুর শাণিত কৃপাণে দ্বিখণ্ডিত হইতে হইবে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক ইহার একতর বিপদকে আলিঙ্গন করিতেই হইবে, মধ্যপন্থা আর কিছুই নাই।

নগরাভ্যন্তরে পৌরগণ যখন ক্ষুধার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত, সেই সময়ে শত্রুগণও কিন্তু স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা আবার পানীয় জলের অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সকল সে সময় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। শত্রুগণ কোন স্থান হইতেই, এক বিন্দুও নির্ম্মল বারি সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। বুভুক্ষু ব্যক্তি বরং অন্নাভাবে কিছুক্ষণ বাঁচিতে পারে কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলাভাবে এক দণ্ডও তিষ্টিতে পারে না। নগরমধ্যে যেমন নরনারীগণ "অন্ন, অন্ন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; নগর প্রাচীরের বহির্দেশেও তেমনি সৈন্যগণ "জল, জল" শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

ওলফ্ এতদিন সৈনিক বেশে সদাসর্ব্বদা নগর পরিরক্ষণ করিতেছিলেন। দিবারাত্রি গুরু পরিশ্রমে ক্লান্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ায় তিনি দুই এক দিনের জন্য অবকাশ পাইলেন। গৃহে প্রত্যাগমনের সময় তিনি তাঁহার চেরীকাননে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, বৃহৎ ফলভরে শাখাসমূহ মৃত্তিকায় নত হইয়া পড়িয়াছে। মনোমুগ্ধকর সুপক্ক ফলগুলি রসভরে বিদীর্ণ হইতেছে! এই ভয়ঙ্কর বিপদের সময়ও তাঁহার মনে একটু আনন্দের সঞ্চার হইল। নগরবাসীদিগকে রক্ষা করিবার এক অননুভূত চিন্তা এই সময়ে হঠাৎ তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। এই চেরীফল দ্বারা কি তিনি নগরবাসীদিগের কোন উপকার সাধন করিতে পারেন না? মৃত্যুতো নিশ্চয়ই! হয় অনাহারে, না হয় বৈরী-কৃপাণে প্রাণত্যাগ করিতেই হইবে। ভাল, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? মুহূর্ত্ত মধ্যে এই চিন্তা করিয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। ওলফ্ নিজেদের অবস্থাও

যেমন জানিতেন, শত্রুগণের অবস্থাও তিনি তেমনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতেন। ক্ষুৎপিপাসার শান্তিকারী এমন সুন্দর চেরীফলগুলি পাইলে তাহারা কিনা দিতে পারে? তৎক্ষণাৎ তিনি নগরের তিন শত বালিকাকে, শ্বেতপরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া তাঁহার চেরীক্ষেত্রে আনয়ন করিলেন এবং প্রত্যেকের হস্তে সুপক্ক ফল-পূর্ণ এক একটী চেরী শাখা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তৎপরে নগরপ্রান্তে আসিয়া ওলফ্ তোরনদ্বার উদঘাটন করিলেন। বিধাতার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া বালিকাগণ জাতীয় সঙ্গীত গান করিতে করিতে শত্রুর শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইল। শত্রুসৈনাধ্যক্ষ যখন বালিকাদিগকে চেরী শাখায় আবৃত হইয়া আসিতে দেখিলেন, তখন তিনি মনে করিলেন যে, নগরবাসীগণ তাহাদের উদ্ধারের জন্য এক নূতন কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে। তিনি তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিলেন। নগর দ্বারও উন্মোচিত হইয়াছে সুতরাং নাগরিকগণকে ধ্বংশ করিবার এই এক সুযোগ দেখিয়া তিনি সৈন্যদিগকে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। অপেক্ষাকৃত একটী বয়োজেষ্ঠা বালিকার নেত্রীত্বে অপর বালিকাগণ ধীর ও সমপাদক্ষেপে তাঁহার দিকে পরিচালিত হইল। তাহারা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে, সৈনাধ্যক্ষ দেখিলেন যে, অনশনক্লিষ্টা, শীর্ণ দেহা এবং ছিন্ন ও শুভ্র বসন পরিধানা কতকগুলি বালিকা চেরী-শাখায় আবৃত হইয়া তাঁহারই দিকে আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি সৈন্যদিগকে অস্ত্র সংযত করিতে বলিয়া বালিকা-গণের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, তাহারা কাতরা নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেছে। অগ্রগামিণী বালিকাটী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফলপূর্ণ শাখাটী তাহার হস্তে দিয়া সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইল। সেনাপতি আদরের সহিত শাখাটী গ্রহণ করিলেন ; তাঁহার নিজের পুত্রকন্যাগণের কথা স্মরণ করিলেন এবং বালিকাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন! শত্রু-মিত্রের প্রতি সমদর্শিনী সরল স্বভাবা বালিকারা শাখা-গুলি একে একে সৈন্যদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিল। সৈন্যগণ চেরীর রস পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল। তখন সৈন্যগণের আনন্দ ধ্বনির মধ্যে সেনাপতি বালিকাদের জয় ঘোষণা করিলেন এবং অকপটচিত্তে স্বীকার করিলেন যে,হামবার্গবাসীগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছে। নিমেষ মধ্যে শস্যপূর্ণ শত শত শকট বালিকাদের সহিত নগর মধ্যে প্রেরিত হইল। তিনি নগর-বাসীদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া সেস্থান সেই দিনই পরিত্যাগ করিলেন। এখনও পর্য্যন্ত হামবার্গবাসীগণ সেই পবিত্র দিনের স্মরণার্থ প্রতি বৎসর চেরী

উৎসব করিয়া থাকেন। আমরা যেমন বিজয়াদশমী দিন শত্রুমিত্র একত্র মিলিত হইয়া আলিঙ্গন ও অভিবাদনাদি করিয়া থাকি, হামবার্গের অধিবাসীগণও ঠিক সেইরূপ শত্রু ও মিত্র দিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক চেরীফল বিতরণ করিয়া থাকেন।

পাঠক পাঠিকাগণ তোমরা জগতের ইতিহাসে বহু যুদ্ধের বিবরণ পাঠ অথবা শ্রবণ করিয়াছ। কিন্তু এমন অদ্ভুত জয়ের কথা কি কখন শুনিয়াছ? বিনা রক্তপাতে যুদ্ধে জয় লাভ কি আনন্দের বিষয় নহে? সংসার সমরক্ষেত্রে যখন যোদ্ধ বেশে অবতীর্ণ হইতে হয়—তখন কি শত্রুগণকে এইরূপ ভালবাসার দ্বারা জয় করিতে পারা যায় না? পরম শত্রুকে স্নেহপূর্ণ অঙ্কে তুলিয়া তাহাকে চিরদিনের জন্য পরম মিত্র করিতে যিনি পারেন, তিনিই দেবতা?

আজ এই লোমহর্ষণকারী যুদ্ধে ইউরোপের জাতিনিচয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। এই ভীষণ সমরের জন্য লোক জর্ম্মাণ সম্রাটকেই দায়ী করিতেছে! হামবার্গ সহরও তাঁহারই দেশ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় তাঁহার বর্ত্তমান বিপক্ষগণের প্রতি ঐ রূপ একটী প্রেমের কার্য্যের দ্বারা এই মহাসমরের অবসান করিতে পারেন না?

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় চৌধুরী।

আমার জীবন-কাহিনী

তৃতীয় অধ্যায়

কলিকাতার মেস

——(:*:)——

হঠাৎ মা মারা গেলেন, ভাল ক'রে কিছু বলতে পারলেন না। বাক্সের চাবিটা আমাকে দিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, উহার মধ্যে গহনা আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর বাক্স খুলিয়া অল্পই কিছু টাকা, কয়েকটা গিনি আর কিছু সোণার গহনা পাইলাম।

যখন আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, তখন মণীন্দ্র বাবুর দ্বারা গহনা কয়েক খানা বিক্রয় করিয়া সর্ব্বসমেত ৪০০৲ শত টাকা হয়। তাহা সেভিং ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইল।

কলিকাতায় মণীন্দ্র বাবু তাঁহার এক বন্ধুকে পত্র লিখিয়া মেসে আমার

থাকার ঠিক করিয়া দিলেন। আমি এফ্-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিলাম।

মণীন্দ্র বাবুর বন্ধু দেবকুমার বাবু জমিদারের ছেলে; কিন্তু পুরুষানুক্রমে সম্পত্তি বিভাগ হইতে হইতে এখন কেবল নামটাই আছে, বছরে যাহা আয় হয় তাকে জমিদারীর আয় বলা যায় না। তবে দেবকুমার বাবুর আর আপনার কেহ নাই, আজো বিবাহ করেন নাই, একা মানুষ, মেসে থাকেন—এই বার বি-এ পড়্ছেন।

দেবকুমার বাবু বেশ লম্বা-চওড়া সুন্দর সুশ্রী। মাথার চুল কিছু বড় বড় রাখেন, দু'ভাগে রেশমের মত কোঁক্ড়া কোঁক্ড়া, মাঝখানে শিঁতি কাটা। গোঁফ কার্ত্তিকের মত—দেখ্‌তেও ঠিক সেই রকম। স্বভাবটা কিছু আমোদপ্রিয় রকমের, কিন্তু বুদ্ধি ও কথার কায়দা বেশ; সে জন্য সকলে তাঁকে ভয়ও করে। তবে তিনি গম্ভীরভাবে মোটেই থাকতে পারেন না। এক সময় তিনি কোন রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন। সাহিত্য চর্চ্চা করা অভ্যাস আছে, মাসিকপত্রে দু'একটা গল্পও লেখেন। তাঁহার এক বিষয়ের যাহা আয় আছে তাতে তাঁর পড়ার খরচ-পত্র সমস্ত চলে যায়। এই মেসের তিনিই প্রধান, সকল ছেলেই তাঁকে মান্য করে। যদি কেহ কখন খরচ-পত্রের অভাবে পড়ে, তিনি তাহাকে চালাইয়া লন। মেসটি দেবকুমার বাবুর মেস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমি এই খানে একটা সিট্ পাইলাম। তার পর কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার চেষ্টা করে কোথাও সুবিধা হইল না, শেষে সিটী কলেজের একটি সদাশয় শিক্ষকের পরামর্শে প্রিন্সিপালের নামে একখানি ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-সম্পাদকের নামে একখানি দরখাস্ত করে হাফ্‌ফ্রি হইলাম। কিছুদিন বাদে একটি টুইসানিও পাইলাম। আমার এক রকমে খরচ-পত্র চলে যেতে লাগিল। অভাব অনাটন হলে মণীন্দ্র বাবু পত্র লিখিতে বলেছিলেন। তাঁকে আমার অবস্থার সকল কথাই লিখিয়া জানাইতাম। তিনি সর্ব্বদা ভাল ভাল পত্র লিখে আমাকে উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। এখন আমার পড়া-শুনা এক রকম নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল।

মেসের মধ্যে আর একটি ছেলে ছিল তার নাম সতীশ, সেও এফ্-এ পড়ে; তবে তার এই সেকেণ্ডইয়ার। কেন জানি না, সতীশের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুতা হয়ে গেল। মেসের মধ্যে আর কয়েকটি ছেলে বিভিন্ন প্রকৃতির ছিল।

আমাদের বন্ধুতা দেখে যেন তাহাদের মধ্যে দু'এক জনের হিংসা হইত। কিন্তু সকলেই দেবকুমার বাবুর বাধ্য—তাঁর ভয়ে কেহ কাহার সঙ্গে প্রকাশ্যে অসদ্ভাব দেখাতে পারিত না। বিশেষ আমাকে দেবকুমার বাবু যেন একটু বেশী ভাল বাসতেন, তাই আমার সঙ্গে কেহ লাগিতে সাহস করিত না। সতীশকে আমার খুব ভাল লাগিত। যথার্থ বন্ধুর মত মনে হইত। দেবকুমারবাবুকে বড় দাদার মত মনে হইত। বস্তুত তাঁকে আমি দাদা বলিতে আরম্ভ করি।

মেসে থাকার ৭ মাস পরে আমার ভয়ানক পীড়া হয়—রেমিটেণ্ট ফিবার। মধ্যে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল। মেসের ছেলেরা অল্প-বিস্তর সকলেই আমার সেবা-শুশ্রূষা-তত্ত্বাবধান করিয়াছিল। তার মধ্যে সতীশই প্রধান; তার ভাবনা আন্তরিক হয়েছিল। তাই সে দিন-রাত আমার কাছে থাকিয়া আমার সেবা করেছিল। দেবকুমার দাদা প্রধান দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁর এক বন্ধু এম, ডি, ডাক্তার, তিনি চিকিৎসা করেন। কিছুই ফি ন্যান্‌নি। মণীন্দ্রবাবু দুইবার এসে দেখে যান। ঔষধ-পথ্যের জন্য ২৫৲ টাকা দিয়েছিলেন।

ঈশ্বর-কৃপায় আমি আরোগ্য হইলাম। পড়ার অনেকটা ক্ষতি হইল, কিন্তু তারপর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে দ্বিতীয় বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। সতীশ গত বর্ষে পাস হয় নাই সেও এবছর পাস হইল।

সতীশদের বাড়ি

ছুটীর সময় সতীশ আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চেষ্টা করে;কিন্তু কার্য্যগতিকে তখন আমার যাওয়া হয় নাই। এবার তার সঙ্গে তাহাদের বাড়ি আসিলাম। সতীশের পিতা হরিহর মুখোপাধ্যায় আগেই আমার নাম সতীশের মুখে শুনিয়াছিলেন, সতীশ বাড়ি এসে সকলের সঙ্গেই আমার কথা বলিত। আমি সতীশদের বাড়ি গিয়ে তাহার পিতা-মাতাকে প্রণাম করিলাম। তাঁহারা আমাকে যেন পরিচিত আত্মিয়ের মত গ্রহণ করিলেন। সতীশের একমাত্র দশ বৎসর বয়স্কা ভগ্নী নির্ম্মলা বড়ই গোল বাধাইল। সে একবার আমাকে দেখেই একেবারে অন্তর্দ্ধান। আর মোটেই আমার সম্মুখে আসিবে না। সতীশ যত বলে "নির্ম্মলা এক গেলাস জল নিয়ে আয়, দু'টা পান নিয়ে আয়," সে সাত ডাকেও আসে না, তার মা যদি নেহাত পেড়াপিড়ি করে জল পাঠান, সে তাড়াতাড়ি গেলাস রাখ্‌তে কতকটা জল ফেলে দিয়ে চলে যায়, তাড়াতাড়িতে পান দু'টার হয়তো খিলি খুলেগেল।

হরিহর বাবু প্রথমে কলিকাতায় গ্রেহেম কোম্পানির বাড়ি চাকরী নিয়ে

ছিলেন। তার পর কি কারণে জানি না চাকরী ছেড়ে, দেশে বাজারে একখানি কাপড়ের দোকান করেন, এখন সেই কারবার বেশ উন্নতি লাভ করেছে। তাথেকেই তিনি বাড়ি, ঘর, বাগান, পুকুর, কিছু জমি-জমা করে বেশ স্বচ্ছন্দে চালাচ্ছেন। সতীশের মাকে দেখ্‌লে কেমন সহজেই যেন প্রাণে একটা ভক্তিভাব আসে। যেমন দেখ্‌তে, তেমনি তাঁর প্রকৃতি, বুদ্ধিও বেশ। সন্তান এই দু'টী মাত্র—সতীশ আর নির্ম্মলা।

একদিন সতীশ ও আমি ভাত খেতে বসেছি, সতীসের মা কি জন্যে নির্ম্মলাকে ডাক্‌লেন—সে কিছুতেই আমার সাম্‌নে আসবে না, দরজার পাশে দালানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাই দেখে সতীশের মা বল্‌লেন, "হ্যাঁ রে নির্ম্মলা, তুই অক্ষয়ের সাম্‌নে আসবি না কেন? অক্ষয়ের সঙ্গে কি তোর বে হ'বে? তা বেশ হবে, আমরা এমন ছেলে আর কোথায় পাব? তোর ভাগ্যি ভাল, হয় তো তাই হবে।" এই কথা শুনে সতীশের বাবাও নাকি হেঁসেছিলেন।

সতীশদের বাড়ি এই প্রথম বার ৪।৫ দিন ছিলাম। বেশ আনন্দে কেটে ছিল। তার পর মেসে ফিরে এলাম। আসিবার সময় সতীশের পিতা আমাকে ধুতিকাপড় ও উড়ুনী দিয়েছিলেন। সতীশের মার সেই সজল নেত্রে "বাবা আবার এসো" কথাটা প্রাণের মধ্যে কত দিন ঝঙ্কার দিত।

দেবকুমার দাদা বি-এ পাস হলে, তারপর কি করবেন—ল দেবেন, কি এমএ পড়বেন, মধ্যে-মধ্যে একথা হয়েছিল। উকীল হ'তে তাঁর বড় ইচ্ছা হইত না; কিন্তু তিনি জমিদার বংশের বলেই হউক আর যে কারণেই হউক আইন-কানুন চর্চ্চার দিকে তাঁহার স্বভাবের একটা টান ছিল। যখন তিনি বি-এ পাস করলেন, তখন আর একটা ঘটনা হয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁর সম্পত্তি সম্বন্ধে সরিকান একটা মকর্দ্দমা চলিয়াছিল। পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া নিজে জেলা কোর্টে সব সময় না গিয়া উকীলের উপর ভার দিয়াছিলেন; কিন্তু সরিকদিগের অন্যায় ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে শেষটা আর ভাল করে কিছু তদ্বির করিলেন না, সম্পত্তিটুকু চলে গেল, যা আয় ছিল, এখন তাও কমে গেল। তাছাড়া বিষয়-ব্যাপারে তাঁর খুব মন খারাপ হয়েছিল, তিনি মনকষ্ট সহ্য কর্ত্তে পারতেন না। আগেই বলেছি তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে থাকতেই ভাল বাসতেন। আর তাঁর একটা একগুঁয়ে স্বভাব ও ছিল। যা করব মনে করিতেন তার থেকে সহজে ক্ষান্ত হইতেন না। মকর্দ্দামায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে, আর মনকষ্ট পেয়ে যেন তাঁর পড়াশুনার দিকের ঝোক একেবারে চলে গেল। কোন বিদেশে চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে

লাগিলেন। এমন সময় এক সুযোগ হইল। আসামে চা বাগানের কাজে এক সাহেব তাঁকে পাঠাতে চাইলেন, তিনিও তাতে স্বীকার হয়ে একে দিনে সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিলেন। আমাকেও বললেন, "চল আমার সঙ্গে, আর পড়ে কি হবে সেখানে তোমারও একটা কাজ যোগাড় করে নেওয়া যাবে।" আমি বলিলাম আপনি যান, যদি কোন সুবিধা হয় আমাকে লিখবেন। আমি এখন বি-এটা দিতে চেষ্টা করি। দেবকুমার দাদা আসামে চলিয়া গেলেন।—(ক্রমশ)

শুভগ্রহ

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

পঞ্চাননের বাটীর দ্বিতল—হেমাঙ্গিনীর কক্ষ

[হেমাঙ্গিনী বিছানায় শয়ন করিয়া একখানি নভেল পড়িতেছিল। সহসা বহি বন্ধ করিয়া সে উঠিল। নিকটে ছোট টেবিলের উপর ডিপা ছিল—তাহা হইতে পাণ লইয়া মুখে দিল। পরে খাটের উপর বসিয়া ঝুঁটি-বাঁধা আর্দ্র কেশ শুকাইবার জন্য খুলিয়া দিল। কুঞ্চিত সুকৃষ্ণ কেশ-গুচ্ছ ঢেউয়ের মত মুখ-চোখ বহিয়া নাচিয়া নামিয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী নভেল-হাতে ভাবিতেছিল]

হেমাঙ্গিনী। এঁর সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে! মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো এঁদের পছন্দ নয়—তাহলেই সর্ব্বনাশ! নাটক-নভেল পড়লে মেয়েদের হিষ্টিরিয়া হবে—এঁদের বিশ্বাস! কিম্বা কারুকে লুকিয়ে চিঠি-পত্র লিখে কি বিপত্তি ঘটাবে, নয় ফাজলামি শিখে স্বামী-রত্নটিকে গবুচন্দ্র বানিয়ে ফেলবে! অবাক কাণ্ড! মাঝে মাঝে রঙ্গ করি বলে উনি রেগে ওঠেন—তা কি করব, আমার রঙ্গ করতে ভাল লাগে যে! স্বামীর সঙ্গে একটু রঙ্গ-রহস্যও করতে পাব না? তাঁকে ভট্‌চায্যি মশাই কি গুরুঠাকুরের মত মান্য করা, আর যার ইচ্ছা হয় করুকগে,—আমার দ্বারা তা পোষাবে না—এতে যদি নরক-বাস হয় ত নাচার! সেকালে একটা বাসর ঘরের মজলিস পেলে ভদ্দরলোকের মেয়েরা কি বেহায়াপনাই করত! মা গো, বইয়ে পড়লেও গা শিউরে ওঠে।

বৃদ্ধা ঝীয়ের প্রবেশ

ঝী। ওগো বৌমা, ধোপা এসেছে। বলছে, কাল রাত্রে তাড়াতাড়িতে কাপড়ের সঙ্গে এই ছবিখানা গেছল। (ছবি বাহির করিল।)

হেমাঙ্গিনী। ছবি ? কই, না ! আমাদের বাড়ীর—? দেখি, (ছবি লইল) বাঃ, বেশ চেহারা ত ! এ আমাদের বাড়ীর নয়।

ঝী। আঃ, তুমিও যেমন বাপু, ধোপা বলছে, আমাদের বাড়ীর—

হেমাঙ্গিনী। বটে! তা হলে ত আর এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতেই পারে না। আমাদের বাড়ীর জিনিসপত্রের খপর আমাদের চেয়ে সে বেশী রাখে !

ঝী। তা কি হবে ?

হেমাঙ্গিনী। হবে আর কি ! আপাততঃ আমার কাছেই থাকুক। আর কারো বাড়ীর ছবি—ভুল করেছে ! আমার কাছেই থাক—ওর কাছে এখন দিলে কোথায় হয় ত শেষে হারিয়ে বসে থাকবে।

ঝী। তা হলে কি বলবো গো ? সে যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে—

হেমাঙ্গিনী। ওমা, করেছিস কি ? তাকে বসবার জন্য পাদ্য-অর্ঘ্য দিস নি ? দাঁড় করিয়ে রেখে, অমান্য করছিস্ ? শীগ্‌গির আসন দিয়ে আয়।

ঝী। কি বাপু সব বকতে নাগলে—বুঝতেও পারি না। কি করব ?

হেমাঙ্গিনী। তাকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দি'গে যা !

ঝী। অ মা—অমন গ্যাঁটাগোঁটা মিন্সে—যমের মত যণ্ডা, এক ঝটকা দিয়ে আমাকে গুঁড়িয়ে ফেলবে, তাকে আমি চাবুক মারব ! ও তোমার বিশেকে বলগে, তা হলে !

ঝী প্রস্থানোদ্যতা হইলে হেমাঙ্গিনী ডাকিল, "অ ঝী—"

ঝী। (ফিরিয়া) কেন গো ? আবার বক্‌বে না কি ?

হেমাঙ্গিনী। তোরই ত অন্যায় ! তাকে আসন দিয়ে বসাবি না—চাবুকও মারবি না ! শোন্—তাকে বল্‌গে, ছবি আমাদেরই, রেখে দিয়েছি।

ঝী। তাই বল। (প্রস্থান)

হেমাঙ্গিনী। ন্যাকা মাগী ! (ছবি দেখিয়া) ছবিটা বেশ ! চেহারাখানা মন্দ নয় ! কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি, মুখচোখ চমৎকার—হাঁ, সুপুরুষ ! ইস্, গোঁফ দুটি পাকানো হয়েছে—এইটি আমি দেখতে পারি না। আবার আধমাথা শাঁস বের করে চুলকাটা ! এইটি আর ঐ ছুঁচোর লেজের মত গোঁফ সরু করা—দেখলে হাড় জ্বলে যায় আমার !

[নেপথ্যে পঞ্চানন। ওরে, গড়গড়াটা ভালো করে ফিরিয়ে রাখিস্। বুঝলি বিশে, ছিঁচকে দিয়ে সাফ্ করতে পারিস না, বেটা ?]

হেমাঙ্গিনী। এই যে কোকিলের স্বর—বসন্ত তা হলে আসছেন! একটু মজা করা যাক্! (জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ছবি দেখিতে লাগিল।)

পঞ্চাননের প্রবেশ

পঞ্চানন। সেজেগুজে জানলার ধারে দাঁড়ান হয়েছে—বাড়ীতে আর কোথাও যায়গা নেই? বৃদ্ধস্য তরণী ভার্য্যা—শাস্ত্রকারের কথাই ঠিক দেখছি! ভারী ভুল করেচি! সারা জীবনটা বিয়ে না করে তোফা কাটাচ্ছিলুম, হঠাৎ বৃদ্ধ বয়সে এ কি গ্রহ! উনি ভাবেন, আমি ওঁর যোগ্য নই! অথচ ওঁরই জন্য সংস্কৃত কাব্য-নাটকের পাতা উল্‌টেছি; রাশীকৃত বাঙ্গলা উপন্যাস পড়েছি, যদিও ছাই আজকালকার সব বাঙ্গলা কথার মানেগুলো সব সময় বুঝতে পারি না। নাঃ—(হতাশভাবে মুখ বিকৃত করিল।) আর কিছু হোক না হোক, এটুকু এখন বেশ বুঝেছি, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হলেই সর্ব্বনাশ! এঁর চালচলনগুলো আমার কাছে ত মহীয়সী হিন্দুললনার মত মনে হয় না। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে, একবার দেখতে হল! (সতর্কভাবে পা টিপিয়া জানালার নিকট অগ্রসর হইল।)

হেমাঙ্গিনী। (ছবি দেখিতে দেখিতে ঈষৎ অস্ফুট স্বরে) দিব্যি চেহারা-খানি! বাঃ,—কেমন ভ্রূ, যেন মদনের ফুলধনু! কাব্যে যা পড়েছি, একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে। নাক—আহা, যেন শুকের চঞ্চু! চোখদুটি যেন—যেন—যেন—দুটি মাণিক জ্বলছে! একেই ত বলে পুরুষ!

[পঞ্চানন পিছন হইতে সহসা ছবি ছিনাইয়া লইল।]

হেমাঙ্গিনী। (সচকিতে) কে? তুমি! আমি ভাবলুম—

পঞ্চানন। ভাবলে কি! কেমন ধরা পড়েছ, আজ! খোলা জানলার ধারে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে মদনের ফুলধনু দেখছেন! দেখাচ্ছি আজ মজা!

হেমাঙ্গিনী। কি? হয়েছে কি, বল ত। চেঁচাচ্ছ কেন? রোজ রোজ এমন ঠাট্টা ভালো লাগে না!

পঞ্চানন। সত্যিই ত! প্রণয়-নাটকে এমন বাধা!

হেমাঙ্গিনী। দেখ, চালাকি রাখো, ছবি দাও!

পঞ্চানন। কার ছবি, বল?

হেমাঙ্গিনী। তোমার অত জানবার দরকার কি?

পঞ্চানন। আলবৎ!

হেমাঙ্গিনী। ওঃ, অমন ঢের আলবৎ দেখেছি—চালাকি ভালো লাগে না। ছবি দাও বলছি।

পঞ্চানন। দোব না। কভি নেহি!

হেমাঙ্গিনী। দেখ, মাতালের মত অমন করো না! লোকে বল্‌বে কি?

পঞ্চানন। লোকে বলবে কি! ও সব কোন কথা শুনতে চাই না। কার ছবি বল!

হেমাঙ্গিনী। বলব না—কি করবে?

পঞ্চানন। কি করব! এর ঠ্যাং ভাঙ্গব।

হেমাঙ্গিনী। ও'ত তোমার জন্যে পথে অম্‌নি ঠ্যাং বাড়িয়ে বসে আছে!

পঞ্চানন। বটে! ভারী দরদ দেখছি যে!

হেমাঙ্গিনী। কেনই বা দরদ না হবে? যাক্‌, তোমার সঙ্গে এখন কথা কাটাকাটি করতে পারি না। ছবি দাও!

পঞ্চানন। দিচ্ছি, এই!

বিশে চাকরের হুঁকা লইয়া প্রবেশ

বিশে। বাবু—

পঞ্চানন। বেরো বেটা—বাবু! কে তোর বাবু?

বিশে। আজ্ঞে তামাক—

পঞ্চানন। কে তোকে তামাক দিতে বলেছে বেটা? বেরো, সব খুন করে ফেলবো এখনি! (মারিতে গেল—বিশের হুঁকা ফেলিয়া প্রস্থান)

হেমাঙ্গিনী। কি করছ, বল দেখি! ক্ষেপলে না কি?

পঞ্চানন। এই দেখাচ্ছি ক্ষেপামি! আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বো। গলায় দড়ি দোব, সন্ন্যাসী হয়ে যাব।

হেমাঙ্গিনী। বেশ কথা! শেষেরটায় আমি খুব রাজী আছি! বল ত গেরুয়া কাপড়খানা আজই ছুপিয়ে দি! হাতে কাজও তেমন নেই। তা হলে গেরুয়া মাটি কেনবার পয়সাটা দিও!...ওঃ, হাতে নেই, এখন? তা থাক্‌—পয়সাটা আমিই আপাততঃ দিয়ে দোব'খন। মোদ্দা তুমি শোধ করো।

(প্রস্থান)

পঞ্চানন। (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল) নাঃ, মেরে ফেললে, মেরে ফেললে, আমাকে! লোকে যে কি করে বিয়ে করে স্ত্রী নিয়ে আরামে থাকে, আমি শুধু তাই ভাবি! এত করে ভয় দেখালুম, তা মানলে না একটু! এবার থেকে আমি লাঠি ধরব! হাঁ, ধরব! ও কোমল জাত বলে আর মায়া-দয়া নয়! বাবা, একে বলে কোমল জাত! উঃ,—নাঃ—এই মেয়েগুলো আগে বেশ ছিল!

লেখাপড়া জানত না, ডেঁপোমি করত না—মুখটি বুজে রান্নাঘরের কোণে বসে থাকত, আর আলপনা দিত, থাকত যেন পোষা বেরালটি, আর এ একেবারে বন্যবরাহের মত দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছে! খানকতক বই পড়ে ডেঁপোর সর্দ্দার হয়ে পড়েছে। সমাজটাও, দেখছি, গেল, একেবারে উচ্ছন্ন গেল! উপায় কি? উপায় কি?

চতুর্থ দৃশ্য

পঞ্চাননের বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা

যতীশ ও ষষ্ঠীর প্রবেশ

ষষ্ঠী। এ জায়গা এখনও ছাড়বে না? এই রকম মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে?

যতীশ। আহা, আর-একটু দাঁড়াও না!

ষষ্ঠী। আর-একটু আর-একটু করে যে (ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া) একঘণ্টা কেটে গেছে, তার হুঁস আছে কি!

যতীশ। (পঞ্চাননের বাটীর দ্বিতলের পানে উৎসুকভাবে চাহিয়া রহিল; উত্তর দিল না।)

ষষ্ঠী। লোকে পাগল ভাববে যে হে।

যতীশ। ভাবুক গে।

ষষ্ঠী। নাঃ, ঠিক। এরেই বলে প্রেম,—'যখন থাকে না futureএর চিন্তা, থাকে না'ক shame.'

যতীশ। Trumpet অফিস থেকে যে ঠিকানা আনলে সে ত এই বাড়ীরই! একবারও দেখতে পেলুম না! আমি শুধু একটিবার তাকে দেখবার প্রত্যাশী! বাড়ীটাতে কি কেউ নেই? জানলার ধারে আসতে কি একেবারে মানা আছে! ওঃ—এই ইট-কাঠ-দেওয়ালের আড়াল! কেন এত—কেন এত আড়াল তুলে মানুষ লুকিয়ে থাকে?

ষষ্ঠী। তোমার মত পাগলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য,—আর কেন? যাক, কথা শোন। সমস্তর একটা সীমা আছে! তুমি প্রেমে পড়েছ, তাও এখনও নায়িকার চেহারা দেখনি—শুধু খপরের কাগজে বিজ্ঞাপনে দুটি কথা পেয়েছ,—সুন্দরী আর শিক্ষিতা! History of Lovers যদি কখনও লেখা হয় ত তোমার স্থান হবে সকলের উপর। গল্প-নাটকের নায়কদেরও হারিয়েছ তুমি ভাই!

যতীশ। (উপরের দিকে চাহিয়া) ঐ না—ঐ না একখানা শাড়ীর লাল পাড় দেখা গেল !

ষষ্ঠী। তুমি দেখ ভাই। আমি আর পারি না। সেকালের রাজাদের মাইনে-করা বিদূষকরা যা না করেছে, আমি তোমার honorary বয়স্য তার চেয়ে ঢের বেশী সহ্য করেছি। সখে. এখন আমি বিদায় হলুম। ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে, রোদে মাথা ফাটছে---জীবনটার মূল্য যত কমই হোক, আমি এমন বেঘোরে সেটাকে হারাতে পারব না।

যতীশ। ওঃ—এই বাড়ী. এই বাড়ীটা ব্লটিংয়ের মত আমার মনটাকে শুষে নিচ্ছে যেন !

ষষ্ঠী। জোঁকের মত রক্ত চুষছে, বল। তার চেয়ে একবার কাকেও ডেকে দেখ না।

যতীশ। না, না, সেটা বড় অসভ্যর মত দেখাবে। যদি এ বাড়ীর চাকর কি বামুন হবার সৌভাগ্যও আমার থাকত—

ষষ্ঠী। তা হলে আসল দিকটায় দুর্গতির সীমা থাকত না। নাঃ, আর বকতে পারি না। চল্লুম— (প্রস্থান)

যতীশ। ষষ্ঠী—চলে গেল। যাক্, আমি কিন্তু যেতে পারছি না। আজ তিন দিন ধরে বাড়ীটার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তার শাড়ীর আঁচলটুকুও চোখে দেখতে পেলুম না ! এ যেন সেই দৈত্যপুরীর মধ্যে বন্দিনী রাজপুত্রীর মত প্রিয়া আমার নিরালায় বসে—কি করছে, কে জানে ! মনটা আমার অস্থির হয়ে উঠেছে। আর পারাও যায় না। বাবাকে আজ সটান বলব, যদি বিয়ে করতে হয় ত এই মেয়েকে—ও কালিন্দী-ফালিন্দী পোষাবে না। এতে তিনি রাগ করেন ত মুক্ত পৃথিবী আমার আশ্রয় ! এতই কি অধীনতা !—কিন্তু মেয়েটির নামও ত জানতে পারলুম না ! এ যে আগাগোড়া ধাঁধাঁয় পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছি ! নামহীনা, মূর্ত্তিহীনা, এ কার পিছনে ঘুরে মরছি ! একটা চাকর-বাকর যাকে হোক ডাকা যাক্। ষষ্ঠীটা চলে গেল—থাকলে ভাল হত ! আমার যে পা বেধে যাচ্ছে ! কি কথা কইব ভাবতেই জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে ! নাঃ, কোন উপায় নেই, কোন উপায় না—

(হতাশভাবে সম্মুখের বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া পড়িল)

[ইতিমধ্যে হেমাঙ্গিনী আসিয়া উপরের খড়খড়ির পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল ; যতীশ তাহা দেখে নাই।]

হেমাঙ্গিনী। (স্বগতঃ) কে এ ছোকরা! আজ কদিন ধরে বাড়ীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ীটাকে যেন গিলবে, এমনি ভাব! চায় কি, ও! ভদ্দরলোকের বাড়ীর সামনে এমন করে ঘোরা আর উপরপানে অমনভাবে তাকানো, এ'ত ভাল বোধ হয় না—মতলব ত ভালো ঠেকছে না! অথচ মুখ-চোখ দেখলে মানুষটিকে নিরীহ ঠাণ্ডা বলেই মনে হয়! আড়াল থেকে আর একটু দেখি—

যতীশ। (মাথা নাড়িয়া) একবার কি দেখা পাব না! ওঃ (উপর-দিকে চাহিয়া দেখিয়া মাথা নামাইল)

হেমাঙ্গিনী। নাঃ, এ'ত ভাল নয়। দি মাথায় খানিক জল ঢেলে। না, তাতে বাড়ীর নিন্দে হতে পারে। ঝীটাও কি মানুষ যে, তাকে দিয়ে চৈতন্য করিয়ে দেব! তবু একবার ঝীকে পাঠাই—মানুষটা কি চায়, জিজ্ঞাসা করুক!

(প্রস্থান)

যতীশ। একবার উঠে একটা চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা যাক! আর এ সমস্যা নিয়ে ঘোরা যায় না! [পঞ্চাননের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল]

ধীরে ধীরে পঞ্চাননের প্রবেশ

পঞ্চানন। যা এঁচেছি, ঠিক। ছোঁড়াটা উপর-পানে তাকিয়েছিল—হেমাঙ্গিনী এসে সাশির পাশে দাঁড়িয়ে কি ইসারা করলে, আর অমনি ছোঁড়াটা সুড়সুড় করে বাড়ীর মধ্যে সেঁধুল। এ সব কার বরদাস্ত হয়! দি এই লাঠির ঘায় মাথাটা দু-ফাঁক কোরে। কিন্তু ছোঁড়া ষণ্ডামার্কটা যদি উল্টে আমাকেই—(চারিধারে চাহিয়া) এক বেটা পাহারওলারও দেখা নেই! দরকারের সময় পাব কেন! পূজোপার্ব্বণটি হলে লম্বা সেলাম হাঁকড়ে হেসে বখশিস্ চাইতে আসা—সে ঠিক আছে! তখন ভাবগতিক দেখলে মনে হয় যেন সরকারের নিমক খেলেও আমার বাড়ীটি চৌকি দেওয়াই তাঁর একমাত্র কাজ! দোব বেটার নামে রিপোর্ট করে। এমন রাগ হচ্ছে—কি করি, এখন করি কি! নাঃ, লাঠি ধরতেই হবে, ধরবই আজ! এ বেটাকে না হয়—ঘরের লোকটি আছে ত, তাকেই আজ দেখে নিচ্ছি। এ বেটা পর, তায় ষণ্ডা ছোঁড়া, এক ঘা খেলে পাঁচ ঘা শোধ তুলবে! সে মেয়েমানুষ আমার সঙ্গে পারবে কেন? তা ছাড়া নিজের ঘর শাসিত করা আগে চাই—আজ একটা হেস্তনেস্ত করবই! [গৃহমধ্যে প্রবেশ-উদ্যম; এমন সময় যতীশ বাহিরে আসিতেছিল; উভয়ে মৃদু রকমের ধাক্কা লাগিয়া গেল। পঞ্চানন সভয়ে বাহিরে সরিয়া আসিল; যতীশও তৎ-পশ্চাৎ আসিল]

যতীশ। কি রকম হল, মশায় ?

পঞ্চানন। দেখতে পাইনে বাবা—বুড়ো মানুষ, ভাবতে ভাবতে আসছিলুম। এটা আমারই বাড়ী কি না—

যতীশ। আপনার বাড়ী—আপনার—তা—(জিজ্ঞাসুভাবে পঞ্চাননের মুখের পানে চাহিল)

পঞ্চানন। তা—কি ?

যতীশ। না—কিছু না। (সলজ্জভাবে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল)

পঞ্চানন। (স্বগতঃ) ছোঁড়াটা তেরিমেরি মেজাজের নয়, দেখছি—তাহলে ভয় নেই। (প্রকাশ্যে) এটা কি রকম ভদ্রতা, মশায়—আর একজনের বাড়ীর মধ্যে ঢোকা, তার বিনা অনুমতিতে ! আবার তার অনুপস্থিতিতে ! কি দরকার আপনার ? আপনি কাকে চান ?

যতীশ। আমি—আমি—

পঞ্চানন। ঢোঁক গিলছেন কেন ? বলুন, বলুন শীগ্‌গির। না হলে জানেন আপনি trespass করেছেন বলে—

যতীশ। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

পঞ্চানন। (স্বগতঃ) এ যে চেনা চেনা মুখ ! কোথায় দেখেছি যেন—। ওঃ, ঠিক, সেই ফটোটা—দেখি—(পকেট হইতে ফটো বাহির করিয়া একবার ফটোর পানে পরক্ষণে যতীশের পানে চাহিয়া) হাঁ, হুবহু মিল—এই লোকই একই লোক ; ঠিক, ঠিক ! (প্রকাশ্যে ছবি দেখাইয়া) একে চেনেন ?

যতীশ। (চমকিয়া) এ্যাঁ—এ—এ—এ আপনি কোথায় পেলেন !

পঞ্চানন ! যেখানেই পাই অত খোঁজে কাজ কি আর ? এখন ভাল কথা শুনুন। এ বাড়ীতে আমি আর আমার স্ত্রী—তার মধ্যে ছবিটবি রাখবার জায়গা হবে না। ফের যদি এধারে আসেন ত আমি অল্পে ছাড়ব না, জানেন ! এদিকে চেহারা ত বেশ ফুটফুটে দেখছি—দাঁড়াবার কি আর জায়গা পাও না, বাপু ? সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গেলে গড়ের মাঠ পাবে, কচি কচি ঘাসে ভরা—সেখানে গিয়ে চরে বেড়ালে শরীর থাকবে ভাল—বুঝলে ! এ বাড়ীটা দার্জ্জিলিং নয়—আর হোটেলও নয়,

যতীশ। আচ্ছা, আমার একটা কথার জবাব দিন, শুধু। এ ছবি আমি যে জন্য পাঠিয়েছিলুম—

পঞ্চানন। তা আমি খুব বুঝি। তবে বাপু, যেখানে আমি সশরীরে মালিক

দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে ছবির ভিদ্ গাড়বার চেষ্টা মিছে! এ ছবি মিছে পাঠিয়েছ! কোন আশা নেই।

(প্রস্থান)

যতীশ। লোকটা কি হেঁয়ালিতে কথা কইলে! তার কি এই লোকটার সঙ্গে তাহলে বিয়ে হয়ে গেছে! ··· ওঃ,—শুধু ষষ্ঠীর জন্যে, শুধু ষষ্ঠীর দোষে! ও মেয়ের কি বিয়ে হতে বাকী থাকে? মিছে দেরী করেদিলে!······কিন্তু এই চোয়াড়ে লোকটা—অমন শিক্ষিতা, সুন্দরী!······আর মিছে ভাবা—আমার সব আশার আজ অন্তর্জ্জলি হয়ে গেল! (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রস্থান করিল।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মধুমূত্রে আলু

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'কুশদহে' "পথ্য" শীর্ষক প্রবন্ধের ৩৯ সংখ্যক সূত্রে, ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আলুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "আলুতে শ্বেতসারের অংশ অত্যন্ত অধিক, একারণ ইহা মধুমূত্র রোগীর অপথ্য।" আলু সম্বন্ধে এই ধারণা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই জন্য পূর্ব্বে এবং ইদানীংও অনেক চিকিৎসক মধুমূত্র অর্থাৎ Diabetes রোগীর পথ্য হইতে আলু অপসারিত করেন। *

যেসমস্ত শ্বেতসার-সম্বলিত দ্রব্য আমরা ভক্ষণ করি তাহা মুখস্থিত লালা-সংযোগে, Maltose নামক এক প্রকার শর্করাতে পরিণত হয় এবং ঐ Maltose শেষে অন্ত্রস্থ পাচকরস-সহযোগে Glucose নামক শর্করাতে পরিণত হইয়া শরীরে পরিশোধিত হয়। বহুমূত্র রোগীর মূত্র পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ Glucose জাতীয় শর্করা প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইতেছে। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, শ্বেতসার-সম্বলিত খাদ্য উক্ত রোগীর অপথ্য। আলুতেও শ্বেতসার বিদ্যমান আছে, এজন্য আলুও মধুমূত্র রোগীর অপথ্য।

* আমার প্রবন্ধ সুরেন্দ্রবাবুর ঠিক প্রতিবাদ নহে। তিনি যাহা লিখিয়াছেন পূর্ব্বে অবশ্য সেই ধারণাই ছিল, কিন্তু চিকিৎসা-জগতের নূতন আবিষ্কারে জগতের যে উপকার সাধিত হইতেছে তাহা সাধারণের, বিশেষ ভুক্তভোগীর জ্ঞাতব্য। তজ্জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

লেখক

এই ধারণাই বরাবর ছিল। কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আলুর শ্বেতসার বহুমূত্র রোগীর অপকার তো করেই না বরঞ্চ উপকারই করে।

বৃটিশ মেডিক্যাল জার্ণালের ১৯০২ সালের একটি সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই সম্বন্ধে অর্থাৎ ডায়াবিটিশ রোগীর পক্ষে, রুটীর পরিবর্ত্তে কিয়ৎপরিমাণে আলুর ব্যবহারের উপকারীতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। Kuelz. Sanndby, Dajardin প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অল্প পরিমাণে আলু ব্যবহারের উপদেশ দেন, এই প্রবন্ধে তাহারই সম্বন্ধে বিস্তারিত মন্তব্য ছিল।

১৯০৪ সালের মার্চ্চ মাসে, বৃটিশ মেডিক্যাল জার্ণালে এসম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। উহাতে Sir James Sawyer "Improvements in dietetics of diabetics" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন যে, বহুমূত্র-রোগীকে আলু খাইতে দেওয়ার ব্যবস্থা আজকালকার পথ্যজ্ঞানের বিশেষ উন্নাত। সাধারণত যে প্রণালীতে আলু রন্ধন করা হয়, সেখাণে রোগীরা বড় সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু খোসা-শুদ্ধ সিদ্ধ আলুই প্রশস্ত। সিদ্ধ আলুর রুটী প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিতে তিনি পরামর্শ দেন।

French Academy of Medicine নামক সভাতে M.Mosse দেখাইয়াছিলেন যে উক্ত রোগীকে এমন কি ৩ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দেড় সের আলু প্রত্যহ খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। তিনি কতকগুলি বহুমূত্ররোগীকে রুটী খাইতে দিয়াছিলেন এবং আরো কতকগুলিকে সমপরিমাণ আলু খাইতে দিয়াছিলেন, পরে দেখিয়াছিলেন যে শেষোক্তদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছিল; যথা ঃ—

(১) তাহাদিগের প্রস্রাব কমিয়া গিয়াছিল।

(২) রাসায়নিক মূত্রপরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল যে অতি অল্প পরিমাণ শর্করাই তাহাদিগের প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়াছিল।

(৩) তাহাদের পিপাসা খুব কমিয়া গিয়াছিল।

(৪) তাহাদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

Mosse বলেন যে আলুর মধ্যে যে ক্ষারময় পদার্থ বিদ্যমান আছে তাহারই জন্য এত উপকার হয়। Futcherএর মতেও আলুর শ্বেতসার মধুমূত্র রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। তিনিও বলেন যে আলু উক্ত রোগীর পিপাসা, Neuralgia প্রভৃতি উপসর্গের উপশম করে।

Sir Brunton লিখিয়াছেন যে এই রোগীকে আলুর "কুড়কুড়ি" ভাজা অর্থাৎ আলু বেশ পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া এমন ভাবে ভাজিতে হইবে

যেন বেশ মচমচে হয়) খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। শ্বেতসারবিহীন খাদ্য খাইয়া রোগীরা আহার সম্বন্ধে বড় কষ্ট পায় এবং এই খাদ্যের উপর বড় ঝোঁক হয়। তজ্জন্য চিকিৎসকের মানা করা সত্ত্বেও "লুকাইয়া চুরাইয়া" উহা খাইতে থাকে। ভর্জ্জিত আলু খাইবার ব্যবস্থা দিলে ঐ সমস্যার সমাধান সহজে হইয়া যায়। Surgen General Sir Lukisও অধ্যাপনাকালে আমাদিগকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত মনীষিগণের উপদেশ অনুসরণ করিয়া আমার চিকিৎসাধীনস্থ মধুমূত্র রোগীদিগকে আলু খাইতে দিয়া থাকি। কখনও আলু ঘিয়ে ভাজিয়া (কুড়কুড়ি), কখনও আলুর দম, কখনও বা আলু সিদ্ধর রুটী, এইরূপ বদলাইয়া বদলাইয়া দিই। ইহাতে নিত্য "একঘেয়ে" হয় না। পরে মূত্র পরীক্ষা করিয়া বরাবরই সন্তোষজনক ফল পাইয়াছি।

শ্রীবিমলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

কুশদহ-বৃত্তান্ত

(খাঁটুরা)

অতীত স্মৃতি যখন মনোহারিণী মূর্ত্তিতে নব পরিণীতা বধূর ন্যায় সলজ্জ আস্যে মনো-মন্দির অধিকার করিয়া তথায় ভাবের পারিজাত কুসুম ফুটাইয়া জীবনের শুষ্ক মরুভূমিকে কোমলতার মধুর ধারায় অভিষিক্ত করিতে থাকে, তখন তাহার করস্পর্শে হৃদয়তন্ত্রীর তার গুলি মধুর নিক্বণে ধ্বনিত হইয়া উঠে। যদিও কবি বলিয়াছেন :—

"অতীত সুখের দিনে,　　পুনঃ আর ডেকে এনে
হে মানব হ'য়ো না কাতর।"

তথাপি অতীতের মধুর স্মৃতি-জীবনে যে কোমলতার ফল ফুটাইয়া দেয়, তাহার পবিত্র সৌরভ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে আমরা সকল সময়ে,ইচ্ছা করি না। পুরাতন স্থান ও পুরাতন কথা অতীত স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া থাকে। সেই জন্য কোন প্রাচীন স্থানের ভগ্ন স্তুপ বা ধ্বংস প্রায় স্থান আমাদের চক্ষের সম্মুখে পতিত হইলে, অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহারই আলোচনা মনোমধ্যে উদিত হইয়া অতীতের মোহিনী ছবি মানস-চক্ষে ভাসিতে থাকে।

ঐ যে খাঁটুরার কঙ্কনা হ্রদের পরপারে মেদিয়া নামে পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র পল্লী দেখা যাইতেছে, অতীত স্মৃতি যখন বলিয়া দেয় উহাই রাজা রত্নেশ্বরের রাজবাটী, তখন কি মনে হয় না যে, আজ কুশদহ-বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়া এই অতীত আলোচনা ক্ষণেকের জন্য ও হৃদয়কে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব-রসে বিভোর করিতেছে! পাঠক, আবার যখন অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, পৃথিবীর বিখ্যাত পর্য্যটক হিয়েন্‌সাং এই কুশদহের পশ্চিম-প্রান্তবর্ত্তী কোন জঙ্গলে যতির বেশে ছিলেন, তখন কুশদহ-বাসি তোমাদের মনে কি এক প্রফুল্লতার আবেগ আসিয়া উপস্থিত হয় না? তখন কি ইচ্ছা হয় না, বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া অতীতের মাধুরীতে আপনাকে সিক্ত করিতে! খাঁটুরার প্রাচীন ইতিহাস অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত। রাজা রত্নেশ্বরের রাজধানী খাঁটুরার এত নিকটে থাকিয়া ইহা যে পুরাকালে ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান ছিল না, তাহাই বা কে বলিতে পারে। খাঁটুরা নাম কেন হইল এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। প্রবাদ এইরূপ যে এখানে রাজা রত্নেশ্বরের খোঁয়াড় ছিল, এই খোঁয়াড় হইতে খাঁটুরা নাম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তরাব খাঁ নামক একজন সমৃদ্ধিশালী মুসলমানের নাম হইতে খাঁ-তরাব, পরে "খাঁ-তুরা, এই নাম হইয়াছে। যখন ইহার কোন প্রাচীন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না তখন আমরা তাম্বুলীর আগমন কাল হইতে খাঁটুরার বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। খাঁটুরা গ্রামের তাম্বুলীগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া খাঁটুরা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইছাপুর গ্রামের জমিদার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে তাম্বুলীগণ আনুমানিক ১৬৪৬ খৃঃ অঃ প্রথমে খাঁটুরায় আসিয়া বাস করেন। এই তাম্বুলিদিগের মধ্যে দত্ত বংশের মহেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ই বেড়েলা বৈঁচি হইতে ১০৭০ সালে খাঁটুরায় আসিয়া বাস করেন। এই মহেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ই খাঁটুরা দত্ত বংশের আদি পুরুষ। খাঁটুরাকে এক দত্ত বংশই উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। এই মহেশচন্দ্র দত্তের সন্তান সন্ততিগণ, কালে এরূপ সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইয়াছেন যে বাহিরের কোন ভদ্রলোকে ইহাদিগকে অমায়িক ও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের ন্যায় সদাচার সম্পন্ন দেখিয়া মুগ্ধ হন। একদিন গোবরডাঙ্গার ষ্টেশনে, গোবরডাঙ্গার জমিদার দিগের ম্যানেজার ও গোবরডাঙ্গা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, খাঁটুরার দত্ত দিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া কায়স্থ বলিয়া ভ্রম হয়।

দত্ত বংশের একটি বংশাবলী তালিকা এখানে দেওয়া হইল। মহেশচন্দ্র দত্তের

পুত্র, গোবর্দ্ধন ; তৎপুত্র রাম রাম ; রাম রামের পুত্র দীন নাথ, তৎপুত্র, শঙ্কর, তৎপুত্র রঘুনাথ ও বিজয়রাম। রঘুনাথের পুত্র ফকির চাঁদ ; ফকিরচাঁদ দত্তের পুত্র কালীকুমার।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংঘর্ষে ও বংশ পরম্পরায় স্বাভাবিক সৎগুণে ইঁহারা সপ্তগ্রামী সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাম্বুলিগণ খাঁটুরায় আগমন করায় খাঁটুরার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই খাঁটুরার উত্থান-পতন দত্তদিগের উন্নতি অবনতির সহিত বিজড়িত। এই তাম্বুলিদিগের যত্নে এথানে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আগমন করেন তাঁহাদিগের সরলতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা এখানে লিখিত হইল।

১। পূর্ব্বে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য চকমকির পাথর ব্যবহৃত হইত। কোন ব্রাহ্মণের স্ত্রী সেই পাথরখানি খোড়ো চালে গুঁজিয়া রাখেন। ব্রাহ্মণ দেখিয়া বলেন, ব্রাহ্মণি, সর্ব্বনাশ করিয়াছ—এখনি চালে আগুন লাগিবে।

২। কোন কাশ্যপ গোত্রের ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন ব্রাহ্মণি তোমার গোত্র কি ?

ব্রাহ্মণী বলিলেন—কেন কাশ্যপ গোত্র !

ব্রাহ্মণ—হ্যাঁ—তবে স্ব গোত্রে বিবাহ করিয়াছি !

ব্রাহ্মণী তখন বুঝাইয়া দিলে ব্রাহ্মণ সমস্ত বুঝিলেন।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় কালীকুমার দত্ত

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত লিখিত *।

বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারের কর্তৃপক্ষের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমারোহের সহিত সম্পন্ন করা প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল। বিশেষতঃ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী লোকেরা বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে এখনও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। কালীকুমার একজন দেশ বিখ্যাত হিন্দু ক্রিয়াশীল ধনাঢ্য লোক ছিলেন। দানসাগর করিয়া তাঁহার মহৎ শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন না হইলে তাঁহার উপযুক্ত হয় না এবং তাহাতে বংশের গৌরব থাকে না। ইহা করিবার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয়,

---

* এই প্রবন্ধটি অনেক দিন আমাদের হস্তগত হইয়াছিল কিন্তু উপযুক্ত সময় ও স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারি নাই। (সম্পাদক)

এবং সকল প্রকার কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা তাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞান করিয়াছিলেন। কালীকুমার গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত, সামান্য লোক হইয়া অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন পরিশ্রমী অধ্যবসায়শীল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, গৃহ বিবাদে গ্রামের লোকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত না। বিবাদের কথা শুনিলেই, তিনি নিজে বিবাদ স্থলে উপস্থিত হইতেন এবং যে কোন প্রকারে তাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন। তজ্জন্য নিজের কার্য্যের ক্ষতি করিয়াও তাহা করিতে কাতর হইতেন না। এজন্য লোক সমাজে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব প্রাধান্য ও আধিপত্য এমন ছিল যে, তাঁহার অপেক্ষা অনেক গুণে ধনাঢ্য কত বিদ্বান লোকের সেরূপ হয় না। দেশে সমাজ মধ্যে আট, দশ, বার হাজার বা তদপেক্ষা বেশী ব্যয়ে যে সকল ক্রিয়া কর্ম্ম হইয়াছে, তাহার অধ্যক্ষতা তিনি করিতেন। গ্রামে একটি আদর্শ বিদ্যালয় ছিল, তাহার গৃহাদি নির্ম্মাণ ও সর্ব্ব প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য ও যত্ন করিতেন। পরিদর্শকগণ (ইনস্পেক্টর) বিদ্যালয় দর্শন করিতে আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহার বাড়ী, বিষয় কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে একজন ক্ষমতাশালী লোক বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিতেন। পাটীগণিতের কঠিন কঠিন অঙ্ক সকল তাঁহার নিকট উত্থাপন করিলে তিনি তাহার উত্তর দান করিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক আশ্চর্য্য বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইতেন।

ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকের মধ্যে তিনি একজন প্রধান লোক ছিলেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীদিগের কলিকাতার বড় বাজারে চিনির কারবার ছিল। পূর্ব্বদেশে চিনি খরিদ করিবার জন্য কলিকাতার বড়বাজার হইতে খাঁটুরা গোবরডাঙ্গায় টাকা প্রেরিত হইত।

এক দিবস আশি, নব্বইটী তোড়া অর্থাৎ আশি নব্বই হাজার টাকা এক একটী থলের মধ্যে বদ্ধ। আশি নব্বই জন মুটে প্রত্যেকে এক একটী কাঁদে লইয়া তাহার উপর গামছা আচ্ছাদন দিয়া বারাশতের আদালতের সন্নিহিত যশোহর রোড দিয়া পিপিলিকার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গোবরডাঙ্গা অভিমুখে যাইতেছিল। বারাশতে তখন একটী জিলা ছিল, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর শিসিন ইডেন সাহেব তখন বারাশতের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এরূপ শ্রেণীবদ্ধ লোক দেখিয়া চাপরাশি দ্বারা তাহাদিগকে থামিতে বলিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন তাহারা এক এক হাজার টাকা কাঁধে লইয়া গোবরডাঙ্গায় যাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন এই সকল

টাকা কাহার এবং তোমাদের সঙ্গের রক্ষক (দরওয়ান সকল) কোথায়? তাহারা বলিল, এই সকল টাকা কালীকুমার দত্তের, আমাদের সঙ্গে অন্য লোক নাই।

এত টাকা এরূপ অরক্ষিত ভাবে যাইতেছে দেখিয়া তিনি অবাক হইলেন এবং তাহাদিগকে আটক করিবার ইচ্ছা করিলেন। মুটেরা বলিল সন্ধ্যার মধ্যে সমস্ত টাকা আমাদিগকে পৌছিয়া দিতে হইবে। অল্পক্ষণ বিলম্ব হইলে আমরা পৌছিতে পারিব না। এই কথা শুনিয়া তিনি মুটেদিগকে আর দাঁড়করাইয়া রাখিলেন না। কালীকুমার দত্তের নাম ও বাড়ীর ঠিকানাদি লিখিয়া লইলেন।

কিছুদিন পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মফঃস্বলে বাহির হইয়া গোবরডাঙ্গার নিকটে তাঁবুতে অবস্থিতি কালিন কালীকুমার দত্তের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জানাইয়া পাঠাইলেন! কালীকুমারের ধুতি চাদর ভিন্ন অন্য পরিচ্ছদ পরিধান করা অভ্যাস ছিল না। কষ্টস্বষ্টে সাহেবের সহিত দেখা করিবার উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া এক খান পাল্কী চড়িয়া লোক জন সঙ্গে লইয়া তিনি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন!

সাহেব তাঁহার ব্যবসা বাণিজ্যের—বিষয় কার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, পরে শুদ্ধ মুটে দ্বারা এরূপ ভাবে এত টাকা পাঠানর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কথা সকল ইংরাজীতে সাহেবকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। সাহেব মনে করিয়াছিলেন এরূপ ভাবে যখন এত টাকা আনা হয় তখন তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্য লোক। তিনি বলিলেন স্থানীয় সকল লোক তাঁহাকে কর্ত্তা বলিয়া অত্যন্ত সন্মান করেন, তজ্জন্য যাহার যাহার টাকা তাহাদের প্রত্যেকের নাম না করিয়া আমার নাম করাই রীতি আছে। এই কারণে কেবল আমার নাম করিয়াছে। কলিকাতা হইতে যেরূপ টাকা আসে, গোবরডাঙ্গা হইতে ঐ সকল টাকা ঐরূপে পূর্ব্বদেশে চিনির মোকামে যায়। আমরা ধর্ম্মের উপর নির্ভর ও বিশ্বাস করিয়া কারবার করি। নতুবা আমাদের কারবার চলে না। কালীকুমারের মুখে এই প্রকার কথা সকল শুনিয়া সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

দত্ত পরিবারে অতিথিদাস নামক একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। অতিথি সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। বংশ পরম্পরায় এই বংশে অতিথি সেবা একটী প্রধান কর্ম্মানুষ্ঠান আছে। কালীকুমার নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত এই ব্রত পালন করিতেন। যখন গঙ্গাস্নানের কোন বিশেষ যোগ উপস্থিত হইত, সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হাজার হাজার যাত্রী দত্ত-বাটীতে উপস্থিত হইত। অন্তঃপুর ভিন্ন পূজার বাটী, অতিথি বাটী, প্রতিবাসীগণের বাটী এবং

গ্রামস্থ অনেক লোকের বাটীতে অতিথিগণের অবস্থান ও আহারাদির আয়োজন করা হইত। ভাণ্ডারিগণ চাউল দাল মসলা ইত্যাদি বণ্টন করিত। কালীকুমার নিজে ভৃত্যাদিগকে ও বাটীর অল্প বয়স্ক বালকগণকে সঙ্গে লইয়া ঝুড়ি করিয়া অন্য দ্রব্য ও তরকারি ইত্যাদি নানাস্থানে গিয়া অতিথিদিগকে বণ্টন করিয়া আসিতেন। কখন কখন অতিথিগণের মলমূত্র পর্য্যন্ত তিনি নিজে পরিষ্কার করিয়াছেন।

পুরুষানুক্রমে অতিথি ও দেব-সেবা নির্ব্বাহের নিমিত্ত একটী সাধারণ (এজমালী) ভূসম্পত্তি ছিল, তাহার অর্দ্ধাংশে দুর্গোৎসবাদি ও অতিথি সেবা নির্ব্বাহ হইত। বহু বৎসর হইতে এই কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়াতে ইহা বংশের একটী গৌরবজনক কীর্ত্তি বলিয়া কালীকুমারের বংশধরগণ বিবেচনা করেন। এই কীর্ত্তি যাহাতে চির দিন থাকে, এজন্য তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। শুনা যায় এক শত বৎসরের অধিক কাল হইল চলিতেছে! বিস্তৃত ব্যবসা কার্য্যে যেমন প্রচুর অর্থ লাভ হয়, তেমনিই ক্ষতিও হয়! কালীকুমারের এক পুত্র হরিশচন্দ্র ব্যবসায় অত্যন্ত দক্ষ ও সাহসিক ছিলেন। এক সময়ে তাহার কার্য্যে এত লোকশান হইয়াছিল যে সেই ক্ষতিতে পৈতৃক অনেক স্থানের সম্পত্তিও গিয়াছিল। সে অবস্থায় পৈতৃক-কীর্ত্তি রক্ষা কিম্বা পুনরায় ব্যবসা কার্য্য করিতে কেহ সাহস করে না। হরিশচন্দ্র অতি কষ্টে তাহা রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন, কালীকুমার দত্তের ছেলে হইয়া আমি যদি বংশের কীর্ত্তি রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি কপ্‌নি পরিয়া টুকনি লইয়া কাশী বৃন্দাবনে চলিয়া যাইব। এজন্য তিনি পুনরায় সাহস করিয়া ব্যবসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

সমাধি

কিসের অতৃপ্তি কিসের লাঞ্ছনা—
নাহিক রাগিণী নাহিক মূর্চ্ছনা,
ছাই হয়ে গেছে সকল বাসনা,
পড়ে আছে সুধু সমাধি;
পুর্ণিমার ইন্দু প্রভাতে লুকায়,
বিভোরা চকোরি পথ ভুলে চায়,
আছাড়ি তরঙ্গ বেলায় লুটায়,
স্তব্ধ নেত্রে চাহে জলধী।

নীলাকাশ পারে কি জানি কি কয়
হাসিছে কি কাঁদে বুঝা নাহি যায়,
কবে হল সৃষ্টি কবে বা প্রলয়,
রহস্যের নাই অবধি ;
যবনীকা যবে হবে উত্তোলন,
সব প্রহেলিকা হইবে পূরণ,
মিলে এক হবে বিয়োগ মিলন,
জীবন মরণ উপাধি।

সুকুমারী দেবী

প্রেরিত পত্র

যোগীন বাবু !

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের কুশদহে গোবরডাঙ্গা হাই স্কুল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পত্র ও আপনার সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। স্কুলটী আমাদের সকলেরই আদরের জিনিষ, যাহাতে উহার উন্নতি হয় সে জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। খাটুরা ও ইছাপুর বিদ্যালয় দু'টী, যতটুকু কাজ করিতেছে তাহাও মন্দের ভাল, সে দুটীকেও উন্নত করিতে হইবে।

একটী ছাত্রবাস হইলে খুবই ভাল হয় সত্য, কিন্তু তাহা ব্যয়সাধ্য। গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের সচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ যদি নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে বিদেশী ২।১টী করিয়া বালককে আহারাদি দিয়া বাটীতে রাখেন, তাহা হইলে অল্প দিন মধ্যে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে। গ্রামের অনেক ছোট ছোট বালক, যাহারা উপযুক্ত সঙ্গী অভাবে গোবরডাঙ্গা স্কুলে আসিতে পারে না, তাহারাও এই সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে সহজেই আসিবে। যাঁহারা ছাত্রদিগকে স্থান দিবেন তাঁহাদেরও যথেষ্ট উপকার,—কেননা দুটী খেতে দিয়ে তাঁহারা নিজ নিজ বালকদের একটী সঙ্গী ও গৃহশিক্ষক পাইবেন। ' সুরেশবাবু প্রমুখ ব্যক্তিগণ, স্কুল কমিটীর মেম্বরগণ ও স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া চেষ্টা করিলে ভাল হয়। আপাতত মনে হয় ছাত্রাবাস অপেক্ষা ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ইহা একটি সহজ উপায়। স্কুলটী যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি,—আশা করি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার মহাশয় তাঁহার ভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্কুলটীকে রক্ষা করিবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (সাব্ ইঃ স্কুলস)

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

এবার গোবরডাঙ্গা হাই স্কুল হইতে একটিও ছাত্র পরীক্ষার্থে উপস্থিত হয় নাই। গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্রের পুত্র শ্রীমান্ সৌরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র কলিকাতা এথেনিয়া ইনিষ্টিটিউট হইতে ম্যাট্রিকুলেসান পরীক্ষায়, ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় লিখিয়াছেন,—চারঘাটের সন্নিকট খাসপুর নিবাসী শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ রায়, আই এ, ১ম বিভাগে রিপণ কলেজ, ও শ্রীমান্ ক্ষিতিশচন্দ্র পাল, আই-এস-সি, ১ম বিভাগে, স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

চাঁদুড়িয়ার অন্তর্গত সুলতানপুর নিবাসী,—স্বাধীন-ত্রিপুরা প্রবাসী শ্রীযুক্ত ডাক্তার কাজি আবদুল গফ্ফার সাহেবের কন্যা কুমারী সোফিয়া কাজি বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কুশদহ-বাসি মুসলমান বালিকা বি-এ, পাশ ইনি প্রথম করিলেন।

মাটকোমরা নিবাসী পরলোকগত শ্যামাচরণ ঘটকের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় 'বেঙ্গল এ্যাম্বুলেন্স কোর' অর্থাৎ আহত সৈন্যদিগের সেবার্থে গমন করিয়াছেন।

গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য,—

কুশদহর চাঁদা বার্ষিক ১৲ এক টাকা মাত্র। ইহা যে অত্যন্ত সুলভ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুলভ মূল্যে সাধারণের নিকট কুশদহ প্রচার করিতে হইলে স্থানীয় গ্রাহকগণের বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন। "আগামী ১৩২২ সালের কুশদহ" সম্বন্ধে গত চৈত্র সংখ্যায় যে বিজ্ঞাপন (শ্লীপ) দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে স্থানীয় গ্রাহকগণের নিকট সে বিষয় প্রার্থনা ছিল ; কিন্তু প্রার্থনা মাত্রেই যে আশানুরূপ সকলের নিকট সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহা সম্ভবপর নয়। এ জন্য ৩০ জ্যৈষ্ঠর পর মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ ছিল। কিন্তু নানা কারণে এখন মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না। তবে যে সংখ্যায় প্রবন্ধের সংখ্যাধিক্য সত্বেও দীর্ঘতার অভাবে কিছু পৃষ্ঠা কম হইবে, সেই সেই সংখ্যার এক আধ ফর্ম্মা কম থাকিবে। ত্রিবর্ণের ছবির কথা কেবল বৈশাখ সংখ্যায় উল্লেখ ছিল কিন্তু আরো কোন কোন সংখ্যায়ও রঙ্গিন ছবি থাকিবে। ফলতঃ বিশেষ ব্যয় সংক্ষেপ জন্য যে এরূপ ফর্ম্মা কম করা হইল, তাহা নহে।

কুশদহ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ড-সম্পাদিত

সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩২২ সাল

সূচীপত্র

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

কার্য্যালয়—২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৴১০ ছয় পয়সা



পরলোকগত দ্বিজরাজ দত্ত

(মৃতদেহের ফোটো হইতে)

মৃত্যু ১১ই আষাঢ়, ১৩২২।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"তোমারি নামে ফুটেছে ফুল,
গন্ধে প্রাণ করেছে আকুল,
যতনে গাঁথিয়া এনেছি মালা
আদর ক'রে একবার পরনা।"

সপ্তম বর্ষ, | শ্রাবণ, ১৩২২ | চতুর্থ সংখ্যা

গান

কেদারা—কাওয়ালি

ডাকে বার বার ডাকে
শোনরে দুয়ারে দুয়ারে আঁধারে আলোকে।
কত সুখ দুঃখ শোকে কত মরণে জীবন-লোকে,
ডাকে বজ্র ভয়ঙ্কর রবে,
সুধা-সঙ্গীতে ডাকে দ্যুলোকে ভূলোকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেহাগ—কাওয়ালি

তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে,
জীর্ণ ভবনে শূন্য জীবনে
হৃদয় শুকাইল প্রেমবিহনে।
গহন আঁধার কবে পুলকে পূর্ণ হবে
ওহে আনন্দময় তোমার বীণা-রবে,
পশিবে পরাণে তব সুগন্ধ বসন্ত-পবনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বাস না নাস্তিকতা

যাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলেন, "ঈশ্বর নাই" তাহাদিগকেই নাস্তিক বলে। তাঁহাদের সংখ্যা পৃথিবীতে পূর্ব্বে যত ছিল এখন তত নাই। যাঁহারা বলেন, "ঈশ্বর থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে জানা যায় না ;" তাঁহাদিগকে সন্দেহ-বাদী বলে। আর এক শ্রেণী আছেন, তাঁহারা বলেন, "ঈশ্বর আছেন—জগতে এক শক্তি অনুভূত হয়, কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃতরূপে কেহ জানিতে পারে না, তিনি মানব-বুদ্ধির অতীত।" এই শ্রেণীকে অজ্ঞেয়-বাদী বলে। এই সকল শ্রেণী কিন্তু নীতি-বাদী ! ইঁহারা মানবের প্রতি কর্ত্তব্য—জগতের হিতসাধন স্বীকার করেন। অজ্ঞেয়-বাদী (John Stuart Mill) জন ষ্টুয়ার্ট মিল পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। ভারতবর্ষে চার্ব্বাক ও নৈয়ায়িক ব্যতীত নাস্তিক বা অজ্ঞেয়-বাদীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

এই তো গেল বাহিরের কথা। এখন সূক্ষ্মভাবে নাস্তিক এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসীর বিচার করিয়া দেখিলে কি দেখিতে পাওয়া যায় ? আমি মুখে 'ঈশ্বর আছেন' স্বীকার করি, কিন্তু কার্য্যত যদি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধের কোনও লক্ষণ আমাতে না থাকে, তবে আমিও নাস্তিক-শ্রেণীতে পরিগণিত হইব না কেন ? 'ঈশ্বর আছেন' মুখে স্বীকার করা, আর ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করা এই উভয় কি এক ? কখনই না। যিনি প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তাঁহার তদনুযায়ী জীবন নিশ্চয়ই হইবে। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর জীবন স্থির, শান্ত, ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু,ক্ষমাশীল,জনসমাজের হিতকামী ; অবিশ্বাসীর জীবন তাহার বিপরীত—চঞ্চল, ক্রোধী, অধীর, অসহিষ্ণু, প্রতিহিংসাপরায়ণ, স্বার্থপর।

আমি কোনরূপ বিদ্বেষ-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া একথা বলিতেছি না। বর্ত্তমান মানবসমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসী অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত প্রকার নাস্তিকের সংখ্যা কত অধিক ! কেবল মুখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অবিশ্বাসীর ন্যায় (চঞ্চল, ক্রোধী, অধীর, অসহিষ্ণু, প্রতিহিংসাপরায়ণ, স্বার্থপর, নীতিহীন) যে জীবন, তাহাকে কি নাস্তিক বলিব না ? যিনি প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী তিনি নিশ্চয়ই নীতি-ধর্ম্মপরায়ণ।

বিষয়টি আরো পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে আর একটি কথা অগ্রে

বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। জগতে যে এত সহস্র সহস্র লোকের জীবন অবিশ্বাসী নাস্তিকের ন্যায় দেখা যায়, তাহার কারণ কি? অবশ্যই সকল বিষয়েরই একটি মূল কারণ আছে। অতএব অবিশ্বাসের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অজ্ঞানতাই অবিশ্বাসের মূল কারণ। অবশ্য এখানে অধ্যাত্মতত্ত্বকেই জ্ঞান বলিতেছি। পরিবারে এবং সমাজে বাল্যকাল হইতেই যদি নীতি এবং ধর্ম্মশিক্ষার প্রণালী না থাকে তবে অবিশ্বাস অজ্ঞানতার স্রোত ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবেই। কথাটা একটু কঠোর হইলেও অত্যন্ত সত্যকথা এই যে, বর্ত্তমান জনসমাজে জ্ঞান আলোচনার ব্যবস্থা আদৌ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আরো দিন দিন যাইতেছে। প্রথম হইতে অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় মানুষ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িতেছে। ইস্কুল-কলেজে বিদ্যাশিক্ষার প্রসার কত বৃদ্ধি হইয়াছে, আরো হইবে। কিন্তু জ্ঞানলাভ করা ইহার উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র অর্থের জন্যই এত ক্লেশ ও অর্থব্যয় করিতেছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া যে কাজ আরম্ভ করা যায়, তাহা যদি সফল হয় তবে তাহার উদ্দেশ্য সেই বস্তুই হয়, অন্য বস্তু হয় না। এক বীজ রোপণ করিয়া অন্য ফলের আশা কেহ করিতে পারে না। যদি অন্ন-বস্ত্রই সমগ্র মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার মূলেই অজ্ঞানতা ও অবিশ্বাস। জীবনদাতা জীবসৃষ্টির সঙ্গেই তাহার জীবিকা প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা জানিয়া আশ্বস্ত হওয়া বিশ্বাসীর লক্ষণ; এই বিশ্বাসে বিশ্বাসীহৃদয় শান্ত, স্থির। কিন্তু চাঞ্চল্যই অবিশ্বাসীর লক্ষণ। পিতা মাতার অবিশ্বাস সন্তানে সংক্রামিত হইতেছে। এখন বংশপরম্পরায় অবিশ্বাসের স্রোত চলিয়াছে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে;—দেশ এখন দরিদ্র, দরিদ্রের 'অন্ন-চিন্তা চমৎকারা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সে কখন্ জ্ঞানালোচনা করিবে? উদর জ্বলিতেছে তাহাতেই তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিতেছে, ইত্যাদি। আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি যাঁহাদের অন্ন-চিন্তা নাই, তাঁহারা তো জ্ঞানালোচনা করিতে পারেন? এই বঙ্গদেশে সহস্র সহস্র অন্ন-চিন্তা-বিহীন অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারী বা ভাণ্ডারী-পুত্র আছেন, তাহার মধ্যে কয় জন জ্ঞান-চর্চ্চা করেন, কয় জন জ্ঞানী পুরুষ আছেন? তাঁহারা যে অর্থবলে অন্ন-চিন্তা হইতে অবকাশ পাইয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি-চিন্তা অথবা তাহার ক্ষয়কর চিন্তাতে ব্যাপৃত আছেন, জ্ঞানধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতে তাঁহাদের অবকাশ হয় কই?

আসল কথা সমাজের স্রোত অন্য প্রকার চলিয়াছে। দিন দিন নীতি-

ধর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মভাব অত্যন্ত কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই স্রোত যদি দিন দিন বাড়িয়াই চলে তবে সমাজের কি অবস্থা হইবে তাহা কি চিন্তার বিষয় নয়?

পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে যেপ্রকার ঈশ্বর-বিশ্বাস ছিল, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহা এক প্রকার চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার স্থলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্মত উচ্চ বিশ্বাস অধিকাংশের মধ্যেই স্থান পাইতেছে না, সুতরাং সমাজের জীবন-স্রোত মুখে 'ঈশ্বর আছেন' স্বীকার করিলেও কার্য্যত নাস্তিকের ন্যায় চলিয়াছে।

মুখে ঈশ্বর আছেন স্বীকার করিয়া ঈশ্বর-বিশ্বাস-বিহীন জীবন যাপন করা যে মানুষের পক্ষে কতদূর দোষাবহ তাহা কি আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে? যাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধর্ম্মপরায়ণ—জনসমাজের মঙ্গলার্থী, তাঁহারা বিশ্বাসী-জীবনের শান্তি-বার্ত্তা প্রচার করিয়া সংসারের অবিশ্বাস অশান্তি-স্রোত বিন্দু পরিমাণেও লাঘব করিতে চেষ্টা করুন।

সুচিকিৎসক

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলেন—

"তত্ত্বাধিগতো শাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ংকৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সজ্জোহপস্করঃ ভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী প্রিয়ম্বদঃ।
সত্যধর্ম্মপরোযশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে॥"

যিনি শাস্ত্রার্থ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, অভিজ্ঞ চিকিৎসককৃত চিকিৎসা অনেক দেখিয়াছেন এবং নিজেও চিকিৎসা করিয়া তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; যিনি লঘুহস্ত, শুচি, বলিষ্ঠ, নবপ্রস্তুত ভেষজসম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি, ধীমান্, ব্যবসায়ী, মিষ্টভাষী, সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক, তিনিই প্রকৃত সুচিকিৎসক। আজকাল পাশকরা ডাক্তারদিগকেই আমরা সুচিকিৎসক বলিয়া থাকি। আর যে সকল ব্যক্তি ঘরে বসিয়া দুই পাতা ডাক্তারি বই পড়িয়া ব্যবসায়ী হইয়াছেন, চলিত কথায় তাহাদিগকে "হাতুড়ে" বলা হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে এই সকল "হাতুড়ের" একাধিপত্য। তথায় ম্যালেরিয়া, আমাশা, কলেরা প্রভৃতি যমকিঙ্করগণ শিবির সংস্থাপিত করিয়া পল্লীবাসীর জীবন দেহপিঞ্জর হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য অবিশ্রান্ত টানাটানি করিতেছে। অথচ

সুচিকিৎসকের অভাবে তাহারা সময়ে এক বিন্দু ঔষধ পায় না। এই বঙ্গদেশে এমন অনেক পল্লীগ্রাম আছে, যাহার অন্তত পাঁচ ক্রোশের মধ্যে একজন সুচিকিৎসক মিলে কি না সন্দেহ। গ্রামে যে দুই একটি করিয়া ডাক্তার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ এক বৎসর, কেহ বা দুই বৎসর কোন ডাক্তারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মা সরস্বতীর সহিত সম্বন্ধও ছাড়িয়াছেন। তাঁহাদের একমাত্র সম্বল নামের পূর্ব্বে "ডাক্তার" এই কয়টি অক্ষর মাত্র। আবার কাহারো কাহারো ডাক্তারি বিদ্যালয় দর্শনলাভও ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি হয় ত ঘরে বসিয়া ডাক্তার দুর্গাদাস করের "ভৈষজ্য রত্নাবলী" পাঠ করিয়াই কৃতবিদ্য হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। আমি এই স্থানে কোন পল্লীগ্রামের একটি ভূঁইফোড় ডাক্তারের পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই ব্যক্তি আমার পরিচিত। ইনি কয়েক দিন বঙ্গভাষায় লিখিত দুই একখানি ডাক্তারি পুস্তক পড়িয়াই মনে করিলেন—ডাক্তারি বিদ্যা করায়ত্ত করিয়াছি। ব্যবসায় করিবেন বলিয়া ঔষধ খরিদের জন্য এই ডাক্তার বাবুটি আমার ডিস্‌পেন্সারীতে আসিয়া যেভাবে ঔষধের ফর্দ্দ দাখিল করিয়াছিলেন, তাহা মনে উঠিলে আজও হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। তিনি ফর্দ্দে লিখিয়াছেন—

বাইঃ ইপেকা অর্দ্ধ পোয়া; টিং নক্সভূমিকা এক পোয়া; হাউড মার্কা কুইনাইন এক শিশি; সল্‌ট্‌ পাঁচ সের, ইত্যাদি।

আর একবার বঙ্গভাষায় লিখিত একখানি ব্যবস্থাপত্র দেখিয়াছিলাম। সেখানিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ ব্যবস্থাপত্রে ডাক্তার-পুঙ্গবটি জলের পরিবর্ত্তে তৎস্থানে "কোয়াসিয়া উড্‌ ৪ আউন্স" লিখিয়াছিলেন।

এই ত গেল পাড়াগেঁয়ে চিকিৎসকের অবস্থা। ইহারা "সবজান্তা"। কোন রোগই ইহাদের নিকট অপরিচিত নহে। তোমার যদি টাইফয়েড্‌ জ্বর হইয়া থাকে, ইহারা অমনি পুস্তকের লিখিত "বাঁধাগৎ" এক ফিবারমিক্‌চার লিখিয়া বসিবেন। রোগী হস্তান্তরিত হইবার ভয়ে ইহারা না বুঝিয়াও কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর শয্যাকণ্টক বৃদ্ধি করেন। ইহাদের আর একটি গুণ এই যে, ইহারা মরিয়া গেলেও অপর চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করেন না। অপর চিকিৎসক ডাকিবার কথা শুনিলেই এই সকল ধর্ম্মময় পুরুষ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া রোগীর গৃহ পরিত্যাগ করেন। হায় রে কপাল! যে ধর্ম্মপ্রবণ দেশে বৈদ্যের গুণ স্মরণ করিয়া "বৈদ্যো নারায়ণঃ

স্বয়ম্”—বলা হইয়াছে, আজ সে দেশের এই দুর্দ্দশা! ব্যথিত হৃদয় শান্ত করা, উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করা, মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করা ও তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করা, যাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম—গুরুতর যাঁহাদের জীবনের ব্রত তাঁহাদের এই অবস্থা! মানুষ কখন কি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে? সমস্ত বিষয় জানিয়া বসিয়া আছি এরূপ অহঙ্কার কি মানুষ করিতে পারে? একদা দেশপ্রসিদ্ধ ধাত্রী-বিদ্যা-বিশারদ ডাক্তার চার্লস্ একস্থানে গর্ভস্থ শিশু হত্যা করিয়া প্রসবকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে বুঝিয়া গৃহস্থকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—“আমি অপর এক জন চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করি।” এই কথা শুনিয়া বাড়ীর লোক বলিল—“ডাক্তার চার্লস্ আবার কাহার পরামর্শ লইবেন?” তদুত্তরে মহাত্মা চার্লস বলিলেন—“প্রাণীহত্যা অতি গুরুতর কার্য্য; সুযোগ থাকিতে অপরের পরামর্শ না লইয়া আমি কখনই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না।” হায়! এ দেশের কয়জন চিকিৎসক ডাক্তার চার্লসের এই অমূল্য বাণী স্মরণ করিয়া থাকেন?

পল্লীগ্রামে আর এক জাতীয় চিকিৎসক আছেন;—যথা, নাপিতবৈদ্য, মালবৈদ্য, ইত্যাদি। এই সকল লোক সদাই পল্লীবাসীর ধনপ্রাণ হরণে ব্যতিব্যস্ত।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের জনপ্রিয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় ঢাকা সহরে বলিয়াছিলেন—“ডাক্তারি পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণ ডাক্তারবহুল সহরে না বসিয়া পল্লীগ্রামে বসেন না কেন?” তিনি বলিয়াছেন—বিলাতে পাশকরা ডাক্তারের মধ্যে অনেকেই পল্লীগ্রামে বসিয়া ডাক্তারি করেন। অবশ্য এ কথার উত্তরে অনেকেই হয় ত বলিবেন, “পল্লীবাসী সকলেই দরিদ্র। তথায় পাশকরা ডাক্তার বসিলে তাহার চলিবে কেন? উপযুক্ত ভিজিট্ বা ঔষধের দাম না দিলে ভাল ডাক্তার কি খাইয়া চিকিৎসা করিবে?” ইহা সত্য বটে। তবে আমার বক্তব্য, ক্যাম্বেল বা ঐরূপ কোন ডাক্তারি স্কুলের পাশকরা ডাক্তারগণ মেডিকেল কলেজের উত্তীর্ণ ডাক্তারগণের ন্যায় সহরের দিকে না ছুটিয়া পল্লীগ্রামে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিলে ভাল হয়। সহরে ডাক্তারের ত অভাব নাই। তথায় সকলেই কিছু মাসে হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন না। সকলে মিলিয়া তথায় ভিড় না করিয়া কতক কতক পল্লীগ্রামে আসিলে পল্লীবাসীরও উপকার হয়, নিজেরও অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে দুই পয়সা উপার্জ্জন হইতে পারে।

সুচিকিৎসক পাইলে—চিকিৎসকের দক্ষতা দেখিলে—পল্লীবাসী অর্থ দিবে

না কেন? তাহারা পেটে না খাইয়াও ডাক্তারের টাকা দিবে। দেশপ্রসিদ্ধ, "ধাত্রীশিক্ষা" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা, ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চিকিৎসকগণ জীবনের অনেক সময় পল্লীগ্রামে থাকিয়াই ত ধন ও যশোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তবে যাঁহার লোভ অত্যধিক তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের শাস্ত্রে আছে—"নৈব কুর্বীত লোভেন চিকিৎসা পুণ্যবিক্রয়ং।" লোভবশত কখনও চিকিৎসার পুণ্য বিক্রয় করিয়ো না। যদি একমাত্র অর্থই তোমার লক্ষ্য হয়, তবে চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। মনে রাখিয়ো—চিকিৎসা-ব্যবসায় দ্বারা অনেক সময় মনের মত অর্থলাভ না হইলেও ইহা কখন নিষ্ফল হয় না।

"ক্বচিদর্থঃ ক্বচিন্মৈত্রী ক্বচিদ্ধর্ম্মঃ ক্বচিদ্ যশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ ক্বচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা॥"

চিকিৎসা দ্বারা কোন স্থানে অর্থ, কোন স্থানে বন্ধুত্ব, কোন স্থানে ধর্ম্ম, কোন স্থানে যশ এবং কোথায় বা কর্ম্মাভ্যাস লাভ হইয়া থাকে। পাড়াগাঁয়ে সুচিকিৎসকের বড়ই অভাব। রোগের শান্তি করিতে পারিলে, রোগীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে, কোন স্থানেই চিকিৎসকের একান্ত অর্থাভাব ঘটে না। এই বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে তের লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অর্দ্ধাংশের প্রাণহন্তা বোধ হয় "হাতুড়িয়া" চিকিৎসক। হে চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার্থিগণ! তোমরা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বিলাস-বাসনায় সকলেই সহরের দিকে ছুটিয়ো না; 'হা চাকুরি-যো চাকুরি' করিয়া বেড়াইবারও কোন আবশ্যক নাই; পল্লীগ্রামে এখন চিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। তথায় আসিয়া "হাতুড়িয়া" রূপ যমদূতগণের অত্যাচার হইতে পল্লীবাসীর প্রাণ রক্ষা কর; ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বিধবা

সুরবালার পিতা উমেশচন্দ্র কৌলীন্যের দোহাই দিয়া সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্র সুরেশকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার পিতৃত্বের দাবীতে ধন-সম্পৎশালী বিলাসী যুবক নলিনের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

সুরবালা যদিও বালিকা তথাপি সে যে একেবারে কিছু না বুঝিল এমন নহে।

কিন্তু সে ভাবিল এ বিবাহ তাহার পক্ষে ভালই হইয়াছে—ইহাতে তাহার পিতা সুখী হইয়াছেন এবং তাহার বংশ-গৌরব রক্ষা পাইয়াছে সুরেশ বাল্যকাল হইতেই তাহার খেলার সাথী, সুরেশকে তো সে বরাবরই একরূপ ভালবাসিতে পারিবে, তবে আর তাহার দুঃখ কিসের ? সুরবালাকে এই বিবাহে সন্তুষ্ট দেখিয়া তাহার পিতা সুখী হইলেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে ভালবাসার প্রকার-ভেদ হয় বালিকা তখন তাহা বুঝিতে পারে নাই। যে জিনিষ লোকে রোজ পায় সে জিনিষের মূল্য তাহারা প্রথমত ঠিক করিতে পারে না। পরে অভাবে তাহার মূল্য এবং তাহা পাইবার আগ্রহ বাড়িয়া যায়। প্রেমে যখন হৃদয় পূর্ণ থাকে তখন মানুষ মনে করে যে, সে সব করিতে পারে, সে তখন নিরবচ্ছিন্ন প্রেমদানে সমস্ত সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। উহার যে একটা সীমা আছে এবং উহা যে সঙ্কীর্ণ, এ ধারণা তখন তাহার মনে স্থান পায় না। বাণের জলে ভাটার টান আরম্ভ হইলে যে শম্বুকশৈবালপূর্ণ পঙ্কিল বেলাভূমি বিস্তৃত বারিরাশির সৌন্দর্য্য-তৃপ্ত-নয়নে এক বিরক্তিপ্রদ অবসাদ আনিয়া দেয় তাহা সে তখন ভুলিয়া যায়।

সুরেশের সহিত তাহার যে ঠিক কি সম্বন্ধ তাহা সুরবালা তখন বুঝিতে পারে নাই—সে যে তাহার কতদূর আপনার তাহাও সে তখন ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই—এখন সে দেখিল যে সুরেশের সহিত আগের মত মেশা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়, দিনের মধ্যে অন্তত একবার যাহাকে না দেখিলে তাহার কিছুই ভাল লাগে না সেই সুরেশ আর এখন তাহার সহিত বিনা কারণে অথবা অল্প কারণে প্রায়ই দেখা করে না; সে মনে মনে প্রমাদ গণিল। নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজের অবিমৃষ্যকারিতা এবং অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। উমেশচন্দ্রও ইহার কতক বুঝিলেন। তিনি বালিকার ধর্ম্মজ্ঞান ও মনের বলের উপর নির্ভর করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন—আর উপায় কি ?

সুরবালা প্রাণপণে তাহার ভুল সংশোধনে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, "ভগবান, স্বামীর প্রতি যেন অবিশ্বাসিনী না হই। হৃদয়ে যেন বল পাই—সুরেশকে যেন ভুলিতে পারি।" বালিকা প্রাণপণে তাহার স্বামীকে আঁকড়াইয়া ধরিল। সর্ব্বদা তাহার কাছে কাছে থাকিয়া, তাহার সেবা করিয়া সংসারের কাজে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া সে সুরেশকে ভুলিতে চেষ্টা করিল।

বালিকা সুরবালার লজ্জানম্র-স্নিগ্ধমধুর ব্যবহার এবং অকপট সেবা, ঐশ্বর্য্যাভিমান-মত্ত নভেলি-প্রেমিক ক্ষুদ্র সাহেব নলিন বাবুর মনঃপূত হইল না। তিনি প্রথম হইতেই সুরবালার উপর চটিয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন তাহার মত পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন-প্রেমিকের এই বালিকাকে বিবাহ করা নিতান্ত ভুল হইয়াছে। ক্রমে যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে সুরেশের সহিত সুরবালার শৈশব হইতেই প্রণয় ছিল এবং সুরেশের সহিত বিবাহ হইলে সুরবালা সুখী ভিন্ন দুঃখী হইত না, তখন তাহার এই বিবাহে তিনি সুরবালার এবং উমেশচন্দ্রের এক ঘৃণিত নিকৃষ্ট চক্রান্ত দেখিতে পাইলেন।

এই অপূর্ব্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই নলিনের ক্রোধের মাত্রা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল। সুরবালার প্রতি তাহার ব্যবহার নিতান্ত কঠোর হইয়া উঠিল। সুরবালা কিছুই লক্ষ্য করিল না। সে অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীর সেবা করিয়া তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার একমাত্র প্রার্থনা "স্বামীকে যেন সমস্ত প্রাণমন দিয়া ভালবাসিতে পারি।"

সুরবালা যতই আগ্রহভরে তাহার স্বামীকে বেষ্টন করিতে লাগিল, নলিন ততই কঠোরতার সহিত তাহার ভালবাসা ছল এবং সেবা কপট ভাবিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিল।

ব্যাপার ক্রমে ঘনাইয়া উঠিল। একদিন যখন সুরবালা অনেক রাত্রে শুইতে আসিল, তখন তাহার চক্ষে জল দেখিয়া নলিন বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কিহে আজ যে বড্ড দেরি? রোজ যে ডেকেও তোমার সাড়া পাইনে। আজ বুঝি সুরেশকে মনে পড়েছে তাই কাঁদতে-কাটতে দেরি হয়ে গেছে?"

সুরবালা। তুমি ওরূপ নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ কোরো না।

নলিন। ব্যঙ্গ নয় সুরবালা, এ অতি কঠোর সত্য।

লজ্জায় ও ঘৃণায় সুরবালার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অন্তরাগ্নির তীব্র উত্তাপে তাহার নয়নের জল শুকাইয়া গেল। সে অতিকষ্টে বলিল, "যাতে তোমার মনের মত হয়ে তোমাকে সুখী করতে এবং নিজেও সুখী হ'তে পারি আমাকে তাই শিখিয়ে দাও। তুমি তো সকলই জানো; আমি বড় দুর্ভাগিনী।"

নলিন। সে তো ঠিক। আমার স্ত্রী বড়ই অভাগিনী! যদি এইরূপই তোমার ধারণা তবে এরূপ ঘৃণিত ছলনা না করে প্রকাশ্যে সুরেশকেই ভালবাস, তা হলেই সুখী হ'তে পারবে।

এই উত্তরে তাহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপে, তাহার আত্মমর্য্যাদা জাগিয়া

উঠিল। তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সে কাঁদিল, "ভুলতে তো কত চেষ্টাই করচি। বাল্যপ্রণয়ের গভীর স্মৃতি যদি সত্বর লুপ্ত করতে না-ই পারি, কি করব? তুমিই তো বারবার তার কথা তুলে তার স্মৃতি ফিরিয়ে আনো। হৃদয়ের সহিত যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হই; শান্তির আশায়, সান্ত্বনার আশায় তোমার কাছে আসি, তুমি আরো জ্বালা বাড়িয়ে দিয়ে সরে যাও।"

নলিন। তোমার উপযুক্ত কথাই বটে। ভুলতে পারবে কেন? আর তাকে ভুলবার দরকারই বা কি? আমাকে ভুলে যাও। মনে মনে যদি তাকেই ভালবাস তবে আর এখানে তোমার প্রয়োজন কি? যাও তার কাছে চলে যাও।

"প্রিয়তম, ভুল বুঝে আমাকে শাস্তি দিয়ো না" এই বলিয়া সুরবালা নলিনের দিকে অগ্রসর হইল। নলিন শয্যা হইতে উঠিয়া "তোমার শয্যা, তোমার সংস্পর্শ এবং তোমার ভালবাসা সমস্তই কুলটার কলুষকালিমাঙ্কিত" এই বলিয়া বেগে বাহির হইয়া গেল।

সুরবালা অসহায় শিশুর ন্যায় কতক্ষণ রোদনের পর যুক্তকরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, "প্রভু, স্বামীর প্রতি যেন ভক্তি বিশ্বাস না হারাই। দয়াময়, দয়া কর, আমার হৃদয়ে বল দাও। আমার হৃদয়কে সঙ্কল্প-দৃঢ় এবং মনকে সবল করিতে শিখাইয়া দাও। সুরেশকে যেন ভুলিতে পারি।"

ইহার পর নলিন অতি নিষ্ঠুরের মত আচরণ করিল। সে সুরবালা, উমেশচন্দ্র এবং আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সকলকে উপেক্ষা করিয়া অকালে সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। এই আকস্মিক বিপৎপাতে উমেশচন্দ্রের বুদ্ধি লোপ পাইল—সুরবালা চারিদিক অন্ধকার দেখিল। এতদিন তবু তাহার একটা উপায় অবলম্বন ছিল। কঠোর হউক, কঠিন হউক, তবু তাহার ভক্তি-ভালবাসার, সুখ-দুঃখের অবলম্বন তাহার স্বামী ছিল। এখন সে কেমন করিয়া একাকিনী তাহার হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে? কেমন করিয়া সে সুরেশকে ভুলিবে? এখন যেন সুরেশের স্মৃতি আরো নিবিড়ভাবে তাহাকে বেষ্টন করিতে লাগিল। এখন সে কাহার কাছে যাইবে, কিসের দ্বারা সে তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিবে?

২

মানসিক দুশ্চিন্তায় সুরবালার সোনার শরীর কালী হইতে লাগিল। বিকশিত নারীত্বের ক্ষুধার্ত্ত বাসনা তাহার মর্ম্মস্থল চর্ব্বণ করিয়া নিষ্পেষিত করিল।

সুরবালা প্রাণপণে আত্মসংযমে প্রবৃত্ত হইল। তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল।

নানারূপ চিকিৎসায়ও যখন কোনো ফল দেখা গেল না তখন চিকিৎসকের পরামর্শ-অনুসারে উমেশচন্দ্র সুরবালাকে লইয়া স্থানান্তরে যাওয়াই স্থির করিলেন।

হৃদয় জিনিষটা যে ঠিক কলমের গাছ নহে এবং উহা যে কলমের মত ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হয় না এবং স্থানান্তরিত করিবার সময় প্রাণ-রসাভাবে শুষ্ক হইয়া যায় তাহা তিনি বুঝিলেন কিনা জানি না।

উমেশচন্দ্র সুরবালাকে লইয়া কাশীতে আসিলেন। তিনি ভাবিলেন কাশীর পবিত্র গঙ্গাস্নানে,বিশ্বেশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে, নানাদেশীয় জনগণের ধর্ম্মপ্রাণতায় সুরবালার তৃষিত চিত্ত শান্ত এবং পীড়িত স্বাস্থ্য উন্নতিলাভ করিবে।

গঙ্গাস্নানে এবং বিশ্বেশ্বর দর্শনে সুরবালা কিছুদিন যেন একটু অন্যমনস্কা হইল। তাহার শরীরও যেন কিঞ্চিৎ উন্নতিলাভ করিল। কিন্তু নূতনত্বের মহিমা অপনোদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পুরাতন চিন্তা পুনরায় তাহাকে অধিকার করিল। সে প্রাণপণে তাহার মনকে বাঁধিতে চেষ্টা করিল। সে বিশ্বেশ্বরের নিকট অবিরত প্রার্থনা করিতে লাগিল, "ভগবান্, তুমি তো সকলই জান আমি বড় অভাগিনী। আমার হৃদয়ে বল দাও। চিন্তার কবল হইতে আমায় মুক্ত কর। প্রবৃত্তির সংগ্রামে আমায় বিজয় দাও। একমাত্র পতির স্মৃতি-পূজা করিতে শিখাইয়া দাও। সুরেশকে ভুলিতে ক্ষমতা দাও।"

অবিরত এইরূপ ঘোর সংগ্রামে তাহার সমস্ত শক্তি লুপ্ত হইতে চলিল। তাহার সমস্ত স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। দীর্ণহৃদয়ে অবসন্ন হইয়া শুধু তাহাকে ফিরিতে হইল। সুরেশকে তাহার ভোলা হইল না।

সুরবালার মন হইতে সুরেশের চিন্তা কিছুতেই গেল না, দূর গগনের প্রান্তচারী মেঘের মত এ চিন্তা প্রায়ই তাহার মনে আসিয়া দেখা দিতে লাগিল।

অবশেষে তাহার মনে হইতে লাগিল, "এই অনন্ত সৃজন-সাগরে মানব কত ক্ষুদ্র! ইহাতে তাহার অস্তিত্ব কোথায়! দাও প্রভু, আমার সমস্ত জ্ঞান, আমার সমস্ত শক্তি, আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া দাও;—আমি প্রবৃত্তির পথে ভাসিয়া গিয়া আমার ভবিষ্যতের তীরে উপনীত হই।"

সে আর ভাবিতে পারিল না। কোমলপ্রাণা নারীর যাহা সাধ্য সে তাহা করিয়াছে, এখন হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন তাহার সমস্ত চিন্তা একমুখী হইয়া শুধু সুরেশের কথাই ভাবিতেছে। সুপ্ত মস্তিষ্কে স্বপ্ন-স্মৃতির

মত তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন অস্পষ্টরূপে তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অনেকের প্রকৃতি মর্ম্মর প্রস্তরের মত। বেদনা উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। শুধু উপরিভাগ সিক্ত করিয়া কালক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। সুরবালার প্রকৃতি সেরূপ নহে। বারি যেমন বিন্দু বিন্দু করিয়া স্পঞ্জের ভিতর বসিয়া যায়, বেদনাও সেইরূপ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সুরবালার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে ও উহার দুর্ব্বহ ভারে তাহাকে শ্মশানের দিকে টানিয়া লইতেছে। সুরবালা তাহার কোমল প্রাণ উৎসর্গ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে।

একদিন আরতি দেখিয়া ফিরিবার পথে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে সুরবালা দূর হইতে সুরেশকে দেখিতে পাইল। তাহার জীবনের উপর পরমানন্দের সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর এক স্বপ্নচ্ছায়া ভাসিয়া উঠিল! একে তাহার ভগ্নস্বাস্থ্য তার উপর এই আকস্মিক নৈশদর্শন, তাহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। বাঞ্ছিতকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার ক্ষুব্ধ হৃদয় কৃত্রিম বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার স্মৃতির পাদমূলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সে অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া নীরবে চলিয়া আসিল। আসিতে আসিতে সে শুনিতে পাইল কে যেন তাহার হৃদয়ের করুণ কাহিনী নৈশ আকাশে ধীর বাতাসে সঙ্গীতে ঢালিয়া দিতেছে। সেই সুরে তাহার প্রাণ দগ্ধ করিতে লাগিল। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল—

আমার হৃদয়-দুয়ারে আসিয়ে
অতিথি হইলে যবে,
(আমি) প্রভাতের ঘোরে স্বপন-শয্যায়
ঘুমাইতে ছিনু সবে।
আলো-ঘেরা স্নিগ্ধ প্রভাতের মাঝে
জীবন-কোরক মোর,
অকাল-আহ্বানে উঠিল মুকুলি
না হতে স্বপন ভোর।
চকিতে চাহিয়া হেরিতে তোমায়
পুলকে পূরিল প্রাণ,
সব হিয়া দিয়া লইনু বরিয়া
যা ছিল করিয়া দান।

জানিনা কখন কোন অগোচরে,
করেছিনু কবে দোষ
গুরু করে' কেন দেখিলে তাহায়,
এত দিনো কেন রোষ ?
কতনা বেদনা নীরবে সয়েছি
ভিখারীর বেশে কত আসিয়াছি
কত অনুনয়ে ক্ষমা যাচিয়াছি,
সকল প্রাণের বাসনা মিশায়ে
নয়নের জলে অর্ঘ্য রচিয়ে
চরণে তোমার দিয়াছি।
ক্রূর নীতিবিদ্ কর নাই ক্ষমা
এস নাই জ্বালা জুড়াতে,
(আজি) মরণের কোলে পড়িতেছি ঢলে
শুধু একবার এস দেখিতে।

সঙ্গীতের প্রত্যেক বর্ণ সুরবালার হৃদয় পোড়াইয়া ছারখার করিতে লাগিল। উষ্ণ শোণিত প্রবলবেগে তাহার শিরায় শিরায় বহিতে লাগিল। দ্রুতপদে বাড়ী আসিয়াই সে শয্যায় শয়ন করিল। সুরবালার গম্ভীর বিষণ্ণ মূর্ত্তি দর্শনে উমেশচন্দ্রের মন এক অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রি সুরবালার নিদ্রা হইল না। তাহার বোধ হইতে লাগিল সে এতকাল স্বপ্নে স্বর্গে পরিভ্রমণ করিয়া স্বপ্নভঙ্গে শয্যা হইতে কণ্টকাকীর্ণ এক মহা গহ্বরে পতিত হইয়াছে। তাহার উষ্ণ মস্তিষ্ক আপনার শক্তি অনুযায়ী নানারূপ চিন্তায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সে ভাবিল, "কই এত কাল তো প্রাণপণে হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিলাম, কি ফল পাইলাম ? শুধু দীর্ণ কঙ্কাল মাত্র লইয়া ফিরিয়া আসিলাম, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিতে পারিলাম কই ? ভগবানের চরণে তো যথাসম্ভব একমনে কাতরপ্রাণে হৃদয়ের জ্বালা ঢালিয়া দিলাম, জ্বালা জুড়াইল কই ? এ জ্বালা সত্যই কি ভগবানের দেওয়া ?"

এ চিন্তার সে আর কোনো কূল কিনারা পাইল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে আবার ভাবিতে লাগিল, "আমি বিধবা ? কাহার কথায় ? শুধু নারী বলিয়াই কি আমি এই অত্যাচারপীড়িতা ?' মানুষের উপর মানুষের কি এতই ক্ষমতা ? দুর্ব্বল রমণীর হৃদয়-রক্ত ভিন্ন কি তাহার রাক্ষসী জিঘাংসার নিবৃত্তি

নাই? তাহার কথায় কি একজন প্রাণপণে হৃদয়-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইবে? প্রবৃত্তির তাড়নে হৃদয়ে অহর্নিশ তুষানল পোষণ করিয়া চিরজীবন দগ্ধ হইবে? ইহাই কি ঈশ্বরের অভিপ্রায়? না, ইহা কখনো হইতে পারে না। আমি এতকাল ভুল বুঝিয়াছি।" ভাবিতে ভাবিতে তাহার জ্ঞান লোপ পাইল, তাহার চিন্তা অসংলগ্ন হইল। সে দেখিল যেন,কোন মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের মত তেজস্বিতা, সত্যের মত হৃদয়বল এবং মাতার মত করুণা লইয়া তাহার দুঃখ দুর করিতে আসিয়াছেন! সে দেখিল, কাহার ইঙ্গিতে যেন এক প্রবল ঝঞ্ঝা উত্থিত হইয়া বালবিধবার হৃদয়-রক্ত-সিক্ত, অত্যুৎকট জ্বালা-নিঃসৃত নয়ন-কোণ-নির্গত তাহার প্রাণ-বারি-মিশ্রিত, বহু পিতামাতার নীরব হৃদয়ভেদী হাহাকার-ধ্বনিত সমাজের সমস্ত আবর্জ্জনারাশি উড়াইয়া লইয়া গেল। তাহার অধরে হাস্য স্ফুরিত হইল। সে দেখিল প্রভাত হইয়া গিয়াছে। তাহার স্বপ্নাবিষ্ট চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া সে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার সর্ব্ব শরীরে ভয়ঙ্কর বেদনা বোধ হইল, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে চক্ষু বুজিয়া আবার শুইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত শৈশব-স্মৃতি পূর্ব্ব রাত্রের স্বপ্নের সহিত মিশিয়া চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। একমাত্র কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া দুঃখে উমেশচন্দ্রের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি সত্বর চিকিৎসক ডাকিতে পাঠাইলেন।

রোগী দেখিয়া চিকিৎসকের মুখ বিষণ্ণ হইল। তিনি বলিলেন, "অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণায় তাহার মস্তিষ্ক এখন বিকারগ্রস্ত। যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় অবসন্ন, তাহার সমস্ত জীবনীশক্তি নিঃশেষিতপ্রায়।"

উমেশচন্দ্র আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সুরবালার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। আজ তাহার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন। অনিমেষনয়নে তিনি সুরবালার দিকে চাহিয়া আছেন এবং মাঝে মাঝে বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়-ব্যথা বাতাসে ঢালিয়া দিতেছেন।

সুরবালা মাঝে মাঝে তাহার পিতার দিকে চাহিতেছে এবং দুই হাতে নিজের বুক চাপিয়া অতি কষ্টে কহিতেছে, "ওঃ বড় উত্তাপ! বাবা, আমায় ক্ষমা কোরো। তুমি আমার জন্য অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছ। আমার জন্য তোমার একটি দিনও হাসি ফোটে নাই।" সুরবালা আর বলিতে পারিল না, তাহার জিহ্বা জড়াইয়া আসিতে লাগিল। কাহার অন্বেষণে যেন তাহার উন্মাদ আঁখি ইতস্তত ঘুরিতে লাগিল। উমেশচন্দ্র নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

সুরবালার চিত্ত-সংযমে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া দেখা হইলেও উমেশচন্দ্র এতদিন সুরেশকে তাহাদের বাড়ী আসিতে অনুরোধ করেন নাই; কিন্তু আজ যখন সুরবালা বলিয়াছে যে, এখন আর তাহার কোনো ভয় নাই। সে শুধু সুরেশকে দেশে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিবে। তখন আর তিনি তাহাকে খবর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন পিতা হইয়া কন্যার জন্য কি করিলাম? মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার একটিমাত্র সঙ্গত অনুরোধ তাহাও কি রক্ষা করিব না? আমার এ নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা কাহার জন্য, কিসের জন্য?

৩

সুরেশ আসিয়াছে। উমেশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া এবং সুরবালার কথা শুনিয়া যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। উমেশচন্দ্র তাহাকে সুরবালার ঘরে লইয়া গেলেন। সুরেশ দেখিল, সুরবালা মাঝে মাঝে হাসিতেছে, সে হাসি প্রেতের হাস্যের মত ভয়ানক। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।

সুরবালা চক্ষু মেলিল। সুরেশকে দেখিয়া তাহাকে তাহার পার্শ্বে বসিতে অনুরোধ করিল। কিছুক্ষণের জন্য সুরবালা মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠস্বর বসিয়া যাইতে লাগিল, তবুও সে এক বিজাতীয় বলে বলী হইয়া উঠিল। সুরেশের হাতে হাত দিয়া সে আস্তে আস্তে কহিল, "সুরেশ, নিজের সীমা না বুঝে বড় ভুল করেছি। বড় যন্ত্রণা পেয়েছি, তোমাকেও দিয়েছি, আমায় ক্ষমা কোরো।"

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গাঙ্গুলী।

শুভগ্রহ

প্রথম অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ইডেন-উদ্যানস্থ কানন-পথ। অদূরে লতাবেষ্টিত কুঞ্জ।

কাল, অপরাহ্ন।

যতীশ ও ষষ্ঠীর প্রবেশ

ষষ্ঠী। এ ব্যবস্থা ভালো। কোথায় কার নাম জানি না, ধাম জানি না, অথচ রোদে টো টো করে তার পিছনে ঘুরে বেড়ানো, তার চেয়ে এ ঘরের কোনে বসে

পান চিবুতে চিবুতে নামহীনা ধামহীনা নায়িকার উদ্দেশ্যে কবিতা লেখা—সত্যি বলছি, এর চেয়ে change for the better আর কিছু হতেই পারে না। কবিতা শুনতে আমি খুব রাজী। বকে যাবে ত তুমি, অথচ আমার কানদুটো তার কতখানি গ্রহণ করছে, তা ধরবার-ছোঁবার জো নেই! কি বল?

যতীশ। আমি তোমায় কবিতা শোনাতে আসিনি। তুমি যেচে শুনতে চাইলে, তাই দেখালুম। না হলে এ আমার অন্তরের কথা, নিজের জন্যই আমি লিখে যাই। পাঠকের তোয়াক্কা রাখি না।

ষষ্ঠী। এই কথাটা আমি বিশ্বাস করি না। রাস্কেল, পাঠক যদি না চাইবে ত খাতায় অমন ঝরঝরে করে টুকে রাখবার দরকার কি!

যতীশ। নিজের পাগলামি নিজেই দেখব, নিজের মনে হাসবো-কাঁদবো।

ষষ্ঠী। এত বড় নিষ্কাম ব্যাপার দেখিনি, আমি। আহা, কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্ত মা ফলেষু কদাচন।

যতীশ। এর আবার নিষ্কাম সকাম কি!

ষষ্ঠী। কিছু না! ওহে, আসল মতলব কি আর আমি বুঝতে পারি না! আমাকে এমনই গাধা ঠাওরাও! বাঙলা দেশে বর্ষায় ব্যাঙের ছাতার মত নিত্যি নতুন মাসিক পত্র বেরুচ্ছে, আর ঠিক সেই রকম rateএই নিত্যি নতুন কবির আবির্ভাব! রবিবাবুকে কেটে-ছিরকুটে lyricএর সৃষ্টি হচ্ছে! বাপ্, যেন চড়বড় করে শিলাবৃষ্টি হচ্ছে! বেচারা রবিবাবু! একধারে lyric লিখে কোন মতে দিন গুজরোন কচ্ছিলেন, এখন দেখি মাসিক পত্রের পাতায় পাতায় রবিবাবু! আবার এরাই বেচারাকে সব চেয়ে জোর গলায় গাল দেয়! তার উপর, বাহার এই, রবিবাবুর কবিতাই শুধু কাগজে ছাপা হত, তার সঙ্গে ছবি কেউ ছাপতে পারেনি, কিন্তু এই কবি-অক্ষৌহিণীর দল শুধু কবিতা ছেপেই থেমে যান না, ছবি অবধি তার সঙ্গে ছাপিয়ে ছাড়েন! পাঠকগুলোর পালাবার জো কি! কবিতা না পড়, ছবি তোলার ঢঙ টুকু দেখতে হবেই! তা তুমি এক কাজ কর, ফটোর ব্লক করে কবিতার সঙ্গে গেঁথে মাসিক পত্রের দ্বারে পাঠাও। অবশ্য বেছে পাঠাতে হবে,কেন না, কতকগুলো হিংসুকে কাগজ আছে,সেখানে পাঠিয়ো না! তারা আর কারো লেখা সহ্য করতে পারে না। যেগুলো ওর মধ্যে নিরীহ, উদার, বসুধাকে কুটুম্ব করে নিতে জানে, বেছেগুছে তাদের কাছে পাঠিয়ো।

যতীশ। তোমার বকুনির জ্বালায় কোথাও তিষ্ঠোনো ভার! একবার যদি বকতে সুরু করলে ত একেবারে যেন পাঞ্জাব মেল চালালে! কোথাও আর

দাঁড়ানো নেই ! একেবারে হাবড়া ছেড়ে বর্দ্ধমান—একদম ষাট-সত্তর মাইল ছুটে তবে একটা full stop দেবে !

ষষ্ঠী। আরে ঐ ত রোগ ! ঐ জন্যই ত কোনখানে টেঁকতে পারি না !

যতীশ। সরবারও ত নাম দেখতে পাই না !

ষষ্ঠী। ওটা হ'লগে রোগের দ্বিতীয় লক্ষণ। যারা ছাঁটতে চায়, তাদের আরও সেঁটে ধরি।

যতীশ। থাক্, এখন এইখানে তুমি দাঁড়াবে, না, একটু—

ষষ্ঠী। বেড়াব—নিশ্চয় বেড়াব—। দাও, তোমার কবিতাটা পড়া যাক্।

যতীশ। সে তোমায় পড়তে হবে না—থাক্।

ষষ্ঠী। বোঝ না,বন্ধু। এখন যা যুগ পড়েছে—এতে কবির একটি করে রসজ্ঞ বয়স্য থাকা ভারী প্রয়োজন। তিনি হবেন তাঁর সমালোচক—অর্থাৎ সাদা বাঙ্গলায় লাঠি ! সেই লাঠির ভর না পেলে এখন আর সাধ্য নেই যে কবিবর মাথা তুলে দাঁড়ান ! দাও না কবিতাটা—পড়তে পড়তেই বেড়ানো যাক্ !

যতীশ। বথামি করবে না, বল।

ষষ্ঠী। affidavit করে বলছি, বথামি করব না। I Sree Shasthicharan Chatterji do hereby solemnly affirm and say as follows.

যতীশ। আবার ?

ষষ্ঠী। এটাকেও যদি বথামি বল, তবে ত আর ষষ্ঠীচরণকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না !

যতীশ। এই নাও—(কবিতার পাণ্ডুলিপি প্রদান)

ষষ্ঠী। (কাগজ দেখিয়া পাঠ)

"নামহীনা তুমি রহিলে সে কোন্ আভাষে,
পরিচয় আজো মিলিল না—তব ললনা !
দিকে দিকে তব রূপের মাধুরী বিকাশে,
শত সুরে শত——"

যতীশ। আস্তে পড়তে পার না ?

ষষ্ঠী। আচ্ছা—"দিকে দিকে তব রূপের মাধুরী বিকাশে—"

(ইত্যাদি পাঠ করিতে করিতে প্রস্থান)

যতীশ ভাবমুগ্ধবৎ তাহার অনুসরণ করিল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—ইডেন-উদ্যানের অপরাংশ। কুঞ্জ-বেদিকার সম্মুখ।

দয়াল, সরযূ ও নিশির প্রবেশ

দয়াল। এধারটা বেশ নিরিবিলি, পুরুষের ভিড় নেই। তোরা ঐ পাথরটায় একটু বোস্ ভাই। একটি আলাপী লোককে দেখলুম! অনেক দিন পরে দেখা, ছুটো কথা কয়ে আসি।

সরযূ। তা যাও না,—আমরা ছুজনে দিব্যি গল্প করব'খন।

নিশি। তুমি তা বলে কাছেই থেকো, দাছু।

সরযূ। ওঃ, কেন! ভয়টাই বা কিসের, শুনি। অত সাহেব সুবো, লোক জন ঘুরছে, কিসের ভয়!

নিশি। সাহেবদের দেখলে লজ্জা করে না ত—তবে বাঙ্গালী দেখলেই কেমন জড়সড় হয়ে পড়তে হয়!

সরযূ। (চারিধারে চাহিয়া) কি চমৎকার, দাছু—

দয়াল। তা আর বল্‌তে! এমন খোলা হাওয়া, এমন সব জায়গা থাকতে মেয়েদের আমরা খাঁচায় পুরে রেখে দিয়েছি! যেন তারা মানুষই নয়, যেন খোলা হাওয়ায় তাদের কোন অধিকারই থাকতে পারে না! এমন নিরিবিলি প্রশস্ত জায়গা—এখানে সকালে কি সন্ধ্যাবেলায় একটু বেড়ালে মনে ফুর্ত্তি হয় কত—শরীরে স্বাস্থ্য হয়। এ সব ক'জন বোঝে! তারা কেবল চোখ মেলে পথে দাঁড়িয়ে আছে, কোথায় কার বাড়ীর মেয়েরা একটু গাড়ীর জানলা খুলে যাচ্ছে,—কর্, তাদের একঘরে—এই সব নিয়েই ব্যস্ত। আর তারই ফলে বাঙ্গালীর মেয়েরা নানান্ রোগে ভুগে সারা হচ্ছে, মারা যাচ্ছে। অত খাটুনির পর একটু খোলা হাওয়া পেলে তাদের সহ্যও হয়, সব!

নিশি। তোমার মত অত করে এ-সব ভাবেও না কেউ, দাছু। সব আপিস যায়, আপিস থেকে ফিরে ছু'খানা লক্ষীছাড়া নভেল ওল্টায়, আর তারই ফাঁকে ছেলেটাকে-মেয়েটাকে ছু'ঘা কিল-চড় বসিয়ে দিয়ে সংসার-ধর্ম্ম সারলে,—ব্যস—!

দয়াল। ঠিক কথা! culture জিনিসটা বাঙ্গালীর ঘরে নেই বললেও চলে! লেখাপড়া শেখার মানে খালি ডিগ্রী নেওয়া, আর তার জোরে ছুটো পয়সা রোজগার করা—এই বৈ ত না! মনটাকে গড়বার কথা তাদের মনেও থাকে না!

নিশি। মন কি আছে যে গড়বে!

দয়াল। তবে তোরা বোস্ দিদি—আমি এই সামনে থেকেই ঘুরে আসছি। (প্রস্থান)

সরযু। কেমন ভাই দেখতে!

নিশি। চমৎকার!

সরযু। কেমন সব লতায় পাতায় ঝালর ঝুলছে! কত রকমের ফুল—কেমন পুকুর!

নিশি। তার উপর কেমন হাওয়াটুকু! সব ভালো! আমার মনে হচ্ছে, তুমি যেন কোন নাটকের নায়িকা! এমন কুসুমিত উপবনে একা বেড়াচ্ছ! পাশে এই আমার মত বেরসিক সখী—আহা, এমন স্থান, এমন সময়—অভাব শুধু একটি রাজপুত্তুরের! সেই গানটা মনে পড়ছে, আমার!

সরযু। গা' না—

নিশি। যা বলেছ! এটা ত আর থিয়েটারের ষ্টেজ নয়! আহা, বেশ গানটি—

সরযু। না গাস্ ত গান গান করে জ্বালাস্ নে!

নিশি। আহা—(মৃদু স্বরে) "এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী,
সে যদি গো শুধু আসিত!
পরাণে এমন আকুল তিয়াসা
সে যদি গো ভালবাসিত—!"

সরযু। থাম্ থাম্—আগে বুঝিয়ে দে, এই 'সে'টি কে?

নিশি। সে আবার বোঝাতে হবে? সে তোমার কান্ত,তোমার প্রাণবঁধুয়া! সখিরে,সেই ফটোর মোটরে চড়ে যে তোমার মনের মন্দিরে প্রবেশ করেছে—

সরযু। তুই আর জ্বালাস্নে, ভাই! সত্যি, সে ফটোখানা কোথায় গেল, বল্ দেখি! মোটে আর খুঁজেই পেলুম না!

নিশি। আহা, রসিকতা চাপা থাক্ না! নিজে সেটি বাক্স-জাত করেছ।

সরযু। সত্যি না!

নিশি। য়্যাঃ, ঠিক বলছ, তুমি রাখনি?

সরযু। সত্যি বলছি, আমি জানি-ও না।

নিশি। তা হলে দাদু বোধ হয় খোঁজ-খবর নিচ্ছে।

সরযু। ঐ কতকগুলো লোক এই দিকে আসছে! চ, আমরা ওধারে যাই!

নিশি। ওমা, তাই ত—ওরা যে আবার এধারেই আসে!

সরযূ। আমরা একলা রয়েছি দেখছে, তবুও কি ওরা বেড়াবার আর জায়গা পাচ্ছে না ?

নিশি। ভারী অসভ্য ত। মুখ-চোখের ভঙ্গীটা দেখ, একবার !

সরযূ। দেখতে হয়, তুই দেখ্‌গে যা—

কতিপয় যুবকের প্রবেশ

১। তাই ত বাবা কালী, আজ যে আর গলা খুললে না ! একখানা গাও।

২। আর বাবা ! হাত-পা ঝিমিয়ে আসছে ! গলা খুলছে না !

৩। না, না, গাও—

৪। এস হে, এইখানে বসে পড়া যাক্—

১। ধর গান ! (সকলে বসিয়া পড়িল)

৩। গাও না, কালী—

৪। শশী, চুপ কর্ না। তপোবনের শান্তি ভঙ্গ করিস কেন ?

২। তবে শোন বাবা—(সুর করিয়া)

আরে যে অবধি তোমায় দেখেছি রে প্রাণ—

আমার এ মন ভেঙ্গে যে সে হয়েছে খান্-খান্ !

চাওনা বঁধু বদন তুলে, মরম-বাঁধন দাও সে খুলে—

সরযূ। (জনান্তিকে নিশির প্রতি) চ',এখান থেকে। আপদগুলো নড়বে না !

নিশি। (জনান্তিকে) যত সব লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর—(উভয়ে গমনোদ্যত)

যুবকগণ। (উঠিয়া সমস্বরে সুর ধরিল)

'বলি হে বঁধু যেয়ো না, যেয়ো না, প্রাণগুলি দলে যেয়ো না'—

ষষ্ঠী ও যতীশের প্রবেশ

যতীশ। আপনারা ভদ্রলোক !

১। কেন বাবা—তোমার সঙ্গে তফাত কোন্‌খানটায় ?

ষষ্ঠী। এই মহিলাদের সামনে অমন লক্ষ্মীছাড়া গান গাইতে আপনাদের সঙ্কোচ হল না ?

যতীশ। এঁদের মর্য্যাদা রাখতে আপনাদের এখানে না বসাই উচিত ছিল।

১। চটো না, বাবা, বেহ্মদত্যি !

২। ভারী দরদ দেখছি যে !

৩। হবে না কেন ! বঙ্কিম বাবু বলে গেছেন, সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয় !

যতীশ। চোপ রও, ষ্টুপিড।

৪। এস না, মুখোমুখি কেন! হাতাহাতি হোক! (আস্তিন গুটাইল)

১। None but the brave deserves the fair.

ষষ্ঠী। দেব এখনই রাস্কেলের টুঁটি টিপে!

২। এসো না, দেখা যাক্!

যতীশ। চলে আয়, শুয়ার! (৩য় যুবকের মস্তকে ঘুসি মারিল; সে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল)

৪। তবে রে ছুঁচো—(যতীশকে মারিতে উদ্যত)

ষষ্ঠী। (৪র্থ যুবকের কাণ ধরিয়া টানিতে সে হঠাৎ টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল)

১। 'দৈত্য এসে লোটে ফুলবন!' ঘুঘু দেখেছ, এখনও ফাঁদ দেখনি, চাঁদ! (যতীশকে ধরিয়া ঘুসাইল)

ষষ্ঠী। (সরযূ ও নিশির প্রতি) আপনারা ওদিকে চলে যান্!

(সরযূ ও নিশি ভয়চকিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল)

ষষ্ঠী। (১ম যুবকের দিকে ঘুসি উঁচাইল)

একজন পুলিশ সার্জ্জেণ্টের প্রবেশ

সার্জ্জেণ্ট। Now, what is this? Disorderly conduct! I arrest you all.

যতীশ। এই যে সার্জ্জেণ্টকে সব বলা যাক্!

সার্জ্জেণ্ট। কি হইয়াছে, বাবু?

ষষ্ঠী। These two ladies were walking here, when the rascals came and began singing objectionable and vulgar songs to the annoyance of the ladies.

সার্জ্জেণ্ট। Oh, I see. Yes, I saw them coming this side with smiles on their lips and I kept an eye on them. Then this golmal—Very well, I would send them up for being of disorderly conduct. You may be cited as witnesses—what's your name, please?

ষষ্ঠী। (সার্জ্জেণ্টের খাতায় নাম লিখিয়া দিল)

সার্জ্জেণ্ট। And, your name, please?

যতীশ। (নিজের নাম লিখিয়া দিল)

সার্জ্জেণ্ট। Thank you Babu, you would get summons to

attend Court. I would now take these bullies to thana. They would have a blessed night in the Hajat.

(যুবাচতুষ্টয়কে লইয়া সার্জ্জেণ্টের প্রস্থান)

যতীশ। আপনারা কি একলা এখানে এসেছেন ? সঙ্গে কেউ নেই ?

ষষ্ঠী। তাই ত ! এ ত খুব safe নয় !

(সরযূ ও নিশি লজ্জা-সঙ্কুচিতা হইয়া নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল)

দয়ালের প্রবেশ

দয়াল। কি, ব্যাপার কি ?

ষষ্ঠী। এঁরা কি আপনার সঙ্গে—

দয়াল। হাঁ। (সরযূ ও নিশির কাছে গেলে তাহারা চুপি চুপি কি বলিল, শুনিয়া আগাইয়া আসিয়া) মশায়, আপনারা আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন, আজ ! মান বাঁচিয়েছেন। আপনাদের নাম ছুটি যদি—

ষষ্ঠী। আমার নাম ষষ্ঠীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ইনি আমার বন্ধু যতীশ—

সরযূ ও নিশি চমকিয়া পরস্পরের দিকে চাহিল।

দয়াল। আপনারা দয়া করে আমার এখানে যদি একদিন আসেন—সিমলেয় লালু মল্লিকের গলিতে গেটওলা বাড়ী—ঠিক ঐ বাগানটার বাঁ কোণেই ! দয়া করে আসবেন, তা হলে। (সরযূ ও নিশির প্রতি) তোরা আয়। আমার বন্ধুটি তোদের দেখতে চাইছেন। তাহলে আজ আপনাদের ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিতে পারলুম না। অনুগ্রহ করে আসতে ভুলবেন না।

ষষ্ঠী। নিশ্চয় যাব ! নিশ্চয় যাব।

যতীশ। (কথা বলিতে গিয়া কিছু বলিতে পারিল না।)

(দয়াল, সরযূ ও নিশির প্রস্থান)

ষষ্ঠী। কি, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে যে ! ব্যাপার কি ! নাঃ, এ মন্দ নয় ! Old love changeth for new ?

যতীশ। পাগল না কি !

ষষ্ঠী। তাতে আর সন্দেহ আছে ! এখন আবার নতুন পালা সুরু হল না কি ?—"কি হল রে আমার—

বুঝিবা সজনি হৃদয় আমার হারিয়েছি—"

যতীশ। শুয়ার, সব সময় তোমার বথামি ! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হাসি

আমি কত ভালোবাসি আশৈশব হাসি তোরে
পারিতাম যদি দেখাইতে,
মরুময় এই ক্ষুদ্র নবীন হৃদয় খুলি'
ছিল কত প্রফুল্লতা চিতে।
স্নেহময়ী মাতৃক্রোড়ে যখন দেখিতে পাই
সরল শিশুর মৃদু হাসি,
চাহি' মার মুখ-পানে কী স্বর্গীয় স্নেহভরা—
তুলনায় তুচ্ছ পূর্ণশশী!
লহরে লহরে উঠে ভাসি' আহা মার প্রাণ,
ভুলে যায় জ্বালা বসুধার;
এই ক্ষুদ্র হাসিটুকু তার কাছে স্বর্গ সুখ
ভাবে ইহা ফল তপস্যার।
হয় কিবা শান্তির আগার!
ক্রীড়ার তরঙ্গমাঝে উচ্চ হাসি বালকের
কী সুন্দর প্রাণ-মাতোয়ারা!
ভাই বোন্ এক প্রাণ কী সরল স্নেহোচ্ছ্বাস!
তুমি হাসি, নিজে আত্মহারা!
নবস্ফুট যৌবনের প্রথম উল্লাস হাসি
কী প্রবাহ হৃদয়ে ছুটায়!
সে তরঙ্গে তালে তালে নাচে মানবের মন
শোক জ্বালা সব ভেসে যায়।
বিষাদের আবির্ভাবে হয় নাকো অবসান
হাসির এ পূর্ণ পরিণতি।
যৌবনের পূর্ণতায় গম্ভীর গম্ভীরতর
কী মধুর স্বরূগের জ্যোতি!
অস্ফুট অস্ফুট তব অধর-লাবণ্য-মাঝে
প্রণয়ের প্রথম স্বপনে
থাকো হাসি গুপ্তবেশে মানবেরে সুখ দিতে

আমি কি তা' দেখিনি নয়নে ?
ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভাব ধীরে ধীরে প্রকাশিতে
তব শক্তি রাখে সংগোপনে,
সৌন্দর্য্য-গরিমারাশি প্রীতি-অভিমান-ভরে
বিচ্ছেদের প্রথম মিলনে।
বিষাদ হৃদয়ে চাপি' নিষ্প্রভ হাসির রেখাটুকু
কী অশান্তি ঢেলে দ্যায় মনে !
প্রণয়ী না হ'লে বল কে বুঝে জগতে আর
বিদায়ের সেই শেষ ক্ষণে ?
মূর্খ আমি নাহি শক্তি বর্ণিতে তোমার হর্ষ
অনুপম মাধুরী স্বর্গের ;
বিমুগ্ধ তোমারি রূপে হতভাগ্য দীন, যাচে
একবিন্দু রেণু চরণের।
নীরব অথচ স্থিরা মলিন লাবণ্যময়ী
একপ্রান্তে ছিল জীবনের,
ঈষৎ ঈষৎ স্ফুট কমল-কোরক-সম
মৃদু হাসি নির্ম্মল প্রেমের।
যৌবনের সমাগমে দেখিলাম নিভিতেছে
তার সেই বিমল কিরণ ;
হুতাশের তপ্তশ্বাস বুঝিনু লাগিছে গায়
অশ্রুকণা ঝরিল তখন।
আবার ভাতিল হাসি—মধুর মধুরতর
সবিস্ময়ে কাঁপিল অন্তর !
ভাবিলাম মনে মনে এখনো ফোটেনি ফুল,
মধুলোভে বসেনি ভ্রমর।
এ হাসিতে সে হাসিতে কী অপূর্ব্ব রূপান্তর,
—রূপান্তর কত চমৎকার !
চকিল চপলা যেন, জাগিল বিগত স্মৃতি
হৃদয় হইল অন্ধকার।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

আমার জীবন-কাহিনী

নানা ঘটনা—ভীষণ দুর্ঘটনা

সতীশ ও আমি বি-এ পড়িতে লাগিলাম। দেবকুমার দাদা আসাম হইতে চিঠিপত্র সর্ব্বদাই লিখিতে লাগিলেন। সেখানে সাহেব তাঁকে বেশ পছন্দ করিয়াছেন। তাঁর কাজেও তিনি বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। জায়গাটাও তাঁর মন্দ লাগিতেছে না। ইত্যাদি নানা বিষয় লিখিতেন। আমিও আমাদের এখানকার অবস্থাসহ যথাযথভাবে তাঁর পত্রের উত্তর দিতে লাগিলাম।

মণীন্দ্র বাবু যখন কোন প্রয়োজনে কলিকাতায় আসিতেন, আমার সঙ্গে দেখা না করিয়া প্রায় যাইতেন না। তা'ছাড়া চিঠিপত্র মধ্যে মধ্যে লিখিতেন। আমিও অবকাশক্রমে দুই একবার দেবগ্রামে গিয়াছিলাম। শেষবারে গিয়া নফর কাকার মেয়ে পুঁটুর (পুঁটুর ভাল নাম লক্ষ্মীমণি,) বিবাহ-উপলক্ষ্যে কয়েক দিন ছিলাম।

সতীশদের বাড়ি আরো দুইবার গিয়াছিলাম। নির্ম্মলার সঙ্গে আমার বিবাহ হয় ইহা সতীশের মায়ের একান্ত ইচ্ছা। সতীশের পিতা হরিহর বাবু একদিন আমার নিকট ঐ কথা পাড়েন, কিন্তু আমি আমার অবস্থার কথা বলিয়া এবিষয়ে এখন কোন কথা বলিতে পারি না জানাইলাম। তাহাতে তিনি বলেন, "বাবা, আমার যে কারবার আছে তাহা যদি তুমি দেখ, তোমার আর অন্য চাকরি-বাকরির দরকার হবে না; সতীশের সেরূপ ভাব নয়, পাড়াগাঁয়ে থেকে এ সব কাজ চালাবে তা মনে হয় না; সহরে থাকতেই তার ভাল লাগে। আমি আর কি চিরকাল এই কাজ নিয়ে থাকব? ইচ্ছা হয়, সময় সময় একটু ঘুরে ফিরে আসি। তা তুমি অর্থের জন্য কেন ভাবচ? আমার কারবারটি নিতান্ত সামান্য নয়। যেমন করে হোক বছরে ৪।৫ হাজার টাকা বাঁচে। তা ছাড়া বিস্তর টাকা লহনা পড়ে আছে। এখন আর নূতন বাকী পড়ে না। দেনা পাওনায় এক রকম চলে যায়। কলিকাতায় মহাজনদের ঘরে যাহোক আমার সুনাম আছে। এখনি দশ হাজার টাকার মাল চাইলে পাই। তাই বলি, বি-এটা পাশ কর। তারপর এই কারবার দেখে শুনে চালাও। অর্থের জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। বাস্তবিক তোমাকে দেখে পর্য্যন্ত তোমার প্রতি সতীশের মার—অবশ্য আমারও কেমন একটা টান

হয়েছে—তোমাকে চির সম্বন্ধে আবদ্ধ করি আমাদের একান্ত ইচ্ছা। তুমিতো অযোগ্য পাত্র নও।"

আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম। নির্ম্মলা বুঝিয়াছে আমার সহিত তাহার নিশ্চয়ই বিবাহ হইবে। যদি বা আগে পীড়াপীড়িতে এক আধবার আমার সম্মুখে তাড়াতাড়িভাবে আসিত, এখন আর মোটেই আসে না। যদি দৈবাৎ চোখে পড়ে যায়, তখনি সরিয়া যায়। ভাবান্তরের সঙ্গেই হোক, আর যাহাই হোক, প্রথম দেখার পর এখন নির্ম্মলাকে যেন আর এক রকম দেখাইতে লাগিল।

পূজার ছুটি আসিল। দেবকুমার দাদা আমাকে এবার ছুটিতে আসামে যাইতে একান্ত অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু সতীশদের বাড়ি না হইয়া আসাম যাওয়া হইল না। এজন্য সময় অনেকটা কম হইয়া পড়িল। তবু আসাম গিয়া দুই সপ্তাহ ছিলাম। দেবকুমার দাদার একটি স্বতন্ত্র কোয়ার্টার। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি। গোরু, ঘোড়া, চাকর, পাচক (বাবুর্চ্চি) সব আছে, বেশ স্বচ্ছন্দে থাকেন। এবার দেবকুমার দাদার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আমার বিবাহ সম্বন্ধের কথাও বলিলাম। দেবকুমার দাদা বলিলেন, "বেশ তো, সতীশের সঙ্গে তোমার অত্যন্ত প্রণয়, এ সম্বন্ধ খুব সুখেরই হবে। আর যখন পণ নিয়ে বিবাহ করতে তুমি প্রস্তুত নও, তখন এই উপলক্ষ্যে তৈরী কারবার পাবে, কেন মিছে চাকরি চাকরি করবে? এ বেশ হবে।"

আমি একথা-সেকথা ক্রমে তাঁর বিবাহের কথাও পাড়িলাম। বলিলাম "এমনভাবে থাকাটা তো আপনার ঠিক নয়, যাই হোক দশ টাকা বিলক্ষণ পাচ্ছেন, এখন সংসারে প্রবেশ করাই ভাল।" তিনি বলিলেন, "না ভাই ওসব ঝঞ্ঝাটে শীঘ্র যাচ্ছি না। একা একা বেশ আছি। আর কয়দিনের জন্যেই বা এ সংসারে থাকা, মিছে জড়িয়ে আর কি হবে, এ বেশ আছি এক রকম।" তবু আমি বলিলাম, "না, আপনাকে সংসার করতে হবে।"

আমি আসিবার সময় কিছু সিল্কের কাপড়-চোপড় ও যাওয়া আসার খরচ জন্য ৫০৲ টাকা দিলেন। দাদার সাহায্য লইতে আমার কোন দ্বিধা বোধ হইত না।

কলেজ খুলিবার দিনের সময় নিকট হইয়া আসিল, এমন সময় মণীন্দ্র বাবুর এক পত্র পাইলাম। অন্ততঃ দুই দিনের জন্য একবার দেবগ্রামে আমাকে যাইতে লিখিয়াছেন। আমি শনিবারে দেবগ্রামে গেলাম। প্রয়োজন এমন বিশেষ কিছু নয়।

এবার কিছু নূতনভাবে কাজ হইবে—তাই আমাদের "বিশ্বধর্ম সভার" নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করা হইবে, বিশেষ বিশেষ সভ্যদের মতামত গ্রহণ করা হইবে, এই জন্য আমাকে চান। আগামী কল্য মিটিং হইবে এই সম্বন্ধে সন্ধ্যার সময় কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় শোনা গেল জেলে পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে। শুনিয়াই মণীন্দ্র বাবু আমাদের লইয়া নিজে ছুটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড় বাবু আরো অনেক লোক পাঠাইলেন। আমরা আগুন নিভাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু এসময়টায় মানুষের এমনই হয়, যেন জ্ঞান থাকে না। আমরা বেশ বুঝিলাম ব্যাপার খুব গুরুতর হইবে না। কিন্তু জনতা ও ব্যস্ততা এমনই হইয়াছে যে, ভীষণ কাণ্ড বলিয়া সকলেই অস্থির। মণীন্দ্র বাবু নিজে গিয়াছেন, চারিদিক দিয়া লোক আসিয়াছে—জল ঢালিতেছে। আমরা সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিতেছি, কাহারো কোন বিপদ না হয়—এমন সময় একখানি ঘরের ভিতর হইতে রব উঠিল, "বাবা আমাকে বাঁচাও, বাবা আমাকে বাঁচাও।" যেমন শোনা, অমনি মণীন্দ্র বাবু ধাঁ করিয়া সেইদিকে ছুটিয়া গিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটি বালিকাকে রক্ষা করিতে গেলেন—অকস্মাৎ জলন্ত চাল ভাঙ্গিয়া পড়িল,—"সর্ব্বনাশ! কি হইল, কি হইল" শব্দ। আরো তিন চার জন অপর দিক দিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া মণীন্দ্র বাবুকে বাহির করিল, কিন্তু একি, কাণ্ড! বালিকাটিকে তিনি বুকের মধ্যে ধরিয়াছিলেন, আঘাত তাঁরই উপর লাগিয়াছে, তাঁর যে সাঙ্ঘাতিক অবস্থা! সংজ্ঞা-শূন্য।

আমি হঠাৎ তাঁর দিকে তাকাইতে পারিলাম না। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহাকে বাড়িতে আনা হইল কিন্তু তখন আর এমন সময় ছিল না যে, কলিকাতা হইতে সাহেব ডাক্তার আনা যায়। অবশ্য দেবগ্রামেও বড় ডাক্তার ছিলেন, বাবুদের বাড়িতেই একটি ডাক্তারখানা। তখন যাহা করা কর্ত্তব্য সকলেই তাহাতে নিযুক্ত, ক্রমে অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িল। সেই অজ্ঞান অবস্থাই শেষ অবস্থায় পরিণত হইল।

এই ভয়ঙ্কর হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিবার জন্যই বুঝি আমাকে তিনি ডাকিয়াছিলেন, অথবা পল্লীগ্রামের কি দুর্ভাগ্যের চিহ্নই পড়িয়াছে যদি কোন স্থানে কোন গ্রামে একটু কিছু সুলক্ষণ দেখা যায় অমনি যেন তাহাতেই একটা ব্যাঘাত ঘটে—দেবগ্রামে মণীন্দ্র-দেবতার স্বর্গ রচনা দেখিয়া অনেকের আশা হইয়াছিল, পল্লীর যদি সুদিন আসে—কিন্তু মূলেই বিনাশ—জানি না ইহা কোন্ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত।

মানুষের মাত্র যতদূর যাহা করিবার সাধ্য তাহা হইল, শচীন্দ্র বাবুর মুখে আর কথা সরিতেছিল না, ভাইয়ের শোকে অভিভূত। বাড়িতে ও গ্রামে হাহাকার পড়িয়া গেল। এত আগ্রহ এত ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া রাত্রিশেষে দেবতা স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। বালিকার আর্ত্তনাদে তিনি থাকিতে পারেন নাই—মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, কাহাকেও সাহায্য করিবার জন্য ডাকিলেন না, যদি প্রাণ রক্ষা হয়—যদি বালিকাকে বাহির করিয়া আনিতে পারেন—প্রাণ রক্ষার জন্যই প্রাণ দিলেন,—প্রাণের মায়া ভাবিবার আর তো সময় ছিল না, এ যে প্রাণেরই টান, প্রাণের টানেই আগুনের মধ্যে গেলেন। নর-দেহী দেবতারা কি এই জন্যই পৃথিবীতে আসেন? মণীন্দ্র দেবতা বুঝি আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেই সংসারে আসিয়াছিলেন? তাই বুঝি ধনীর সন্তান—ধনীর ভ্রাতা—নিজে ধনী হইয়াও প্রাণে বিলাস-বাসনার অবকাশ হইল না। ধনমদে মাতিলেন না—প্রাণীর সেবায় 'তনু মন ধন' অর্পণ করিলেন। তাই বুঝি বিবাহের কথায় বলিয়াছিলেন,—"এ বিষয় আমি বিধাতার সায় পাই না।" তিনি যে সংসার করিতে আসেন নাই; আপনার একটি ক্ষুদ্র সংসারের জন্য নয়, তাঁর কার্য্য সকল পরিবার লইয়া, সকলকে আপনার করিবার জন্য; তাহা তিনি করিয়াছিলেন। সকলের স্থান তাঁর হৃদয়ের মধ্যে রচনা করিয়াছিলেন, তাই আজ একটি সামান্য প্রাণীর জন্য নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিলেন! আত্মত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। কিন্তু দেবতার অসম্পূর্ণ কার্য্য যে পড়িয়া রহিল, তাহা আর কে করিবে?

এই ঘটনায় আমার মনে হইল মানুষ জগতে কোন মহৎ কাজ করিতে আসে এ কথা ভুল। অসীম-জগৎ-কার্য্যে মানুষের শক্তি কত ক্ষুদ্র! মানুষ আসে কেবল আপনার পরিত্রাণের জন্য। বিন্দু মাত্র মঙ্গল ভাব ধারণ করিতে পারিলেই তাহার জীবনের অজ্ঞানতা দূর হয়। সেই মঙ্গল-বিন্দু হইতে এক এক জীবনে এক একটি হিতার্থ প্রকাশ পায় মাত্র—জনসমাজ তাহাকেই সৎকাজ বলে, মূলে ঐ মঙ্গল ভাবটুকু। মানুষ পুরস্কৃত হয়—আত্ম-প্রসাদ লাভ করে তজ্জন্যই—কর্ম্মের জন্য নয়, কর্ম্মের পরিমাণেও নয়।

(ক্রমশঃ)

পরলোকগত

সুরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়

আজ আমি কুশদহের পাঠকবর্গকে যে মহাত্মার জীবনী বলিতে যাইতেছি তাঁহার নাম সুরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়। সুরেশবাবু রাণাঘাটের নিকট আমুলিয়া-নিবাসী পরলোকগত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। অতি অল্প বয়সে পিতামাতা উভয়েই তাঁহাকে অনাথ করিয়া পরলোকে গমন করেন। দুঃখ-সাগরে পতিত সুরেশবাবু আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে মাইনর পাশ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, তিনি তখন শিলংএ কার্য্য করিতেন। কয়েক বৎসর পড়িয়া সুরেশবাবু শিলং গভর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে Entrance পরীক্ষা দিলেন ও ১৫৲ টাকা জলপানি লইয়া পাশ করিলেন। ইহার অগ্রেই তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তৎপরে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার উদ্দেশ্যে শিবপুর Engineering কলেজে ভর্ত্তি হন, কিন্তু কিছুকাল পড়িয়াই কঠিন পীড়াগ্রস্থ হইয়া ডাক্তারগণের মতানুসারে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু বিদ্যোৎসুক সুরেশবাবু নিষ্কর্ম্মা হইয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আবার বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গবাসী কলেজে পাঠ আরম্ভ করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর পাঠ করিয়াই সাংসারিক অভাবে পড়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

কলেজ ছাড়িয়া দিয়া সুরেশবাবু চাকরির অন্বেষণ করেন। কিছুদিনেই শিলচরে (আসাম) Sub-overseer নিযুক্ত হন। তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি ও কর্ত্তব্যগুণ দেখিয়া চা-বাগানের অনেক সাহেবরা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। তিনি ক্রমে ক্রমে overseer পদে নিযুক্ত হইলেন এবং অবশেষে হাইলাকান্দিতে Sub-divisional officer নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আর বেশি দিন দাসত্ব-শৃঙ্খল বহন করিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি চাকরি ছাড়িলেন।

চাকরি ছাড়িয়া স্বদেশের মায়া ত্যাগ করিয়া দূরদেশ বুন্দেলখণ্ডস্থিত নওগাঁয় (মধ্যভারত) গেলেন। এই স্থানের সহিত তাঁহার কোন সূত্রে পরিচয় ছিল না, কেবলমাত্র একজন সাহেব—যাহার অধীনে তিনি প্রথম হইতে চাকরি করিয়াছিলেন তিনি তথায় ছিলেন। ইহারই সাহায্যে তিনি তথায় Contractor

হইয়া অনেক কার্য্য করিতে পান। ৩ বৎসর পরে ১৯০৩ সনে ইনি Govt. Auctioneerএর পদ প্রাপ্ত হন। ক্রমশ উন্নতি করিতে করিতে ইনি বহু অর্থব্যয়ে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে "Bundelkhand Engineering works and Auction Mart" নামক একটি firm স্থাপিত করেন ও এই firmটি এক্ষণে বুন্দেলখণ্ড এমন কি মধ্যভারতে সর্ব্বপ্রধান ফারম। এইরূপে তিনি অনেক উন্নতি করেন ও ক্রমে P. W. D., M. W. S., G. A. D., ইত্যাদির যত কার্য্য সমস্ত ইনিই করিতে লাগিলেন।

ইনি বুন্দেলখণ্ডে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক। ইনি Nowgong Cantonment Committeeর একমাত্র ভারতীয় মেম্বর ছিলেন। বিখ্যাত "কৈসর-ই-হিন্দ" ক্লাবের অনারারী সেক্রেটারী ছিলেন। ইনি অনেককাল স্থানীয় "Cantonment School"এর সেক্রেটারী থাকিয়া উহার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। গত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলিতে ইনি মনোনীত দরবারী দ্বয়ের মধ্যে এক জন।

ইতর জন্তুদের ক্লেশ নিবারণে ইনি সাতিশয় যত্নপর ছিলেন। ইঁহারই উদ্যমে নওগাঁর "Pinjrapole স্থাপিত হইয়াছে। সেই Pinjrapoleএর ইনি President হইয়াছিলেন।

ইনি অতিশয় দয়ালু ছিলেন। শিশুকালে যেরূপে পিতৃমাতৃ-আদরে বঞ্চিত হইয়া ঘোর দ্রারিদ্র্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি দারিদ্র্যের মর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানিতেন। তিনি যে Nowgong Civil Hospitalএ "Chatterjee's Female Word" নামক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন তাহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

ইনি অতিশয় অতিথিবৎসল ছিলেন। দুরদেশে বাঙালী দেখিলেই আনন্দে নিজের গৃহে আশ্রয় প্রদান করিতেন।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী যে কিরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছে তাহার বহুল দৃষ্টান্তের মধ্যে ইনি অন্যতম।

বুন্দেলখণ্ডের ইতিহাসে ইনি উল্লেখযোগ্য। একবার বুন্দেলখণ্ডস্থিত পান্নায় অতিশয় দুর্ভিক্ষ হয়। লোকপাল সিংহ তখন তথায় রাজত্ব করিতেন। * তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে পান্নার সমীপেই একটি বৃহৎ জলাশয় খোদিত করিতে আজ্ঞা দেন। জলাশয় সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই মহেন্দ্র মহারাজা মৃত্যুমুখে

* "পান্নার মহারাজা" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

পতিত হন। তাঁহার বংশধরগণ সেইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় উহা ফেলিয়া যান। অবশেষে ১৯১০ সালে ইনিই জলাশয়টি সম্পূর্ণ করেন।

আজ এই মহাত্মা ইহলোকে নাই; কিন্তু ইহাঁর কীর্ত্তি বুন্দেলখণ্ডের পথিকদের চক্ষে সততই পড়িতেছে। বুন্দেলখণ্ডের পাতায়-পাতায়, ইহার কীর্ত্তি মাখা রহিয়াছে। এখনো বুন্দেলখণ্ডের সমস্ত লোকের মুখ হইতে একজন বাঙালীর নাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইহার বিরহে আজ সকলেই ক্লেশ অনুভব করিতেছেন।

শ্রীপাঁচুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

সদ্দৃষ্টান্ত

পরলোকগত মোহনলাল মিত্র মহাশয়ের বংশ, ধনে মানে সুবিখ্যাত। মিত্র মহাশয়ের পুত্রদ্বয় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে এক সুন্দর প্রথা প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ করিয়াছেন। রায় প্রমথনাথের ভ্রাতা রায় চন্দ্রনাথ মিত্রের বিবাহ উপস্থিত। তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনগণ বিবাহ-উপলক্ষ্যে নাচ, থিয়েটার, তাড়িতের রোসনাই ও গোরার বাদ্য প্রভৃতির আয়োজন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য ৯ হাজার টাকার ফর্দ্দ প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু সুশিক্ষিত ভ্রাতৃদ্বয় এক রাত্রির আমোদে এত টাকা অপব্যয় না করিয়া তাহার দ্বিগুণ অর্থ নানা প্রকার সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম—ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের পিতা মোহনলাল মিত্র ও মাতা আন্নাসুন্দরীর নামে ২ জন রোগীর বাসের জন্য এলবার্ট ভিক্টর হাস্পাতালে ৬ হাজার, এলবার্ট ভিক্টর কলেজ স্থাপনের জন্য ১ হাজার, কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তাঁহাদের পিতার নামে রোগীনিবাস নির্ম্মাণার্থ ৫ হাজার, কলিকাতা অনাথাশ্রমে ১ হাজার, কলিকাতা আতুরাশ্রমে ১হাজার, শোভাবাজার দাতব্য সভায় ১ হাজার, ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটীতে ১ হাজার, অন্ধ স্কুলে ১ শত, বোবা স্কুলে ১ শত, মহাকালী পাঠশালায় ১০০০, বারাসত হাস্পাতালে ১ শত, গয়া কুষ্ঠাশ্রমে ১ শত, নওদা হাসপাতালে ১ শত, বঙ্গীয় এম্বুলেন্স কোরে ১ শত, কিংস হাস্পাতালে ১ হাজার, টালীগঞ্জ সেবাশ্রমে ১ শত, মোট ১৮,৭০০ টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশ যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, আমরা আশা করি, সকলেই তাহার অনুসরণ করিবেন। (সঞ্জীবনী)

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

দেশে এখন ম্যালেরিয়া জ্বরের মরসুম আরম্ভ হইয়াছে; এবার প্রকোপ কিছু অধিক বোধ হইতেছে। নিজ নিজ চেষ্টায় এই ভীষণ জ্বরের হাত হইতে যতদূর রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা, পূর্ব্ব হইতে অধিবাসিগণ তাহাও করেন না। কোন রকমে দিন কাটিলেই হইল, এইরূপ নির্জীব নিরুৎসাহের ভাবে সাধারণের মন আচ্ছন্ন। নিজ নিজ বাড়ি ঘর পরিষ্কার রাখা, বাড়ির পার্শ্বস্থ জঙ্গল পরিষ্কার করা, পানীয় জল পরিষ্কার করিয়া পান করা, সর্ব্ব প্রকারে শরীর মন পরিষ্কার রাখা, পান ভোজন বিষয়ে সদাচার মিতাচার অবলম্বন করা, ইহাতেও যে অনেক উপকার হয়, সকলে তাহা চেষ্টা করেন না কেন?

গৈপুর মিত্র-পাড়ার উত্তর-পশ্চিমে যে বৃহৎ জঙ্গলের সৃষ্টি হইয়া ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, এখন এই জঙ্গল কাটাইয়া সাদা জমি করিতে পারিলে গ্রামের স্বাস্থ্য অনেক ভাল হইত কিন্তু এপর্য্যন্ত তৎপক্ষে একজনকেও উদ্যোগী দেখা যায় না।

আমরা অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন-চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, খাঁটুরা দত্তবাটীর বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় কলিকাতায় সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসাবাটীতে মুমূর্ষু অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন। যদিও তিনি এখন অশীতিপর, তবু দেশের এরূপ মহাত্মা ব্যক্তি যতক্ষণ দেহে বিদ্যমান থাকেন ততক্ষণই ভাল।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, গোবরডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত যাহাকে সকলে ষষ্ঠীবর রক্ষিত বলিয়াই জানেন, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে ৪৶৹ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ষষ্ঠীবাবুর এই কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়; কিন্তু গোবরডাঙ্গার মত স্থান হইতে মাত্র ৪৶৹ সংগৃহীত, ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা নয়?

খাঁটুরা-নিবাসী পরলোকগত গোলকচন্দ্র দত্তের পৌত্র, পরলোকগত শ্রীমন্তচন্দ্র দত্তের পুত্র, শ্রীযুক্ত দ্বিজরাজ দত্ত, ৫৬ বৎসর বয়সে গত ২১ই আষাঢ়, কলিকাতার কাঁটা পুকুরস্থ ভবনে, দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। দ্বিজরাজ বাবু শান্ত-শিষ্ট সচ্চরিত্র ছিলেন। এবার কুশদহ মুখপত্রে তাঁহার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।



কৈকেয়ী ও মন্থরা

(শিশুরঞ্জন রামায়ণ হইতে গৃহীত)

SEYNE PRESS.

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"তোমারি নামে ফুটেছে ফুল,
গন্ধে প্রাণ করেছে আকুল,
যতনে গাঁথিয়া এনেছি মালা
আদর ক'রে একবার পরনা।"

সপ্তম বর্ষ, | ভাদ্র, ১৩২২ | পঞ্চম সংখ্যা

ভগবানের ডাক

—*—কলিকাতা।

মিশ্র—কাওয়ালি

"জাগো পুরবাসি! ভগবত প্রেমপিয়াসী
আজি এ শুভদিনে কিবা বহিছে করুণা-রস-মধুধারা,
শীতল বিমল ভগবত করুণা-রস-মধু-ধারা!
শূন্য হৃদয় লয়ে, নিরাশায় পথ চেয়ে,
বরষ কাহার কাটিয়াছে?
এস গো কাঙ্গাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ,
জগতের জননীর কাছে।
কার অতি দীন হীন বিরস বদন,
(ওগো) ধূলায় ধুসর মলিন বসন,
দুঃখী কেবা আছ, শুন গো বারতা,
ডেকেছেন তোমারে জগতের মাতা।"

(শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী)

ভগবান্ মানুষকে ডাকেন এ কথা কি সত্য ? এ কথা কি কেহ বিশ্বাস করেন ? অবশ্য যিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী তিনি এ কথা বিশ্বাস করেন। কেবল বিশ্বাস করেন তাহা নহে ; এ কথার তাৎপর্য্যও তিনি বুঝিতে পারেন।

ভগবান্ মানুষকে ডাকেন কেন ? কোথা হইতে কোথায় লইয়া যাইবার জন্য এবং কি প্রয়োজনে তিনি ডাকেন ? তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন আছে কি ? তাহা তো বোধ হয় না। আমাদের প্রয়োজনের জন্যই আমাদিগকে ডাকেন। ডাকেন কোন দূর দেশ হইতে তাহাও নয়। আমাদের অন্তরে থাকিয়া অতি নিকট হইতেই ডাকেন। তবে আমরা সে ডাক শুনিতে পাই না কেন ? তিনি নিকটে—অতি নিকটে আমাদের প্রাণের প্রাণ হইয়া আছেন বটে কিন্তু আমরা তাঁহা হইতে দূরে আছি। এ দূরতা স্থানে নয়, ভাবে দূরতা। তাঁহার প্রেম—তাঁহার পবিত্রতা হইতে অজ্ঞানমোহান্ধ হইয়া—স্বার্থপর কলুষ-চিত্ত হইয়া দূরে আছি। তজ্জন্য সংসারে সর্ব্বদা অশান্তি দুঃখ তাপ ভোগ করিতেছি, এবং অন্যেরও দুঃখের কারণ হইতেছি।

ভগবান্ তাঁহার প্রেম এবং পবিত্রতা দানে আমাদিগকে দুর্গতিমুক্ত করিবার জন্য নিয়ত ডাকিতেছেন। আমরা হিংসা দ্বেষ অপ্রেম পরিত্যাগ করিব ইহাই তাঁহার ইচ্ছা, ইহাতে আমাদেরও আনন্দ এবং শান্তি।

আমরা কেন ভগবানের ডাক শুনি না, কেন তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হই না, কেন দ্বেষ হিংসা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রেম পবিত্রতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হই না ? এই প্রশ্নের সর্ব্বাঙ্গীন উত্তর প্রদান করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যে কারণেই হোক আমরা যে ভগবানের ডাক না শুনিয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছি তাই তিনি নানা সময়ে নানা ঘটনায় নিয়ত আমাদিগকে ডাকিতেছেন। তিনি মানুষকে একাকী নির্জ্জনতার মধ্যে ডাকেন, আবার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার ভজনানন্দের মধ্যে, উৎসব-ক্ষেত্রে প্রারান্তিক সঙ্গীত-ঝঙ্কারে—কত রকমে নিদ্রিত প্রাণকে জাগ্রত করিয়া অনুতাপের আগুণ জ্বালিয়া কত রকমেই তিনি মানুষকে ডাকিতেছেন। এই ডাক সত্য কি না তাহাই চিন্তা করিয়া, অন্তরাত্মার মধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখা আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু বিষয়মদে মত্ত, রাগ দ্বেষ হিংসা স্বার্থের সর্ব্বদা ব্যস্ত, অশান্তচিত্ত ব্যক্তি বিবেককর্ণ বধির, তাই তাহারা ভগবানের ডাক শুনিতে পায় না।

যাঁহারা তাঁহার সুমধুর ডাক শুনিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে

পারিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন সে ডাক কত মধুর। একবার তাঁহার ডাক শুনিলে হৃদয় কেমন শান্ত হয়! কত আরাম হয়! তাঁহার প্রেমের আহ্বান-ধ্বনি যখন হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়, তখন কেমন উৎসাহ হয়। হৃদয়-জ্বালা যে শীতল হইয়া আসে। আবার সে আহ্বান-ধ্বনি কেমন শক্তিময়! তাহা একবার শুনিলে মৃতপ্রায় জীবন নবীন হইয়া উঠে! বাস্তবিক তিনি নবজীবনদাতা পুণ্যময় পরম পিতা পরমেশ্বর। আমরা তাঁহাতে বিশ্বাসী হইতে পারিলে কৃতার্থ হইয়া যাই। মানব জীবনের পক্ষে ঈশ্বর-বিশ্বাসের তুল্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর কিছুই নাই। আগামী বারে এই বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

উদ্বোধন

অনাদি কাল হইতে যে মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে তোমাকে আজ সেই উৎসবে যোগ দিতে হইবে। যুগযুগান্ত ধরিয়া কত ভাষায়, কত ছন্দে, কত গানে সেই উৎসবের রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে। সকল রূপ, সকল রস, সকল গন্ধ, সকল শব্দ, সকল স্পর্শ মিলিত হইয়া এক মহাপূজার উদ্বোধন হইয়াছে; যত ভক্তের হৃদয় অর্ঘ্যরূপে তথায় নিবেদিত হইয়াছে, সকল মলিনতার স্পর্শ মুছিয়া যাইয়া নৈবেদ্য কি সুন্দর কি শুভ্র কি পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

এই উৎসব এক দিন বা দুইদিনের জন্য নহে, এই উৎসবের আদি নাই, অন্তও নাই, এই উৎসব কোন দেশ কাল পাত্রে আবদ্ধ নহে, এই উৎসব কোন একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র নহে, ইহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই প্রতিদিনই প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তোমার এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ আসে, তুমি কোলাহলে সে কথা ভুলিয়া যাও, তোমার চিত্তের ক্ষুধা শান্ত হয় না—তোমার ক্ষুধিত অন্তরাত্মা সকল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও উপবাসী, তাই সুখ ও শান্তির জন্য তোমার সকল চেষ্টা অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হয়। বাহিরের সম্পদ ও চাকচিক্য তোমাকে দুই এক দিনের জন্য ভুলাইয়া রাখিতে পারে কিন্তু সে ভুল ভাঙিয়া যায়। তোমার অন্তঃপুরে তোমার পরম বন্ধুকে, তোমার আপনার জনকে অনশনে উপবাসী রাখিয়া যতই তুমি সুখের

আয়োজন করিতেছ সকলই গরলময় হইয়া উঠিতেছে। তোমার আপনার ঘরে তুমি আপনি অগ্নি সংযোগ করিলে,—তোমার আপনার ক্ষেত্রে আগাছা বপন করিলে, আবার কোন আশায় তুমি সুখ সুখ বলিয়া ছুটাছুটি করিতেছ। ভ্রান্ত জীব এখনো তোমার নেশা ছুটিল না? প্রতিদিন তোমার দুয়ারে যে স্বর্গরাজ্যের নিমন্ত্রণ আসিয়াছে, প্রতিদিন মহোৎবের যে আহ্বান তোমাকে বরণ করিয়াছে, তুমি ক্ষণেকের প্রলোভনে মত্ত হইয়া তাহা উপেক্ষা করিয়াছ। কত স্বর্গের দূত তোমার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। তোমাকে বাহিরে আনিয়া বিশ্বনৃত্যে যোগ দেওয়াইবার জন্য কত শরৎ কত বসন্ত বিফল হইয়া ফিরিয়া গেল। কত পূর্ণিমার রজনী মৌন হইয়া তোমার অপমান সহ্য করিয়াছে, কত সুগন্ধ কুসুম তোমার অর্ঘ্যের অপেক্ষা করিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে; এখনো কি তোমার চৈতন্য হইবে না? আর না, আজ এই শুভলগ্নে পুণ্যস্নান করিয়া তোমার অন্তরের সকল মলিনতা ধুইয়া ফেল, আজ তুমি উৎসবের যাত্রী, আজ তোমাকে বিশ্বনৃত্যে যোগ দিতে হইবে। এক মায়াপুরী রচনা করিয়া নিজকে সেখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, ভাঙিয়া ফেল তোমার কল্পিত সব বন্ধন যাহা তোমাকে সমগ্র বিশ্ব হইতে পৃথক করিয়া সঙ্কীর্ণতার মধ্যে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বসঙ্গীতের রাগিণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তোমার জীবনের সুর মৌন হইয়া পড়িয়াছে।

তোমার অন্তরে আজ উৎসবকে জাগ্রত কর। কারণ উৎসব যে তোমার ঘরের জিনিষ। উৎসবকে কোন কল্পনার লোকে খুঁজিতে হইবে না, স্বর্গরাজ্যকে এই বিশ্বের পরপারে শূন্যতার মাঝে খুজিতে হইবে না, অনন্তকে সান্তের বাহিরে দেখিতে হইবে না, আহা, তিনি যে আমাদের কত আপনার তিনি যে আমাদের কত নিকট। আমরা কত নির্ব্বোধ যে আমাদের নিজের ঘর ছাড়িয়া আমরা বাহিরে খুঁজিতেছি। জননীর স্নেহে যদি অনন্তকে দেখিতে না পাই, তবে কি অরণ্যের শূন্যতার মাঝে তাঁহাকে দেখিতে পাইব? ভক্তের হৃদয়ে যদি তাঁহাকে না পাই, তবে কোন অতীন্দ্রিয় জগতে তাঁহার দর্শন পাইব?

শিশুর সরলতায়, সুহৃদের অনুরাগে, রোগীর সেবায়, বিপন্নের সাহায্যে যদি অনন্তের আভাষ না পাই তবে কল্পনার কোন্ সুদূর লোকে তাঁহাকে পাইতে আশা করিব? অনন্ত আমাকে ওতঃপ্রোতভাবে ঘিরিয়া রহিয়াছেন তাঁহাকে দূরতার রহস্যে আবৃত করিয়া সহজকে কঠিন করিয়া তুলিব

কেন? অনন্তকে পাইবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া অরণ্যে কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া কঠোর সাধনা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে সাধনার পথ সুগম হয় নাই। তোমার আপনার ঘরে, তোমার আপনার পরিবারে অনন্ত তোমাকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। আজ তোমাকে দূরে যাইতে হইবে না— উৎসব যে তোমার আপনার ঘরের উৎসব। এই উৎসবে আজ যোগ দাও তোমার সকল নূতন হইয়া উঠিবে। জীবন সফল সার্থক হইবে।

শ্রী———

দয়াময়

তুমি কত মোরে ভালোবেসেছ
আপনার করে' নিয়েছ ;—
অগোচরে থাকি' অন্তর-সখা!
কী প্রবল টানে টেনেছ !
কোন্ সে সুদূর অতীতে বিরলে,
কোন্ স্মৃতি-ঘেরা নীলিমার তলে,
কোন্ সে লগনে, মরমের কোণে
রাগিণী তুলিয়া দিয়েছ !
কতবার কত প্রলোভন-ছলে
তোমারে ছাড়িয়া দূরে গেছি চলে'
না জানি কি বলে 'আয় প্রিয়' ব'লে
বুকে মোরে নিতে গিয়েছ !
আজি কী ব্যাকুল আবেগে মাতিয়া
বিশ্ব-যজ্ঞে আমারে আনিয়া
গর্ব্ব নাশিয়া—সত্তা ভুলিয়া
হৃদয়ে নিবিড় মিশেছ !

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বীজাণু তত্ত্ব

"শরীরং ব্যাধি মন্দিরং"—আমাদের এই মানব দেহটি ব্যাধিমন্দির। দেহ ধারণ করিয়া কাহারো ব্যাধির হস্ত হইতে একেবারে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। কি কারণে ব্যাধির উৎপত্তি হয় এবং কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা তাহার গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়, ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে সকল রোগেরই এক একটি বীজাণু (Germ) আছে। এই বীজাণুই রোগের মুখ্য কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, প্লেগ, নিউমোনিয়া, গণোরিয়া প্রভৃতি অনেক রোগের বীজাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বীজাণু ভিন্ন ভিন্ন রোগ-উৎপাদক। বীজাণুর দেহ অতি সূক্ষ্ম। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া আমরা ঐ অণুদেহীগণকে চর্ম্ম চক্ষুতে দেখিতে পাই না। হাম, বসন্ত প্রভৃতির বীজাণু আবার এত সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম যে উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও উহাদিগকে দেখা যায় না। বীজাণুগণের মধ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ দুই-ই আছে। ডাক্তারেরা জীবাণুকে Protozoa-Amoeba এবং উদ্ভিজ্জাণুকে Bacteria নামে অভিহিত করেন। আবার উদ্ভিজ্জাণুর মধ্যে যাহারা গোলাকার তাহাদিগকে Cocci এবং যাহারা ঈষৎ দীর্ঘাকার তাহাদিগকে Bacilli বলা হয়।

বীজাণুর দেহ এক কোষযুক্ত (unicellular) ইহাদের আকারেরও অনেক পার্থক্য আছে। কেহ বিন্দুর মত, কেহ বা ইংরাজী কমা চিহ্নের ন্যায়, কাহার আকার জয়ঢাক বাজাইবার যষ্টির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, আবার কোন কোনটি বা সূক্ষ্ম লোমের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। এই সকল বীজাণুর খাদ্যও পৃথক্ পৃথক্। কেহ বা শর্করাসংযুক্ত জল না পাইলে জীবন ধারণ করিতে পারে না, কাহার পক্ষে মাংসসংযুক্ত জলই অধিক উপযোগী, কাহার পক্ষে বায়ু নিতান্ত প্রয়োজনীয়, আবার কেহ বা বায়ুশূন্য স্থানেই বাঁচিয়া থাকে। প্রচণ্ড রবিতাপে ও ফুটন্ত জলে সকল বীজাণুই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

সচরাচর জল বায়ু ও খাদ্য পানীয়াদির সহিত রোগ-বীজাণুগণ আমাদের দেহে প্রবিষ্ট হয়। ছিন্ন ত্বক দিয়াও কোন কোন রোগ-বীজাণু দেহাভ্যন্তরে

গমন করিতে পারে। আবার কোন কোন রোগের বীজাণু মশা, মাছি, ইন্দুর প্রভৃতি দ্বারা রোগীর দেহ হইতে সুস্থ দেহে সংক্রামিত হয়।

আমাদের নাসিকার ঝিল্লিতে (mucous membrane) এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম লোম (cilia) আছে। ইহারা সর্ব্বদাই ফিল্টার (Filter)এর কার্য্য করিতেছে। দেহের অনিষ্টকর পদার্থগুলি যাহাতে ঐ পথ দিয়া দেহ মধ্যে উপস্থিত হইতে না পারে সেজন্য ইহারা সর্ব্বদাই পথ আগুলিয়া আছে। ইহাদের দ্বারা অনেক সময় অনেক রোগ-বীজাণু প্রবেশ পথেই বাধা প্রাপ্ত হয়। মুখগহ্বরে এরূপ কোন cilia নাই। সে কারণ হাঁ করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিলে বীজাণুগণ সহজেই দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ঐ জন্য স্বাস্থ্যনীতির একটি কথা আছে—'Shut your mouth to save your life,

রোগ-বীজাণু দেহে প্রবিষ্ট হইলেই সকল সময় যে আমরা পীড়িত হই এমত নহে। যে সকল বীজাণু মুখ-গহ্বর দিয়া দেহ-প্রবিষ্ট হয় তাহাদের অধিকাংশই জঠরের অম্লরসে (Gastric juice)এ পড়িয়া প্রাণ হারায়। কোন কোন রোগ-বীজাণু দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রসবাহী জাল (Lymph Capillaries) দ্বারা রসগ্রন্থীসমূহে (Lymphatic gland) আনীত ও আবদ্ধ হয় ও তখন কোন রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এই সকল রসগ্রন্থী আমাদের শরীরে পাহারার (Sentinel) কার্য্য করে। আবার কোন কোন রোগ-বীজাণু রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলেই রক্ত মধ্যস্থ শ্বেত কণিকায় (White corpuscles) সহিত ইহাদের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়।* রক্তের শ্বেত কণিকাদল সুস্থ ও সবল থাকিলে প্রায়ই রোগ-বীজাণুগুলিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। শ্বেতকণিকা রোগ-বীজাণুর ভক্ষক বলিয়া অধ্যাপক মেচনিকফ্ উহাদিগকে Phagocytes আখ্যা দিয়াছেন। রোগ-বীজাণুগণ শ্বেতকণিকা দ্বারা ভক্ষিত হইলে আর রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কিন্তু যদি সংগ্রামে বীজাণু জয়লাভ করে তাহা হইলে আর নিস্তার নাই। তখন তাহারা বংশবৃদ্ধি করতঃ বল সঞ্চয় করিয়া আমাদিগকে পীড়িত করিয়া ফেলে।

এই সকল বীজাণুর বংশবৃদ্ধি প্রণালীও অতি চমৎকার। প্রথমে একটি বীজাণু দ্বিখণ্ড হইয়া দুইটি হয়। ঐ দুইটি হইতে আবার চারিটি হইয়া থাকে। এইরূপ অতি অল্পকালমধ্যে একটি বীজাণু হইতে বহুসংখ্যক বীজাণুর সৃষ্টি হয়।

* এই সম্বন্ধে এক সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, ভগবানের করুণার বিষয় ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলেন, "শরীর রাজ্যেই বা তাঁহার কি অপার করুণা এক এক বিন্দু রক্তের ধ্যে কত কোটী রক্তাণু দেহ-রক্ষক-সৈনিক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।" (কুঃ সম্পাদক)

রোগীর রোগভোগ কালেও প্রকৃতিদত্ত ব্যাধি প্রতিষেধক শক্তির (Disease resisting power) সহিত রোগ-বীজাণুর সমর চলিতে থাকে। যদি এই সময়ে বীজাণু বিনষ্ট হয় তবেই রোগী নিরাময় হইয়া উঠে, নতুবা তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

রোগ-বীজাণুর জয়লাভ হইলে বুঝিতে হইবে দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি (vital power—Fighting capacity—vitality) ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই শক্তি সকল লোকের সমান থাকে না। সবল ও দৃঢ় পেশীসংযুক্ত দেহ হইলেই যে এই শক্তি অধিক থাকে তাহাও ঠিক বলা যায় না।

ইহা অন্তর্নিহিত অবস্থায় প্রত্যেক জীবের দেহমধ্যে বিদ্যমান আছে। বালক-দিগের এই শক্তি কম। চলিত কথায় স্ত্রীলোকদিগকে "Weaker vessel" বলে বটে বস্তুতঃ কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁহাদের ব্যাধি প্রতিষেধক শক্তি পুরুষ অপেক্ষা অধিক।

অনাহার, কদাহার, মাদক দ্রব্য সেবন, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অত্যধিক পরিশ্রম, শোকতাপ প্রভৃতি দ্বারা এই রোগ প্রতিষেধক শক্তির হ্রাস হয়।

রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে রোগ-বীজাণুর আক্রমণ হইতে যতদূর সম্ভব দূরে থাকিবার চেষ্টা করা উচিত এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিয়া দেহের অন্তর্নিহিত ব্যাধি প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি করা উচিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র।

ফকির সাহেব

বহুদিন হইতেই আমাদের দেশে মুকুট্ রাজার গল্প প্রচলিত আছে। দেশ-প্রচলিত বিবিধ কিম্বদন্তী হইতে সেই মুকুট রাজার বিস্তৃত বিবরণের কিয়দংশ আমরা অদ্য এই প্রবন্ধে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

যশোর জেলার অন্তঃপাতী ঝিঁকরগাছা রেলওয়ে ষ্টেশনের ৪ মাইল দূরে ছোট মেঘনা নামে একটি পল্লীগ্রাম আছে। কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামেই মুকুট রাজা বাস করিতেন এইরূপ শুনা যায়। তৎকালে ঐ অঞ্চলের মধ্যে মুকুট রাজার মান-সম্ভ্রম ও যশ-প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। 'মাইচাম্পা' নামে মুকুট রাজারএকটি পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। পদ্মিনী জাতীয়

রমণী বলিয়া তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল। ক্রমে মাইচাম্পা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার বিবাহের জন্য চতুর্দ্দিকে ঘটক প্রেরিত হইল। সেই সকল ঘটকের অতি-রঞ্জিত বর্ণনার মাহাত্ম্যে মাইচাম্পার পদ্মিনী নাম দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িল!

অনেক স্থান হইতেই মাইচাম্পার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিন্তু মুকুট রাজার মনোনীত না হওয়ায় কোথাও বিবাহ ঠিক হইতেছিল না। মাইচাম্পার বয়স তখন পঞ্চদশ বৎসর। অনেক দেখিয়া-শুনিয়া রাজা একটি উপযুক্ত পাত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ স্থির করিলেন। এক শুভদিনে বিবাহের লগ্ন স্থির হইল।

নানা স্থান হইতেই বিবাহের যৌতুক, ভেট ও উপহারাদি আসিতে লাগিল। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, প্রজাবর্গ ও দাসদাসিগণের আনন্দকোলাহলে রাজবাড়ি মুখরিত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে এক ফকির-শিষ্য একটি মৃত্তিকা-ভাণ্ড হস্তে লইয়া তথায় উপস্থিত। ফকিরের "সওগাত" দেখিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কেহই সেই পাত্রটির আবরণ উন্মোচন করিতে পারিল না! সুতরাং এই ঘটনায় দর্শকগণের কৌতুহল উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। উহা দেখিবার জন্য রাজকুমারী মাইচাম্পাও তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যে মুহূর্ত্তেই রাজকন্যা সেই পাত্রটিতে হাত দিলেন, সেই মুহূর্ত্তে উহা খুলিয়া গেল! ঐ পাত্রটির মধ্যে একজোড়া চুড়ী ও কিছু মিষ্টান্ন ছিল। মাইচাম্পা তৎক্ষণাৎ সেই চুড়ীজোড়া হাতে পরিলেন। রাজকুমারীর এই চুড়ী পরাই মুকুট রায়ের সর্ব্বনাশের কারণ হইল।

যশোরের পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম কোণে বারবাজার নামক স্থানে এক বিখ্যাত ফকির ছিলেন। অনেকগুলি শিষ্যও তাঁহার সহিত তথায় থাকিত। কিছু দিন পরে সেই ফকির মুকুট রাজার বাড়ির ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে আর একটি 'ডেরা' স্থাপন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তথায় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি কখনো বারবাজারে, কখনো বা এই নূতন স্থানে বাস করিতেন। এই উভয় স্থানের মধ্যে মুক্তিশ্বরী নামে একটি নদী আছে। ইহার একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলেই এই নদী পার হইয়া যাইতে হইত। ফকির দুইটি মেষ সঙ্গে করিয়া পতিজালী নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে নদী পার হইতেন। অদ্যাপি তথাকার লোকে এই ঘাটটিকে গাজীর ঘাট বলিয়া থাকে।

যে পাটনী সেই ফকিরকে বরাবর পার করিত, সে তাঁহার নিকট হইতে তজ্জন্য কোনো দিনই কিছু লইত না। একদিন সেই পাটনীর বাড়িতে একটি কাজ ; সেই দিন সে ফকিরের নিকট গিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার একটি মেষ চাহিল। ফকির তাহাকে মেষ না দিয়া একটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। কিন্তু পাটনী কিছুতেই ঐ স্বর্ণমুদ্রা লইতে রাজি হইল না, সে পুনঃপুনঃ একটি মেষ চাহিতে লাগিল। ফকির তাহাকে বারবার বিশেষ অনুরোধের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"তুমি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে না। মেষের পরিবর্ত্তে এই স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা ছাগাদি ক্রয় করিয়া লও।" কিন্তু নির্ব্বোধ পাটনী কিছুতেই ফকিরের প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে ফকির পাটনীকে একটি মেষ দিলেন। পাটনী হৃষ্টচিত্তে মেষ লইয়া বাটী আসিল এবং রাত্রে গোয়ালঘরে মেষটিকে আটকাইয়া রাখিল। পরদিন সকালে সেই গোয়ালঘরের দরজা খুলিয়া পাটনী দেখিল, একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিল! অকস্মাৎ ব্যাঘ্র দেখিয়া পাটনী অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পরে জ্ঞান হইলে দেখিল, সেই ব্যাঘ্র তাহার তিনটি গাভীকেই মারিয়া খাইয়াছে! এতক্ষণে সে বুঝিল, কিজন্য ফকির সাহেব তাহাকে এই মেষ দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ফকিরের তপঃপ্রভাবে প্রকাণ্ড হিংস্র শার্দ্দূল দিবাভাগে মেষরূপে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিত, আর রাত্রিকালে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিত।

অতঃপর পাটনী নিতান্ত বিমর্ষভাবে ফকিরের নিকট গিয়া দেখে, দুইটি মেষই তাঁহার পার্শ্বে রহিয়াছে! আজ আর পাটনী সেই মেষের নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস করিতেছে না। পাটনীর এই প্রকার অবস্থা দর্শনে ফকির সাহেব সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তিনি পাটনীকে গাভী কিনিবার জন্য পূর্ব্বদিনের সেই স্বর্ণমুদ্রাটি প্রদান করিলেন। পাটনী উৎফুল্ল-হৃদয়ে সেদিন ঐ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিল এবং বাটী আসিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকলের নিকট প্রকাশ করিল। সেই পাটনীর খেয়াঘাটে পারের জন্য প্রত্যহ অনেক লোক আসিত, সুতরাং মুখে মুখে এই ঘটনা নানারূপ অলঙ্কারাদিসহ শীঘ্রই দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িল। তদবধি ফকির সাহেবকে সকলেই দেবতার মতো ভক্তি ও যমের ন্যায় ভয় করিতে লাগিল।

মুকুট রায়ের বাটীতে মাইচাম্পার বিবাহ-উপলক্ষ্যে যে এক ফকির-শিষ্য একটি মৃন্ময় পাত্র 'সওগাত' লইয়া আসিয়াছিল, সে এই ফকির সাহেবের শিষ্য।

ফকির সাহেব নিজেই তাঁহার ঐ শিষ্যদ্বারা উক্ত উপহার পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যখন শিষ্য-মুখে শুনিলেন যে, রাজকুমারী ভিন্ন আর কেহই সেই পাত্রের মুখ খুলিতে পারে নাই, এবং রাজকন্যা অত্যন্ত আনন্দের সহিত স্বয়ং সেই চুড়ী নিজ হস্তে পরিধান করিয়াছেন, তখন তিনি প্রচার করিলেন যে, ঐ চুড়ী পরিয়া রাজকন্যা তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন; অতএব অপর কাহারো সহিত মাইচাম্পার বিবাহ হইতে পারে না। রাজা যদি অন্যায়রূপে অন্যত্র রাজকন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কাহারো কল্যাণ হইবে না।

মুকুট রাজা এই কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। এবং ফকির সাহেবকে অবিলম্বে সে-দেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। বরপক্ষ কিন্তু প্রমাদ গণিল। সকলেই মনে করিল ফকিরের কোপে মুকুট রাজার সর্ব্বনাশ হইবে। ফকির সাহেব মুকুট রাজার এই গর্ব্বিত আদেশ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মুকুট রায় যেন বিবাহের দিন কন্যা সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকেন।"

বিবাহের দিন রাজবাটী ঘোর অন্ধকারময়। বর আসে নাই। গভীর রাত্রে ফকির ব্যাঘ্র দুইটি সহ রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কেহই সেই কৃতান্ত-সম শার্দ্দূলদ্বয়ের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। মুহূর্ত্ত-মধ্যেই ব্যাঘ্রদ্বয় রাজবাটীর ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক রাজকন্যা মাইচাম্পা ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অষ্টমবর্ষীয় এক বালক ব্যতীত আর সমস্ত পৌরজনদিগকে নিহত করিল। রাজকন্যা ও রাজপুত্র নিরাপদে ফকিরের নিকট আনীত হইলেন। ফকির সাহেব সেই রাত্রেই নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে লইয়া গিয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ফকিরের শিষ্যগণ সেই স্থানে একটি 'দরগা' প্রতিষ্ঠিত করেন। অতীতের সাক্ষী-স্বরূপ একটি শিমুল ও একটি জিবলি বৃক্ষ তথায় মিলিত হইয়া আজো সেই অপূর্ব্ব অসবর্ণ বিবাহের পরিচয় দিতেছে! প্রতি বৎসর পৌষ মাসে তথায় একটি মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষ্যে একদিন অন্নসত্রও হয়। ফকির সাহেবের চেলাগণ এখনো সেই বৃক্ষতলে কুটীরে বাস করে। ঐ স্থানকে সকলে 'গাজীর তলা' বলে।

ফকির সাহেব এই স্থানে আর বেশি দিন বাস করেন নাই। অল্পদিন পরেই তিনি মাইচাম্পা ও তাঁহার ভ্রাতাকে লইয়া ঝিঁকরগাছা হইতে পাঁচ ক্রোশ

পশ্চিমে বেত্রবতী নদী পার হইয়া গিয়া একটি মনোরম স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

নূতন স্থানে আসিয়া ফকির কিন্তু গার্হস্থ্য-সুখে সুখী হইতে পারিলেন না। অল্পদিন পরেই রাজকন্যা মাইচাম্পা মনের দুঃখে গলায় ছুরি বসাইয়া আত্মহত্যা করিলেন। এই ঘটনায় সংসার-ধর্ম্মের প্রতি ফকিরের একেবারেই বিতৃষ্ণা জন্মিল। তথাকার জমীদারের দেওয়া পীরোত্তর সম্পত্তি ৩২ বিঘা ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত 'দরগা'য় রাজকুমারকে রাখিয়া ফকির সাহেব বনগমন করিলেন। যাত্রাকালে রাজকুমারকে একগাছি 'আশা' প্রদান করিয়া বলিয়া যান যে, কোনো স্থানে যাইবার সময় এই দণ্ড যেন হাতে থাকে এবং কখনো তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইলে যেন তিনবার তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকা হয়।

মাইচাম্পার ভ্রাতা আত্মীয়-স্বজন হারাইয়া ফকিরের উপদেশানুসারে সেই স্থানেই জীবন যাপন করিলেন। সেখানে অদ্যাপি 'মাইচাম্পার দরগা' বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ফকির সাহেব যখন সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য-গমন করেন, তখন গোকুলনগরে কানাই ঘোষ নামক এক গোয়ালার বাটীতে অতিথি হন, কিন্তু কানাই ঘোষ তখন বাড়িতে ছিল না। তাহার বৃদ্ধা মাতার অযত্ন ও অশ্রদ্ধার জন্য ফকির অভিশাপ দেন, তাহাতে তাহার সমস্ত গাভীগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মরিয়া যায়। কানাই বাড়ি আসিয়া সমস্ত শুনিল এবং অনেক অনুসন্ধানের পর ফকিরকে পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণ-প্রান্তে পতিত হইল। ফকির তার করুণ ক্রন্দনে সদয় হইয়া তার গাভীগুলি বাঁচাইয়া দিলেন। এই সময় হইতে ফকির সাহেব 'গাজী' নামে অভিহিত হইলেন। অদ্যাপি এই দেশের লোকের মুখে গাজী সাহেবের গোকুলনগরের এই অলৌকিক কীর্ত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার পর ফকির সাহেবের সম্বন্ধে আর কোনো কথা জানা যায় না। বারবাজারে তাঁহার প্রথম 'আস্তানা'র অনেক চিহ্ন এখনো বিদ্যমান আছে।

মুকুট রায়ের প্রাসাদ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীরাম রায় নামে তাঁহার এক ভ্রাতা জীবিত ছিলেন। নিজ বসতবাটী পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাহার দুই মাইল উত্তরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নিজ নামানুসারে এই নূতন স্থানের নাম শ্রীরামপুর রাখিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি ঐ অপযশ ও নিন্দার জন্য বেশি দিন থাকিতে পারিলেন না। শীঘ্রই ঝিনাদহের অন্তর্গত

'জয়দিয়া' গ্রামে উঠিয়া গেলেন। শ্রীরামপুরের পূর্ব্ব নাম ছিল কালীনগর। তথাকার বাঁওড়ের ধারে এখনো মুকুট রায়ের ভ্রাতা শ্রীরাম রায়ের কৃত বাঁধা ঘাট প্রভৃতির নিদর্শন রহিয়াছে।

মুকুট রায়ের রাজধানীর অপর কোনো চিহ্ন না থাকিলেও তাঁহার খনিত বহুসংখ্যক জলাশয়ের শুষ্ক খাত এখনো তাঁহার অতুল সম্পদের পরিচয় দিতেছে। স্থানে স্থানে পুরাণো ইটও দেখা যায়। উহার অনতিদূরে কপোতাক্ষী নদীকূলে একটি পুরাতন মন্দির ও তন্মধ্যে একটি কালো রঙের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তথায় কোনোরূপ পূজা-অর্চ্চনাদি কিছুই হয় না! অনেকে অনুমান করেন, উহা মুকুট রায়ের স্থাপিত। জনশ্রুতি আছে, এই শিবলিঙ্গের পূজা করিলে অমঙ্গল হয়। মুকুট রায়ের শোচনীয় পরিণামের জন্যই বোধ হয় এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

আমার জীবন-কাহিনী

চতুর্থ অধ্যায়

(ভগ্ন-হৃদয়)

আমাদের "বিশ্বধর্ম্ম" সভার আমরা ২৭জন যুবক মিলিয়া মণীন্দ্রবাবুর শব-দেহ পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া শ্মশানঘাটে আনিলাম। পরমেশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া সসম্ভ্রমে সজলনেত্রে আমরা তাঁহার দেহে অগ্নিসংযোগ করিলাম। চন্দনকাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইয়াছিল; দেখিতে দেখিতে সেই সৌম্য মূর্ত্তি দেবতার দেহও ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। আমরা শূন্যহৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

কুমার মণীন্দ্র দেবের আমরা সাতাশ জন শিষ্য শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া বিশেষভাবে ১০দিন বৈরাগ্য-ব্রত পালন করিলাম। প্রতিদিন "বিশ্বধর্ম্ম" সভায় নামসঙ্কীর্ত্তন ও তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। সকলে একমত হইয়া স্থির হইল, আমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিব—তাঁহার সমস্ত কার্য্য চালাইব।

তারপর আমরা ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া আপন আপন সাধ্যানুসারে

ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিলাম। তারপর আমি কলিকাতায় আসিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া আর পূর্ব্ববৎ পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিতে পারিলাম না। আমার মনের কি একপ্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল; কেবলই যেন শূন্য বোধ হইতে লাগিল। আমি অল্পবয়সে পিতামাতা হারাইয়া ধর্ম্মবন্ধুর ভালবাসায় সে-শোক ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আবার এই অভাব কিসে পূরণ হইবে? মনে হইল এ সংসারে সার কি? সকলই তো মিথ্যা, কেবল একমাত্র এখানে মৃত্যুই সত্য দেখিতেছি। আবার আজ মায়ের মৃত্যু-দিনের কথা মনে নবীন হইয়া উঠিল, পিতাকে দেখি নাই কিন্তু তাঁহার একটি কল্পনা-ছায়া মনে আসিল! এই সময় আমার সম্মুখে কেবল মৃত্যুময় সংসার ফুটিয়া উঠিল, সেই অন্ধকারে আর সমস্তই যেন ডুবিয়া গেল। তখন মনে হইল এই ক্ষণিক সুখের জন্য বৃথা চেষ্টা কেন? এই কি সুখ? কই সুখ কোথা—শান্তি কোথা? হাঁ, ভালবাসার মধ্যে সুখ আছে বটে, কিন্তু ইহার পরিণাম যে ভীষণ বিচ্ছেদ! তবে আর সুখ কোথা!

এইরূপ বিশৃঙ্খল চিন্তার স্রোতে দিন দিন আমার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িল। আবার এক একবার ভাবিলাম, শুনিয়াছি, ভগবান্ সত্য, ধর্ম্ম সত্য! অবশ্য তাহা বিশ্বাস করি, কিন্তু ভগবানকে হৃদয়-মধ্যে পাওয়া যায় কিসে? কি করিলে জ্ঞানলাভ হইতে পারে! এতদিন ধর্ম্মবন্ধুর ভালবাসার টানে চলিতেছিলাম, জীবনে আশা-উৎসাহ ছিল, আজ সেই বন্ধুর অভাবে আমার জীবনের সকল উৎসাহ অবলম্বন ভাঙিয়া পড়িল। হৃদয় একেবারে শূন্যতার মধ্যে পড়িয়া এখন কি করি কোথা যাই, মনে হইতে লাগিল। আর যে আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এই মৃত্যুময় সংসারে কোথাও কি নিস্তার আছে?

এই সময় সতীশ আমাকে অনেক বুঝাইতে লাগিল। তাহাদের বাড়ি লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার কোন কথায় আমার প্রাণে শান্তি আসিল না। তাহাদের বাড়ি যাইতেও কিছুমাত্র উৎসাহ হইল না। বরং মনে হইল, একটি পরিবার আমার জন্য আশা করিয়া আছেন, এখন আমার চিত্ত আর সে পথের পথিক হইতে চাহিতেছে না, এখন যদি স্পষ্ট করিয়া আমার মনের কথা খুলিয়া বলি ইহারা তাহা বিশ্বাস করিবেন না।

দেখিতে দেখিতে প্রায় ৩ মাস কাটিয়া গেল। দিন দিন আমার প্রাণের

অশান্তি যেন আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পড়াশুনা ক্রমে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। 'টুইশানি'ও ছাড়িয়া দিলাম। মনে হইল আর কলেজে পড়িয়া কি হইবে? এ পড়াতো অর্থোপার্জ্জনের জন্য। অর্থোপার্জ্জন করিয়া কি হইবে? এ অনিত্য জীবনের জন্য এত চিন্তা এত আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন কি? পরমেশ্বর নদীতে জল ও বৃক্ষে ফলের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে কোনরূপে আহার মিলিবেই; তার জন্য ব্যস্ত হইয়া কি হইবে? সমাজে সভ্যতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে অনেক প্রয়োজন বটে, কিন্তু এই মিথ্যা সংসারে কিছু দিনের জীবনের জন্য এত বন্ধনে থাকিবারই বা কি প্রয়োজন? আকাশের নীচে স্থানের কি অভাব আছে, এই দেহটুকু রাখিবার মতো স্থান কি আমি পাইব না? কষ্ট হইবে? বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত তো কত কষ্ট ভোগ করিলাম, তবে কষ্টের জন্য ভয় কি? যে দেহের পরিণাম মৃত্যু তাহার জন্য আবার সুখ-বিলাসের চেষ্টা কেন? আমার আর সুখে প্রয়োজন নাই।

যখন মনে এই ভাব আসিল—বন্ধনমুক্ত হইয়াও তো বেশ থাকা যায়, তখন যেন মনে কেমন একটা বল-ভরসার ভাব আসিল। তখন মনে হইল, যখন যেখানে ভাল লাগিবে যাইব—যখন যাহা ইচ্ছা করিব। আমার তো সংসারে কেহ নাই,—কাহারো জন্য দায়িত্বের বন্ধনও নাই, তবে আমার ভাবনা কি? ঈশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্য, আমার জন্য তিনি ভালই ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমি বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া এতদিন তাহা বুঝিতে পারি নাই—আজ বন্ধন-মুক্তির কল্পনাতেই এই আনন্দ, তবে সেই প্রকৃত অবস্থা কত শান্তিপ্রদ!! এই তো শান্তির পথ,—তবে আর কেন বৃথা সময় নষ্ট করি। আর না, আর কোন প্রলোভনে মন দেওয়া হইবে না—বাসনাই যত দুঃখের মূল।

আমার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইল; মনে মনে স্থির করিলাম, আপাতত সতীশকে কিছু বলা হইবে না, আর বেশি কোন সম্বলেরও প্রয়োজন নাই। তবে হঠাৎ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া, যাহা অর্থ সম্বল আছে তাহা ভার-হীন করিয়া লইতে হইবে। একাকী চলিব—যে দিকে প্রাণ টানে সেই দিকেই যাইব। আপাতত পশ্চিম প্রদেশেই যাওয়া ঠিক —দেখি ভ্রমণে চিত্তের কি অবস্থা হয়। একদিন প্রত্যুষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলাম। (ক্রমশঃ)

কুশদহ-বৃত্তান্ত

খাঁটুরা নাম কেন হইল—ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা দুরূহ ব্যাপার। অনেকে অনুমান করেন রাজা রত্নেশ্বরের গোবৎস রাখিবার এখানে খোঁয়াড় ছিল—ইহা হইতেই খাঁটুরা নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন—চণ্ডীদেবী, রাজা রত্নেশ্বরের রাজ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরিখা (এক্ষণে যাহা কঙ্কনা হ্রদ নামে অভিহিত) পার হইয়া যাইবার সময় হস্তের খাড়ু (কঙ্কণ) এই খাঁটুরায় ফেলিয়াছিলেন বলিয়া ইহা খাঁড় রা পরে খাঁটুরা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। খাঁটুরার উল্লেখ যোগ্য এমন কোন প্রাচীন কীর্ত্তি নাই যাহা দ্বারা ইহাকে প্রাচীন স্থান বলা যায়। তাম্বুলিগণ এখানে বাস করিবার পূর্ব্বে ইহা তত প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। তাহা হইলে বেশ জানা যাইতেছে যে তাম্বুলিদিগের উন্নতি অবনতির সহিত খাঁটুরার উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে। তাম্বুলিগণ ব্যবসায় প্রধান জাতি ও ধার্ম্মিক। কিন্তু বিকৃত অল্প শিক্ষা দোষে তাহার একটু ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। গোবরডাঙ্গা নিবাসী ধর্ম্মভীরু শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী কুণ্ড মহাশয় শৈশব জীবনে খেলা উপলক্ষ্যে অধিক সময় দেবদেবীর পূজা করিতেন, ছুটা ছুটী খেলা তাঁহার কখন দেখি নাই। * এই ধর্ম্মভাব তাঁহার ভবিষ্যজীবনেও আমরা পরিলক্ষিত করিয়া আসিতেছি। এই রূপ খাঁটুরার দত্ত বাড়ীর স্বর্গীয় রাসবিহারী দত্তের বাল্য জীবনেও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের লক্ষণ দেখিয়াছিলাম। এক্ষণে খাঁটুরার ভাগ্যলক্ষ্মী এই দত্ত বংশের উন্নতি অবনতির উপর নির্ভর করিতেছে। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে এখানে যে স্কুলটি স্থাপিত হইয়া আসিয়াছিল তাহা আজো নিয়মিত রূপে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ দত্ত মহাশয় এক্ষণে ইহার সহকার সম্পাদক—এবং গোবরডাঙ্গার মিউনিসিপালিটীর আনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্থানীয় লাইব্রেরীর সম্পাদক। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দের ১ লা জুলাই এখানে একটি ব্র্যাঞ্চ পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই খাঁটুরার দক্ষিণ প্রান্তে গোবরডাঙ্গা-রেলওয়েষ্টেশন স্থাপিত। এখানে ক্ষেত্র বাবুর উদ্যোগে একটি ব্রহ্মোপাসনালয়ও স্থাপিত আছে। যদিও মন্দিরের জীর্ণ

* কুশদহ সম্পাদক মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে বিনোদ বাবুর শৈশব জীবনের এই কথা লেখকের নিকট বলিয়াছিলেন।

সংস্কার হইয়াছে বটে, কিন্তু নিয়মিতরূপে এখানে ধর্ম্মচর্চ্চা হওয়া উচিত।

যখন তাম্বুলিদিগের মনে ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছিল তখন ইহাদিগের দ্বারা দেশের অনেক সৎকার্য্য হইয়াছিল। এখন সামান্য অবস্থাপন্ন হইলেও বিবাহের সময় ইংরাজী বাজনা না আনিলে যেন বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। এই অনর্থক খরচ কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে ঐহিক পারত্রিক দুই দিকেই পুণ্যসঞ্চয় হয়। কোন উচ্চমনা ব্যক্তি এ সম্বন্ধে পথ দেখাইলে অনেকে সেই পথ অনুসরণ করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় তাঁহার পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ৩৲টাকা কুশদহ-সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া যে সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা অনুকরনীয়!

খাঁটুরার নিকট হয়দাদপুরও একটি তাম্বুলিপ্রধান স্থান! হয়দাদপুরের কাছারির পূর্ব্বাংশে কঙ্কনা হ্রদের তীরে পীর হৈদর সাহেবের স্থান আছে। হয়দাদপুরের কাছারির সুপারিন্‌টেনডেণ্ট শ্রীযুক্ত শিখরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পীরের অস্তিত্ব ও অমানুষিক কার্য্যের কথা বলিয়াছিলেন। মল্লিক জমিদার মহাশয়ের এই পীরের একটু সেবা করা উচিত।

রাজা রত্নেশ্বরের হঠাৎ দেশত্যাগ করিয়া জগন্নাথ-ক্ষেত্রে পলায়নের বিষয় পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছিল, অনেকে বলেন এই হৈদর পীরের সহিত মনোমালিন্যই তাহার প্রধান কারণ। মুসলমান রাজত্বের সময় ফকিরের অপ্রতিহত প্রভাবের ফলে হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদ দেউলির চন্দ্রকেতু রাজাকে সবংশে নিধন করিয়াছিলেন: রাজা রত্নেশ্বরের পূর্ব্বতন কত পুরুষ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার কোন ইতিহাস নাই এবং জানিবারও কোন উপায় নাই। তবে তাঁহারই স্থাপিত শীতলা এবং খাঁটুরার চণ্ডীদেবী আজো পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শুনা যায় পীর হৈদর যখন শুনিলেন রাজা রত্নেশ্বর সপরিবারে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথ-ক্ষেত্রে পলায়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পীর সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি আর ফিরিয়া আসেন নাই। বোধহয় পীর গোরাচাঁদের ন্যায় পীর হৈদর অত্যাচারী ছিলেন না! হিজ্‌লীর মছন্দী সাহেবও বিখ্যাত ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি যথার্থ ফকিরপদবাচ্য ছিলেন। পীর হৈদর নিজেকে জাহির না করায় তাঁহার নাম কেহই জানে না—এমন কি হয়দাদপুরের অনেকেও জানেন না। কেবল তাঁহার নাম অনুসারে হৃদরপুর গ্রামটির নাম করণ হইয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

গোঁফ

(গল্প)

সে আজ খুব বেশি দিনের কথা নয়, তখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ি। নীরস কবিত্বহীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আসিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না; কেবল পিতার একান্ত পীড়াপীড়িতে আসিতে বাধ্য হইলাম। এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার ভ্রম দূর হইল। প্রত্যহ থিয়েটারের রিহার্সেল চলিতেছে। এদিকে ডিবেটিং ক্লাব—ফুটবল ক্লাব—সণ্ডে ক্লাব। আমি সকল ক্লাবেরই মেম্বর হইলাম। এখানে আসিবার পূর্ব্বে ইহাকে যেমন শুষ্ক নীরস ও কবিত্বহীন মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিলাম তাহা নহে। ইহা কবিত্বের কুঞ্জকানন, মাধুর্য্যের লীলাভূমি, সরস সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ। ইহা যেন মনোহরা, কঠিন আবরণের ভিতর ক্ষীরের পূরিয়া। এখানে নাই কি, জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্তই আছে। কলেজটা আমার খুবই ভাল লাগিল। তখন আমাদের বিদ্যাসুন্দরের রিহার্সেল চলিতেছিল; মনে করিয়াছিলাম, আমি সুন্দরের পার্ট পাইব, কিন্তু ম্যানেজার মহাশয় অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া আমাকে মালিনীর পার্ট দিলেন এবং কহিলেন, এ পার্ট প্লে করিবার লোক তাঁহার ক্লাবে নাই—ইহা প্লে করিবার জন্য পাকা লোকের দরকার, আর এই পার্ট যদি আমি ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারি তাহা হইলে আমার অক্ষয় যশলাভ হইবে।

মালিনীর পার্ট লইয়া আমার সেই নবদুর্ব্বাদলের ন্যায় নবীন কোমল গোঁফ জোড়াটির মায়া পরিত্যাগ করিয়া সমূলে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলাম। তার পর নবোদ্যমে পার্ট মুখস্ত করিতে লাগিয়া গেলাম। ইহা ছাড়া ডিবেটিং ক্লাবে কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ, সমালোচনা ইত্যাদি সমস্তই চলিত; সঙ্গে সঙ্গে সনাতন পরচর্চ্চাও যে চলিত না, তাহা নহে। ফুটবল ক্লাবে ভাল ব্যাক বলিয়া আমার বেশ নাম ছিল। আমি গোলকীপারের সম্মুখে থাকিয়া সর্ব্বদা গোল বাঁচাইতাম। তার পর সণ্ডে ক্লাব—প্রতি রবিবার সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিরাম তাস, পাশা, দাবা চলিত এবং সঙ্গে সঙ্গে গান, গল্প ও সমালোচনার বিকট ঝঙ্কারে ক্লাব-গৃহটি গম্ গম্ করিত। এখানে বসিয়া সকলেই আপনাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার অধিকার পাইত। কাজেই সহজে ক্লাবটি বেশ জমিয়া উঠিত।

সেবার ইষ্টারের বন্ধে মহাধূমধামের সহিত কলেজ-প্রাঙ্গণে আমাদের বিদ্যাসুন্দর অভিনয় হইয়া গেল। এমন দক্ষতার সহিত আমি মালিনীর অংশ অভিনয় করিয়াছিলাম যে, পরদিন হইতে সকলের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া গেলাম; এমন কি কলেজের ঝাড়ুদার, চাপরাশি, দ্বারবান হইতে, টিচার, প্রফেসার ও প্রিন্সিপাল পর্য্যন্ত সকলেই আমায় চিনিয়া ফেলিল এবং এই সময় হইতে অনেকেই আমাকে মাসী বলিয়া ডাকিতে লাগিল—শেষে আমার মাসী নাম জাহির হইয়া পড়িল।

২

মার্চ্চ মাসে আমরা কয়েক দল জরিপের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। প্রত্যেক দলে চারিজন করিয়া থাকিতাম। বেলা সাতটার সময় কয়েকখানা লুচি ও কিছু হালুয়া খাইয়া খোঁটাখুঁটি চেন, কম্পাস, নিশান ইত্যাদি লইয়া বাহির হইতাম এবং কলেজের সীমান্ত স্থানগুলি জরিপ করিয়া বেলা বারোটা-একটার সময় ক্ষুধা তৃষ্ণায় ধর্ম্মাক্ত-কলেবরে বাসায় ফিরিতাম।

জরিপ করিতে করিতে বৈশাখ মাসের দারুণ রৌদ্রে তৃষ্ণায় যখন ছাতি ফাটিয়া যাইত, তখন শ্রেণীবদ্ধ ছোট ছোট নারিকেলগাছগুলির পানে হতাশ ভাবে চাহিয়া থাকিতাম। দেখিতাম স্বাদু স্নিগ্ধ জলপূর্ণ নেয়াপাতি ডাবগুলি কাঁদি-কাঁদি [illegible] কিন্তু কি দুরদৃষ্ট একটিও পাড়িবার জো নাই! পঞ্চাশ টাকা জরিমানা! [illegible] মণ্ডল সমস্ত গাছগুলি জমা লইয়াছে। সম্মুখে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী কল্ কল্ রবে ছুটিয়াছে তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু উহার এক গণ্ডূষ জলপান করিবার অধিকার নাই; যে পান করিবে তাহার পঁচিশ টাকা জরিমানা! উহাতে নাকি ম্যালেরিয়ার বীজাণু কিল্ কিল্ করিতেছে।

এইরূপ কষ্টের সহিত জরিপ করা যখন আমার পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, তখন এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিলাম।

সেদিন জরিপ করিতে করিতে যখন নিতান্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া শ্যামশীতল নারিকেল-কুঞ্জের তলে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার দলের মোহিনীকে ডাকিয়া কহিলাম, "ভাই মোহিনী, তুই এই গাছটার গোড়ায় একটু দাঁড়া, আমি তোর কাঁধে উঠি।"

আমার কথায় মোহিনী একেবারে জলিয়া উঠিল। সে সরোষে কহিল, "এ আবার কি খেয়াল মাসী? রোদে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এখন কাঁধে ওঠা—ও সব হবে না।" আমি তাহার কোটের আস্তিনটা ধরিয়া

টানিয়া আনিয়া কহিলাম, "তোকে দাঁড়াতেই হবে, আমি এই গাছটা জরিপ করবো" বলিয়া এক লম্ফে আমি তাহার স্কন্ধে উঠিয়া পড়িলাম। গাছ সে কখনো জরিপ করে নাই, কি করিয়া নারিকেলগাছ জরিপ করিতে হয়, আমার নিকট তাহা শিখিয়া লইবার জন্যই বোধ হয় সে অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি তাহার স্কন্ধে উঠিয়াই একটি নেয়াপাতি ডাব ধরিলাম ও অবিলম্বে পকেট হইতে পূর্ব্ব-সঞ্চিত ছিদ্র করিবার যন্ত্রটি বাহির করিয়া উহাতে একটি ছিদ্র করিয়া ফেলিলাম এবং সেই ছিদ্র-মুখে পাকাটির পাইপ বসাইয়া এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটুকু পান করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তাহাতেও তৃষ্ণা দূর হইল না, ঐরূপে আর একটি ডাবের সমস্ত জল পান করিয়া নামিয়া পড়িলাম ! নামিবার পূর্ব্বে ডাব দুইটির তলদেশে আর একটি করিয়া ছিদ্র করিয়া দিলাম।

আমি নামিয়া বলিলাম, "কেমন মোহিনী, গাছ জরিপ করা শিখলি ?" মোহিনী একগাল হাসিয়া কহিল, "শিখলুম, কিন্তু যদি কোন রকমে প্রকাশ হয়।"

আমি জোরের সহিত বলিলাম, "কোন ভয় নেই, গাছের ডাব গাছেই আছে—তুই একবার জরিপ করে আয়।"

বিকারগ্রস্থ রোগীর সম্মুখে শীতল বারি ধরিয়া দিলে যেমন তাহার প্রাণটা আনন্দে ভরিয়া উঠে, জরিপের কথায় বোধ হয় মোহিনীর তৃষ্ণাক্লিষ্ট প্রাণটাও তেমনি একটা মধুর আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই সে কোন আপত্তি না করিয়া আমার স্কন্ধে উঠিয়া জরিপ করিতে লাগিয়া গেল। পরে দুইটি ডাবের জল নিঃশেষ করিয়া আমার কথামত উহাদের তলদেশে আর একটি ছিদ্র করিয়া নামিয়া পড়িল।

ক্রমে আমাদের পার্টির সমস্ত লোক—ইস্তেক চেনম্যান পর্য্যন্ত জরিপ করিতে উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে দুই কাঁদি ডাবের জল শেষ হইয়া গেল, কিন্তু একটিও ডাব স্থানভ্রষ্ট হইল না। আমাদের পার্টির সকলকেই বলিয়া দেওয়া হইল একথা যেন কোনরূপে প্রকাশ না পায়। কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখিতে পাইলাম যে অন্যান্য পার্টিতেও আমার প্রদর্শিত জরিপের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। ইহার ফলে তিন মাসের মধ্যে তিন শত গাছের ডাবের জল শেষ হইয়া গেল—ছিদ্রযুক্ত ডাবগুলি কিন্তু যথাস্থানে সজ্জিত রহিল। বর্ষা সমাগমে আমাদেরও জরিপের কার্য্য শেষ হইয়া আসিল।

৩

রথের সময় মাহেশে ডাব পাঠাইবার জন্য বিশু মণ্ডল ডাব পাড়াইতে আরম্ভ

করিল। কয়েকটা গাছের ডাব পাড়া হইলে ডাব দেখিয়া বিশু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া একঝোড়া ডাব মাথায় করিয়া আমাদের প্রিন্সিপ্যাল মরলি সাহেবের নিকটে আসিয়া ঝোড়া নামাইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাহেব বড় সদাশয়, তিনি বিশু মণ্ডলকে বহু দিন হইতে জানিতেন। বিশুর ক্রন্দনে তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন; পরে নম্রস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বিশু তোমার কি হয়েচে, কাঁদ্‌চ কেন?"

বিশু জোড়হস্তে কহিল, "সাহেব আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে—সমস্ত ডাবের জল পোকায় খেয়ে গিয়েছে। আমি খাজনা দেব কোথা থেকে? এই দেখুন সাহেব পোকা একদিক দিয়ে ঢুকেছে আর একদিক দিয়ে বেরিয়েছে," বলিয়া, বিশু কয়েকটি ডাবের ছিদ্রগুলি সাহেবকে দেখাইয়া দিল।

সাহেব দেখিলেন সত্য সত্যই পোকা একদিক দিয়া প্রবেশ করিয়াছে ও অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। সাহেব বিশুকে কহিলেন, "যাতে তোমার এবৎসর খাজনা দিতে না হয় সেজন্য গবর্ণমেণ্টকে লিখব—আর আমি এই পোকার তদন্ত করচি—যত ডাব পাড়া হয়েছে সব এখানে রেখে যাও"।

সাহেবের কথায় বিশুর ধড়ে প্রাণ আসিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সে প্রায় একশত ডাব সাহেবের বারান্দায় জমা করিয়া দুই হস্তে সাহেবকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে সাহেব তিনপাতা রিপোর্ট লিখিয়া একঝোড়া নারিকেল সমেত তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ব্যাকট্রলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে পাঠাইয়া দিলেন। এক সপ্তাহ পরে রিপোর্টের এইরূপ জবাব আসিল:—"আমরা যথেষ্ট যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়া ডাবগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। বাস্তবিকই কোন পোকা উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া কিছুদিনের জন্য বাস করিয়াছিল। ক্রমে যখন পোকাটির আহার্য্য শেষ হইয়া আসিল, তখন সে অপর দিকে আর একটি ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে; কারণ প্রথম ছিদ্র-পথটি তখন ক্রমে বুজিয়া আসিতেছিল। আমাদের অনুমান, ইহা ফিজমিংটন জাতীয় কোন পোকা হইবে। নারিকেলগাছ হইতে একজোড়া পোকা ধরিয়া অনুগ্রহ করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিবেন; তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে আমাদের অনুমান কতদূর সত্য হইয়াছে। পোকার আক্রমণ হইতে গাছ ও ফলগুলিকে

রক্ষা করিতে হইলে অন্তত গাছের অর্দ্ধেকটা ছাই দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে। তাহা হইলে পোকা আর গাছে উঠিতে পারিবে না।”

হাবড়ার ময়দার কল হইতে গাড়ি গাড়ি ছাই আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং ঐসকল ছাই গাছের গায়ে লাগাইয়া দিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত হইল। ঐ সকল লোকদের বলিয়া দেওয়া হইল যে,তাহারা দেখিতে পাইলেই যেন একজোড়া পোকা ধরিয়া আনে। এই কার্য্যে সরকার বাহাদুরের দুই শত টাকা খরচ হইয়া গেল, কিন্তু কেহই একটিও পোকা ধরিয়া আনিতে সক্ষম হইল না।

সাহেব এইবার পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। যে একজোড়া পোকা আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

এই সময় আমি একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে একটা সজিনা গাছে কয়েকটা “মাল পোকা”দেখিতে পাইলাম। উহার মধ্য হইতে দুইটি বড় বড় পোকার পায়ে সূতা বাঁধিয়া সাহেবের নিকট আনিয়া হাজির করিলাম। উহাদের যে কোন্ নারিকেলগাছ হইতে ধরিয়াছি তাহাও সাহেবকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। সাহেব পোকা দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। আমি বহু কষ্টে উহাদের গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছি শুনিয়া সাহেব আমাকে পুরস্কারের টাকা দিবার জন্য ক্যাসিয়ারকে বলিয়া দিলেন।

সাহেব পোকাদুইটি লইয়া ব্যাকট্রলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উঁহারা পরীক্ষা করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাদের অনুমান মিথ্যা হয় নাই। ইহারা অনায়াসে শক্ত কাঠে ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। ইহারা অনায়াসে ইহাদের শরীরের ওজনের দশ গুণ ভারী দ্রব্য তুলিতে পারে। পোকাদুইটির বিষয় সবিশেষ জানিবার জন্য আমরা উহাদের মিউজিয়মের অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইলাম। তিনি আবার উহাদিগকে জুলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের বড় সাহেবের নিকট পাঠাইলেন, কয়েকদিন পরে উভয়ে এক মত হইয়া পোকাদুইটির উপর এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন— “ইহাদের আদিম নিবাস মেক্সিকোর জঙ্গলে, কিন্তু সেখানকার পোকাগুলি এই পোকা অপেক্ষা অনেক বড়, এবং তাহাদের মস্তকের উপর একটি করিয়া খড়্গ আছে ইহারা শুষ্ক কাষ্ঠ খাইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বোধ হয় এখানকার জল-হাওয়া অনুযায়ী ইহাদের আকৃতি ছোট হইয়া গিয়াছে ও খড়্গাটি খসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া কি করিয়া উহারা ভারতে আসিয়াছে এবং কতকাল এখানে বসবাস করিতেছে

তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া এখানকার একটা মিটিংয়ে এই পোকা সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।"

৪

তখন সঙ্ঘে ক্লাবে আমার পোকা সম্বন্ধে একটা তুমুল আলোচনা চলিতেছিল। আমাকে ক্লাব-গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই নরেশ কহিল,—"এই যে মাসী এসেছ তোমার পোকার কথাই হচ্ছিল। খুব খেলাটা খেল্‌লে বাবা—"

নরেশের কথায় বাধা দিয়া উপেন কহিল, "ওসব কথা থাক, এখন কাজের কথাটা আগে করে ফেলা যাক। দেখ ভাই মাসী, 'মালপোকা' বেচে সাহেবের কাছে যে পঞ্চাশটা টাকা আদায় করলে, সে টাকা তোমার ভোগে সইবে না। ক্লাবে এনে জমা দাও একদিন খ্যাঁটের বন্দোবস্ত করি। কি বল বসন্ত।"

বসন্ত আমার পানে একবার কটাক্ষপাত করিয়া কহিল,—"মাসী এ কথায় আর দ্বিরুক্তি কোরো না ভাই, সুন্দর প্রস্তাব হ'য়েছে এতে সকলেই খুসী হবে।"

আমি জোরের সহিত প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, "এ টাকার একটি পয়সাও আমি দিতে পারব না—আমার অন্য খরচ আছে।"

বসন্ত কহিল, "তবে তোমার সকল কীর্ত্তি কিন্তু প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন আমাদের দোষ দিয়ো না।"

আমি বলিলাম, "বসন্ত তুমি যে বড় শাসাচ্চ, তুমি কি গাছ জরিপ কর নি ?"

"করেছিলুম বটে, কিন্তু শিখিয়েছিল কে ?"

"কে তা আমি কি জানি।"

"তবে কি মোহিনীকে ডাকব—সে এসে সাক্ষী দেবে।"

"ডাকতে হয় ডাক, আমি কিন্তু একটি পয়সাও দেব না; প্রকাশ কর সকলকেই শাস্তি পেতে হবে। আমি তো আর একা নই।"

উপেন কহিল, "তবে তুমি টাকা দেবে না ?"

আমি কহিলাম 'না'।

৫

আমাদের গুণের ঘাট নাই, একতার সীমা নাই। সত্যসত্যই একদিন একথা মরলি সাহেবের কানে উঠিল। তিনি আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সকলেই বুঝিল আজ একটা হুলুস্থূল কাণ্ড হইবে। অনেকের বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

আমি সেলাম করিয়া অপরাধীর ন্যায় এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সাহেব স্বদেশী ভাষায় গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "তোমার নাম পরেশচন্দ্র ঘোষ।"

আমি কহিলাম "আজ্ঞে হাঁ।"

"যখন তুমি সার্ভে পার্টিতে নিযুক্ত ছিলে তখন কি তুমি কোন অস্বাভাবিক উপায়ে ডাবের জল খেয়েছিলে?"

আমি বিনীতভাবে কহিলাম—"কেবল আমি নই, যারা সার্ভে পার্টিতে নিযুক্ত ছিল তারা সকলেই খেয়েছিল।"

"তুমিই কিন্তু তাদের পথ দেখিয়েছিলে।"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তবে পোকায় খায়নি—তোমরা পাঁচজনে মিলে খেয়েছ, কেমন?"

আমি পুনরায় মৃদুস্বরে কহিলাম "আজ্ঞে হাঁ।"

আমার কথায় সাহেব যেন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তিনি গালে হাত দিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি জান, এই ডাবের পোকা সম্বন্ধে আমি গবর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট করেছি, ব্যাকট্রলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে পরীক্ষার জন্যে কতকগুলা ডাব পাঠিয়ে দিছলুম—তারা পরীক্ষা করে বলেছিল কোন পোকায় ডাবের জল খেয়ে ফেলেছে। তারা দেখবার জন্যে একজোড়া পোকা চেয়ে পাঠায়। আমি যখন পোকা ধরবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করলুম তখন তুমিই একজোড়া পোকা এনে দিয়েছিলে। যখন তুমি জান্‌তে যে পোকায় জল খায়নি তখন কেন তুমি পোকা ধরে আনলে, এই তোমার আর একটি অপরাধ।"

আমি কুণ্ঠিতভাবে কহিলাম, "আমি জানতুম না আপনি পোকা নিয়ে কি করবেন। আপনি পোকা চেয়েছেন আমি গাছ থেকে একজোড়া পোকা ধরে এনে দিয়েছি, এতে আর আমার অপরাধ কি?"

"তুমি জান ঐ পোকা ক্রমে ব্যাকট্রলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট থেকে মিউজিয়মের অধ্যক্ষের নিকট যায়—তিনি একটি বিশেষ সভা আহ্বান করেন, সেই সভায় প্রফেসার জন্‌সন্ এই পোকার বংশ-তালিকা পাঠ করেন—আর কেমন করে কতদিনে এই পোকা ভারতে এসেছিল সে কথা বিশেষরূপে বর্ণনা করেন। আর আমি ঐ পোকা পাঠিয়েছিলাম বলে' সভাস্থলে আমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দেন। মিউজিয়মের অধ্যক্ষ মহাশয় এখন সিঙ্গাপুর, সিলোন ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি নারিকেলগাছ-বহুল স্থান সকলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত স্থানের নারিকেল কখন এই পোকার দ্বারা আক্রান্ত হ'য়েছে কিনা।

এখন বুঝতে পারলাম আমাদের সকলই ভুল। আর এই ভুলের মূল তুমি। আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি বটে, যেহেতু তুমি আমাদের এতগুলা লোককে ঠকিয়েছ কিন্তু তোমার এই অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারি না। আমি তোমার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করলাম।

*　*　*　*　*

পরদিন পুরস্কারের পঞ্চাশ টাকা জরিমানারূপে ফেরত দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

উদ্বোধন

ওরে তুই উঠে আয় ছাড়ি এ অলস আধ ঘুম-ঘোর,
কল্পনার আর কত ছবি আঁকিবিরে নিত্য প্রাণে তোর।
নবীন উৎসাহ-স্রোত ওই ধেয়ে এল তোর পারে—
আলস্যে রহিবি আনমনা, না মিশিয়া এ পূর্ণ জোয়ারে!
ওঠ্ ওরে দৃঢ়, বাঁধ্ বুক কর্ম্মক্ষেত্রে হ'রে আগুয়ান,
বিশ্বহিত-পুণ্যব্রত নেরে তুলি সাম্য-বিজয়-নিশান!
সঙ্কীর্ণতা-আগোড় ভাঙিয়া মুক্ত কর্ হৃদয়-তোরণ!
শুচিমনে নির্ব্বিকারে কর্ উচ্চনীচ সবে আলিঙ্গন!
বিশ্ব-ঋত্বিকের ঋক্ মন্ত্রে আজি নবদীক্ষা নিয়া
শাশ্বত বিবেক-ভাত জ্ঞান-দীপ হৃদয়ে জ্বালিয়া
ধ্রুব সত্য স্থির লক্ষ্য রাখি অহর্নিশ ডাক অবিরাম
বিরাট পুরুষ জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত আনন্দ প্রাণারাম!
সীমা-ঘেরা ক্ষুদ্র গৃহ ছাড়ি বিপুলের নেরে পরিচয়,
অবাধ চিত্তের তোর আজি পৃথ্বীসনে হোক্ সমন্বয়!
ওগো বদ্ধ, অলস, উদাস, হোক তোর সার্থক জীবন,
বিশ্বপ্রেম-বীজমন্ত্রগানে জাগি' প্রাণে নব উদ্বোধন!

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

অবদান*

অবদান—পুণ্যকর্ম্ম। কর্ম্মকে তখনই পুণ্য বলা যায়, যখনই তাহার প্ররোচনায় কতকগুলি পবিত্রতার জীবন্ত ছবি আমাদের নয়নোপান্তে প্রতিভাত হয়,—কতকগুলি ঐকান্তিক প্রেমের, অপরিসীম জ্ঞানের ও জীবন-মরণ-মাখা ভক্তির তিলোত্তমা-মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই—বুঝিতে পাই এবং দেখিয়া-বুঝিয়া মুগ্ধ হইতে পাই। পুণ্যকর্ম্মের পরিচয় কাহাকেও দিয়া দিতে হয় না,—"হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং" তাহা আপনা আপনি লোকনয়নের লক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়,—'মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাষঃ" আপনা আপনি তাহার জ্যোতির্ভাতি পৃথিবীকে অধিকার করে। তাই পুণ্যকর্ম্ম জগতে অমোঘ—অনবদ্য। তাই ইহা ভূমা !!

তবে কথা এই যে, বর্ত্তমানে সাহিত্যজগতের এমনি অবস্থা যে, নূতন কোনো পুস্তক প্রকাশিত হইলে কেহই তাহা পড়িতে প্রয়াস পান না, যদি না তাঁহারা লেখকের সম্যক্ পরিচয় জানিতে পান। আজকাল "ধারে"র চেয়ে তাই "ভারে"ই জিনিস অধিক কাটে। গ্রন্থকার যদি সাহিত্য-সমাজের কোনো একটি বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত না হন, তবে কি আর বিড়ম্বনার সীমা আছে ? কিন্তু তা' বলিয়া যে গুটিকয়েক টেনে-বড়-করা লেখক ব্যতীত অপর কেহই লেখনী ধরিতে পারিবে না, এমন তো কোনো কথা নাই। কিংবা লেখনী ধরিলে প্রথিতযশা মনীষিগণ ভিন্ন অপর সকলেই রাবিস উদ্গীরণ করিবে, তাহারো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এই introductionএর রাজত্বে ভয়ে এবং লজ্জায় "অবদানের"ও পরিচয় দিতে অগ্রসর হইতে হইতেছে। ইহাতে কৃতিত্ব আমার এ ছাড়া আর কিছুই নাই যে, শুধু অবদানের শাশ্বত লোকবিশ্রুতির গৌরব উপভোগে আমার ধৃষ্টতাবহুল অধ্যবসায়ের সকল আয়োজন নিযুক্ত করিয়া পূর্ণ আত্মপ্রসাদে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব।

বলিয়াছি তো, পুণ্যকর্ম্ম নিজেই নিজের পরিচয় প্রদান করে; অথবা তাহার নিজের কোনো পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও লোকে প্রাণের মাঝে তাহার সকল পরিচয় বুঝিয়া লয়। আমরা তাই প্রাণের মাঝে "অবদানে"র পরিচয় পাই। বুঝিতে পাই, ইহার প্রকৃতি দুইটি;—এক সমবেদনা, অপর

* অবদান—সচিত্র কথাগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, ইণ্ডিয়ান প্রেস-এলাহাবাদ ও ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, ২২নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

তর্পণ! "ঠগী"—কাহিনীর প্রতি অক্ষরে লেখকের সমবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রতি পদবিন্যাসে সহানুভূতির গলিত অন্তর অশ্রুভরা ঢেউএর বোঝা তুলিয়া ছুটিয়াছে। আর তর্পণে তাঁহার সমস্ত প্রাণ তন্ময় হইয়া গিয়াছে! সে তর্পণ তাঁহাদের—যাঁহাদের দেশনিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রেমনিষ্ঠা, দীর্ঘ শত সহস্র যুগের জন্মের প্রারম্ভে জনসঙ্ঘের স্বচ্ছ জলে-আঁকা চকিত চোখের ঘন-উদ্বেগ আনিয়া দিয়াছে—তাঁহাদের নূতন-জাগা হৃদয়ের কূলভরা আনন্দহিল্লোল গড়িয়া তুলিয়াছে! সে তর্পণ তাঁহাদের,—একদিন সত্যহারা সন্দেহ-উদ্বেলিত মর্ম্মের মাঝখানে যাঁহাদের চরিত্র সত্যগুরুর অচল পাদবিক্ষেপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল; পথহারা ব্যথা-ব্যাকুলিত হৃদয়ের স্রোতের মাঝখানে যাঁহাদের জীবন এক স্বপ্ন-ঢাকা জগতের প্রাণস্পর্শী সুখ-চিত্রের মত জাগিয়া জাগিয়া নিভিয়া গিয়াছিল! সে তর্পণ তাঁহাদের, যাঁহাদের দীপ্ত, স্নিগ্ধ, চন্দ্রকরোপম উজ্জ্বল প্রভা একদা মালিন্যক্লিন্ন জগৎ উদ্ভাসিত করিলে বিশ্ববাসী ভক্তি আপূরিত কণ্ঠে প্রণিপাত করিয়া গাহিয়াছিল—

"তোমারি আলোকে রহিব জাগিয়ে অনন্ত বিভাবরী।",

প্রথম তর্পণ হকিকত রায়ের—যে তেজস্বী বালক জীবনদানে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্ম্মবীর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। "হিন্দুগণ এই অসাধারণ তেজস্বী বালকের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রাবি নদীর তীরে তাহার এক সমাধি-মন্দির স্থাপন করেন। অদ্যাপি তথায় প্রতিবৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিনে মহা সমারোহে একটি মেলা হইয়া থাকে।" এই মহাত্মার কাহিনী বর্ণনায় লেখকের যে সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমরা তাহার ঝঙ্কার পাই! আমাদেরও জোর করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

স্পেনের রূপলাবণ্যময়ী বিবিধ সদ্‌গুণের আধার ধর্ম্মপ্রাণা বালিকা "ইউলালিয়া"—যাঁহার অসীম ধর্ম্মানুরাগ, সকল দৈন্য, সকল লজ্জা ভক্তির স্রোতে ভাসাইয়া দেয়, তাহার বর্ণনা বড়ই প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। আমাদের এই আড়ম্বর-বহুল লুপ্তভক্তির দেশের সমক্ষে এইরূপ চরিত্র উপস্থিত করিয়া ধরিবার দরকার হইয়াছে,—যদি ভক্তি না থাকে, প্রাণ না থাকে,—

"তবে মিছে সহকার-শাখা,
তবে মিছে মঙ্গল কলস!"

এডওয়ার্ড-পত্নী মার্গারেট, সিরাজ-দয়িতা পতিগত-প্রাণা লুৎফউন্নিসা,

অনবদ্য সুষমার আকর অনতিবিকশিত অনাঘ্রাত স্বর্গীয় পবিত্র প্রসূন-প্রতিম কৃষ্ণকুমারী, ইহাদের জীবন্ত চরিত্র পাঠ করিতে করিতে ভক্তি ও বিস্ময়ে, আনন্দে ও গর্ব্বে অন্তঃকরণ ভরপুর হইয়া উঠে। মনে হয়, এমন ধৈর্য্য, এমন নির্ভরতা কি মানুষে সম্ভবে? কবে আমরা ইহাদের পূজা করিতে শিখিব! কবে দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, প্রেমের জন্য এমনই আত্মবিসর্জ্জন শিখিব? নিজেদের অমনই করিয়া গড়িয়া লইয়া বলিব—

"যদি দুঃখের বেশে এস কভু প্রভু, তোমারে নাহি গো ডরিব,
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করিয়া ধরিব।
গভীর তিমিরে ঢাকিলে বদন
তবুও তোমারে চিনিব রাজন্,
কৃতান্ত-বেশে এলে মোর পাশে চরণ ধরিয়া মরিব!!"

এই লেখকের ভাষায় এমন একটি স্বচ্ছ-সরল উদার প্রবাহ আছে, যাহা সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব, যাহা বর্ত্তমান অনেক তথাকথিত গ্রন্থকারের লেখার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থখানির "অবদান" নামটি যথার্থই অন্বর্থ হইয়াছে। এখন তাঁহার অবদানের যশঃ, তাঁহার ভাগ্যের ফল,—তাঁহার ফকিরের কথাতেই বলি—"মৌলা দেলায় দেতো মিল যায়!" তবে আশা করা যায়, বিপিন বাবু সাহিত্যসমাজপতিগণের নেক-নজর বা ভ্রূকুটির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নিজের পথে অগ্রসর হইবেন! প্রশংসা বা নিন্দার অনুরোধে নিজের আত্ম-প্রতিষ্ঠা বিসর্জ্জন দিয়া তিনি আজকালকার এই আবেশঢালা আধ্যাত্মিকতার তরল মোহে গা ঢালিয়া দিবেন না। তাঁহার ভক্তি, তাঁহার আন্তরিকতা যেন—

সরল সহজ আলোকে বাতাসে
শ্যামল ধরার বক্ষের পাশে
সব বাধা ঠেলি' আপনা প্রকাশে
সকল পূর্ণতায়!

অপমান অনাদরের ভিতর দিয়াই যেন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে!! তাঁহার তুলসীদাসের মুখেই তো শুনিয়াছি—

"তুলসী উহাঁ যাইয়ে যাহাঁ আদর না করে কোই।
মান-ঘাটে মন মরে রামকো স্মরণ হোই!!"

তাঁহারও যেন মান-ঘাটে মন মরিয়া ভগবানকে স্মরণ হয়!

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পুণ্যের আকর্ষণ, চিত্রের সৌন্দর্য্য, বর্ণনার মধুরতা ও ভাষার অনাবিল সলীল ভঙ্গী যদি ধারা ও রীতি প্রভৃতি রচনার পারিপার্শ্বিক সমস্ত বিবেচনার বিষয় ভুলাইয়া দিয়া আমাকে বস্‌ওয়েলের পরিচয়ে জনসনের মত (Lues Bosweliana) অন্ধ ও মুক্ত করিয়া ফেলিয়া থাকে, তবে সহৃদয় সুধীবৃন্দের নিকট সবিনয়ে এই পুস্তকখানি পাঠ ও বিচার করিবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া আমি এই নীরস-কঠোর সমালোচনার দায়ীত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সংগ্রহ ও মন্তব্য

গত পৌষ মাসের "নারায়ণ" মাসিক পত্রে আপত্তিজনক "ডালিম" গল্পের বিষয় আমরা গত ফাল্গুনের 'কুশদহে' উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহার পরেও তদপেক্ষা কুরুচিপূর্ণ লেখা "নারায়ণে" বাহির হইতেছে। তজ্জন্য কোন কোন সহযোগী তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু "নারায়ণ"-সম্পাদক হয় ত মনে করেন ঐ সকল প্রবন্ধ বস্তুত দোষনীয় নয়।

গত শ্রাবণ সংখ্যা "নারায়ণে" "হাসির দাম" (কথা নাট্য) একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। আমরা তাহার প্রথমাংশে বেশ্যালয়ের ঘৃণিত বর্ণনা পাঠ করিয়া চন্দনার বিষম দুর্গতির কথাগুলিতে মনে করিলাম যদিও ইহা অশ্লীল তবু যদি লেখকের এই উদ্দেশ্য হয় যে, বাস্তবিক শত সহস্র সত্যি-ঘরের চন্দনা প্রতিনিয়ত সমাজ-বক্ষে এইরূপ ঘোর দুর্গতি ভোগ করিতেছে, কিন্তু কেহই সেদিকে তাকায় না—সে দুঃখ কাহারো হৃদয়কে বিদ্ধ করে না—তবে আমরা জানি সাধারণের তাহাতে কোন হাত নাই। কিন্তু মনীষী মহাত্মাগণ কেন সেদিকে লক্ষ্য করেন না? তাই বলিতেছিলাম, লেখকের যদি এইরূপ লেখার উদ্দেশ্য হয় যে, এই পথে হৃদয়বান সাধু-হৃদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তবে তাহা কুরুচিপূর্ণ লেখা হইলেও তার একটা প্রয়োজনীয়তার দিক আছে। কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইলাম, দেখিলাম লেখার ভঙ্গী তাহা নয়,—এমন কি ঐ লেখার মধ্যে পাপের প্রতি ঘৃণা—পতিতার প্রতি সহানুভূতি জন্মাইতে পারে,এমন কোন মহৎ ভাব নাই,লেখকের সে শক্তিও নাই। যদি কোন সু ইচ্ছা লইয়া লেখক লেখনী ধরিয়া থাকেন—তবে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। ফলে ঐ লেখা জনসমাজের অত্যন্ত অহিতকরই হইয়াছে। অন্তত আমাদের ইহাই মত।

সহযোগিনী "বসুমতী"র রুচির পরিচয় ইতিপূর্ব্বে "কুশদহে" একটু আধটু দেওয়া হইয়াছে। কোথায় কাহার বৈঠকখানায় বাইনাচ হইয়াছে— কবে বারাঙ্গনা-থিয়েটারে দক্ষতার সহিত অভিনয় হইয়াছে—কখনো দেশমান্য ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গোক্তি—কখনো বা কাহারো কুঁকড়ার ছবি—সম্প্রতি সিংহের ছবি প্রকাশ করিয়া সহযোগিনী যে প্রকার সুরুচির পরিচয় দান করিয়া আসিতেছেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। এরূপ লেখার উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, ইহাতে কি কাগজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়?

সম্প্রতি গত ৪ঠা ভাদ্রের কাগজে সম্পাদকীয় প্যারায় আর একটি লেখা-সম্বন্ধে আজ উল্লেখ করিতেছি ;—

* "কলুটোলার সেন বংশের যখন পুরা বাহার—কেশবচন্দ্র যখন ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, তিন ঘোড়া এক হাতে চালাইয়া দেশে বিদেশে যশ লাভ করিয়াছেন ; তখন জন সাধারণের টাকার অ্যালবার্টহল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেকালে—আমাদের পাঠ্যাবস্থায় যখন —ইনিষ্টিটিউট হল, ওভারটুন হল হয় নাই—পরিষদের পাকা বাড়ীর স্বপ্ন কেহ দেখে নাই— থিয়জফীর থাম উঠে নাই—তখন বাঙ্গালীপাড়ায় সভা সমিতি—হয় শোভাবাজার রাজবাড়ীর নাট মন্দিরে, নহে ত এই অ্যালবার্ট হলে হইত। তখন সিঁড়ির উপর প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন প্রস্তর ফলকে দাতৃগণের নাম লিখিত ছিল। শেষে কিন্তু হলটি কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারীর পুত্রগণ নিজস্ব করিবার চেষ্টায় ছিলেন। এমন সময় কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ প্রভৃতির চেষ্টায় হল লইয়া মামলা হয়—শেষে হাইকোর্টের বিচারে হল সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।"

কৃষ্ণবিহারীর পুত্রগণ হলটি নিজস্ব করিবার চেষ্টায় ছিলেন, ইহাতে কেশব-চন্দ্রের অপরাধ কি? এই কথার সঙ্গে কেশবচন্দ্র "... ... তিন ঘোড়া এক হাতে চালাইয়া" কথার সম্বন্ধ কি? এ কটাক্ষপাত কি ভাব হইতে? কথাটা শুনিয়া ব্রাহ্ম-বিদ্বেষীরা খুব বাহবা দিবে বলিয়া না কি? ধন্যবাদ ঠাকুর!!

খৃষ্টোপাসক আমাদের খৃষ্টীয়ান বন্ধুগণের ধর্ম্মমত লইয়া আলোচনা করা আমরা বিশেষ কোন প্রয়োজন মনে করি না। তাঁহাদের "একদেশদর্শিতা ধর্ম্মমত" যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছে। তবে সহযোগিনী "সম্মিলনী" (একখানি খৃষ্টীয় মাসিক পত্রিকা) ভাদ্র সংখ্যায় "ব্রাহ্ম সমাজ ও সাধু পৌল" প্রবন্ধে তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুগণকে কিছু উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—"পল্লবগ্রাহিগণ এখানকার খানিকটা সেখানকার খানিকটা গ্রহণ করিয়া সত্যের সহিত অসত্যের,

আলোকের সহিত অন্ধকারের, এবং অমৃতের সহিত মৃত্যুর কম্প্রোমাইজ করিয়া প্রকৃত সত্যের পথ রুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করেন।” সহযোগিনী, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মর্ম্ম চূড়ান্ত রকমেই বুঝিয়াছেন। ঠিক যেন তিনি পঞ্চাশ বছর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুগণকে উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া মনে হয়, একটা কথায় আছে—“তুমি অপরের চক্ষে তৃণটি অন্বেষণ করিতেছ, কিন্তু নিজের চক্ষের কড়ি কাঠ দেখিতেছ না।”

কুশদহস্থিত যমুনা নদীর সংস্কার জন্য কত চেষ্টা হইল, কিন্তু যুদ্ধের গোলযোগের জন্য সেবিষয় চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। যাক্ সে কথা; আজ আর এক যমুনার কথা বলিতেছি—সে মাসিক পত্রিকা “যমুনা”—পত্রিকাখানি বাহির হইয়া দুই বৎসরের মধ্যে বেশ খরস্রোতে চলিতে লাগিল। হঠাৎ গত বর্ষের মাঝখানে একেবারে সে স্রোত বন্ধ হইয়া গেল। আমরা তাই মনে করিলাম, এ বুঝি নামেরই দোষ। তারপর আবার এই বৈশাখ মাস হইতে যমুনার প্রকাশ দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। কেবল তাহা নহে, লেখাগুলি ও গল্পগুলিও মন্দ হইতেছে না, যাহা হোক্ আমরা এখন আর যমুনার বিস্তৃত সমালোচনা করিতে চাই না, ঈশ্বর করুন কাগজখানি আবার নিয়মিতরূপে বাহির হইয়া মাসিকপত্র-সম্পাদকের কলঙ্ক দূর করুক।

শান্তিপুর হইতে প্রকাশিত সহযোগী “যুবক” নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন,—“শান্তিপুর অনাথ আশ্রমের জন্য বালক এবং বালিকা প্রাপ্ত হইলে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। সহৃদয় জনহিতৈষী মহাত্মাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই আশ্রমে অনাথ বালক এবং বালিকা পাঠাইলে আমরা যারপরনাই উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইব। তত্ত্বাবধায়ক অনাথ আশ্রম, শান্তিপুর—নদীয়া।”

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপালিটীর অনেক রাস্তা এই বর্ষাকালে খারাপ হয়। তজ্জন্য অধিবাসীগণের কষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে অভিযোগ আমরা শুনিতে পাই, এবং দেখিতেও পাই। কিন্তু গোবরডাঙ্গার মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত গোবরডাঙ্গা, খাঁটুরা হয়দাদপুর, সরকারপাড়া এবং গৈপুর গ্রামগুলিতে যেকয়েক মাইল রাস্তা আছে, প্রতি বৎসর তাহার যথোপযুক্তরূপে সংস্কার

করিতে হইলে যেপরিমাণ টাকার প্রয়োজন রাস্তার জন্য সে রূপ টাকা নাই। সুতরাং যেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাস্তা (মেন্ রোড) সেইগুলির মধ্যেও প্রতি বৎসর দু' একটির ভাল রূপে সংস্কার করিয়া, তারপর ছোট ছোট রাস্তার কিছু কিছু মেরামত হয়। এই কথা একদা চেয়ারম্যান মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে যখন চিনির কারখানা ছিল, তখন বিনামুল্যে যথেষ্ট খাব্‌রা পাওয়া যাইত। তাহাতে রাস্তাও বেশ মজবুত হইত কিন্তু এখন তাহার অভাবে ইটের পাঁজার তলার ঘেঁস-মাটী বা রাবিস কিছু কিছু মূল্য দিয়া লইতে হয়, অথচ তাহাতে রাস্তা খুব মজবুত হয় না। চিনির কারখানার দরূণ যে ট্যাক্স আদায় হইত সে আয়টি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। চেয়ারম্যান মহাশয়ের এই কথা সত্য। কিন্তু আমরা দেখিতেছি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন রাস্তা ঘাটের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে ভাল ছাড়া মন্দ নয়। ইহার কারণ কি ? আমাদের মনে হয় এখন ট্যাক্সের হার ক্রমশ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বহন করিবার শক্তিও সাধারণের মনে সহ্য হইয়াছে। দ্বিতীয়, সময়ের গতি অনুসারে এখন স্বাস্থ্য-তত্ত্ব-জ্ঞান ও তৎপ্রতিকার চেষ্টাও পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া যাইতেছে। যাহাহোক যথেষ্ট ট্যাক্স দিয়াও অধিবাসীগণের পথের কষ্ট পাইতে হয়, এদিকে মিউনিসিপালিটির টাকা নাই, এ অবস্থায় উপায় কি ?—আমাদের মনে হয় উপায় আছে ; প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য বৎসরে যে টাকা দেওয়া হয়, সে টাকা রাস্তার হিসাবে যথেষ্ট না হইলেও ঐ টাকাতেই যদি ওয়ার্ড-কমিসনার মহাশয়গণ কন্‌ট্রাকটারের উপর নির্ভর না করিয়া নিজে একটু খাটিয়া খুটিয়া—নিজ চক্ষে দেখিয়া,মাথা ঘামাইয়া যেমন নিজের বাড়ি মজুর খাটাইতে হইলে পরিশ্রম করেন, সেইভাবে রাস্তাগুলি মেরামত করান তবে অনেক সুবিধা হইতে পারে। নচেৎ কেবল নামের জন্য কমিসনার হইয়া, প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন না করিয়া সকল দোষ চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানের স্কন্ধে চাপাইয়া অবসর হইলে আর কি হইবে ? এবার খাঁটুরা পুরাতন বাজার হইতে চণ্ডীতলা বাঁমড়-ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তাটুকু অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে. স্ত্রীলোকদিগের স্নানের ঘাটে যাতায়াতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। কমিসনার মহাশয় একটু চেষ্টা করিলে কি সামান্য রাস্তাটুকু মেরামত হয় না ? এইরূপে সামান্য সামান্য রাস্তাগুলি একটু চেষ্টা যত্ন করিলে তবু মেরামত হইতে পারে ও তাহাতে পাড়ার মধ্যে দিন রাত চলাচলের যে কষ্ট তাহা কিয়ৎ পরিমাণেও লাঘব হইতে পারে।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"তোমারি নামে ফুটেছে ফুল,
গন্ধে প্রাণ করেছে আকুল,
যতনে গাঁথিয়া এনেছি মালা
আদর করে, একবার পর না।"

সপ্তম বর্ষ, } আশ্বিন, ১৩২২ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শারদ

আজি বরষের পরে প্রকৃতির দ্বারে এসেছে শারদ ঋতু,
তাই সুনীল গগনে স্নিগ্ধ পবনে উড়িছে অভ্র-কেতু।
আজি নদীর পুলিনে কাশের কাননে ক্ষিপ্রচামর দোলে,
কিবা সরসীর জলে ধীরে কুতূহলে হংস সারস চলে।
আজি ঝিল্লির তানে বল্লী-বিতানে মধুর কাঁশর বাজে,
নব ধান্য-শীর্ষে কত না হর্ষে শিশির-কণিকা রাজে।
বহে কমল গন্ধে পরমানন্দে আকুল সমীর ধীরে,
ওই শেফালি-কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে শুভ্র কুসুম ঝরে।
ধায় মধু-লোভে অলি গুঞ্জন তুলি' মালতী কুন্দ ফুলে,
গায় দোয়েল পাপিয়া পুলকে মাতিয়া শ্যামল কানন-তলে।
আজি জ্যোছনা-সিন্ধু পূর্ণ ইন্দু বিরাজে নৈশ গগনে,
প্রাতে উষার অরুণ হরিৎ কিরণ ছড়ায় বিশ্ব ভুবনে।
ওগো আজি এ শরতে মুগ্ধ প্রভাতে কত কি পড়িছে মনে!
ঝরে নয়ন-আসার বক্ষে আমার স্মরিয়া বিগত জনে॥

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ বিশ্বাস

সকল বিষয়েই সাধারণ ও বিশেষ অবস্থা আছে। সাধারণ হইতে বিশেষে কি প্রভেদ তাহা সহজেই অনুমেয়। সাধারণ,—যাহা সকলের মধ্যেই দেখা যায়, যাহা অপেক্ষাকৃত সুলভ, তাহাকেই সাধারণ বলা যায়। বিশেষ,—যাহা অল্পের মধ্যে প্রকাশ পায়, যাহার একটা নিজস্ব আছে, যাহা অন্য সকল হইতে কিছু পৃথক তাহাকেই বিশেষ বলা যায়। প্রত্যেক দিনের সাধারণ কাজের মধ্যে যেদিন বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে সেদিন বিশেষ দিন। তদ্রূপ ধর্ম্মসম্বন্ধে বা ঈশ্বর-বিশ্বাস-সম্বন্ধেও সাধারণ ও বিশেষ অবস্থা আছে।

ঈশ্বর-বিশ্বাস সাধারণ ভাবে প্রায় সকল নরনারীর মধ্যেই আছে। কিন্তু মানব জীবনের পক্ষে ঈশ্বর-বিশ্বাস যেপ্রকার গুরুতর বিষয়, তাহা সাধারণ ভাবে হইলে চলে না। সাধারণ বিশ্বাসে জীবন পবিত্র ও শান্তিপ্রদ হয় না। ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ভক্তি জীবনের সর্ব্বোপরি সর্ব্ব প্রধান হওয়া আবশ্যক। মানব জীবনের আর যত প্রকার কর্ত্তব্যপালন, সকলই যদি ধর্ম্মজীবনের অন্তর্গত হয়, তবে সে জীবন যেমন শান্তিপ্রদ হয় তেমন অন্যের পক্ষেও মঙ্গলদায়ক হয়।

অনেকে মনে করেন সংসার-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; অগ্রে সংসারের কর্ত্তব্যগুলি পালন করিবার চেষ্টা করা উচিত। এ কথা এক অর্থে সত্য; কিন্তু কর্ত্তব্য পালনের নামে যদি অভিমান ও সংসারাসক্তি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে জীবন ঠিক পথে চলিতেছে না। ভক্তি ও আসক্তি একত্রে থাকিবার স্থান কোথাও নাই। বিশেষ বিশ্বাসই ভক্তি-প্রেমের মূল। "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলংহিঃ"—ধর্ম্ম-বিশ্বাস যদি সারাজীবন সাধারণ ভাবেই রহিয়া যায় তবে বিষয়াসক্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে থাকে। আসক্তির জীবন শেষাবস্থায় আরো দুঃখজনক। যতদিন শরীর মন সতেজ থাকে ততদিন মানুষ আসক্তির মধ্যে থাকিয়া সংসারাসক্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়া যায়। তারপর যখন জীবন-সন্ধ্যায় আঁধার-যবনিকা পতিত হয়, তখন বড় ক্লেশ উপস্থিত হয়। হৃদয় মন ঐ আসক্তিতে এমন অভ্যস্থ হইয়া যায় যে, তখন মনের গতি পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আসক্ত চিত্তে বিশ্বাস ভক্তির স্থান থাকে না। এই জন্য

শাস্ত্র বা সাধু বলিয়াছেন,—"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ" যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবেক।

ধর্ম্মসাধনের মূলেও বিশেষ বিশ্বাস। বিশেষ বিশ্বাস হইতেই ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি হয়। সাধারণ বিশ্বাসে কোন সাধনের প্রয়োজন হয় না। সে কেবল একটা মানিয়া রাখা মাত্র। জীবনের সঙ্গে সে বিশ্বাসের সম্বন্ধ অতি অল্প। সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস জীবনের উপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। "দশজনে যা মানে আমিও তা মানি," এ কথার কতটুকু মূল্য ? সাধারণ বিশ্বাসে আর নাস্তিকতায় প্রভেদ অতি অল্প। অন্নের নাম জপ করিলে দেহে বলসঞ্চার হয় না, অন্ন ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিলেই বললাভ হয়। বিশেষ বিশ্বাস, জীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। পরিবর্ত্তিত জীবনে ধর্ম্মনিষ্ঠা উপস্থিত হয়। নিষ্ঠা, ধর্ম্মানুষ্ঠানে মতি আনয়ন করে। ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইতেই সাধন আরম্ভ। সাধনে জ্ঞানের বিকাশ হয়। সাধন ও জ্ঞানে জীবন গঠিত হয়। একটি গঠিত জীবন শত সহস্র লোকের মধ্যে ধর্ম্মভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। জগতে জ্ঞানীর সংখ্যা অল্প বটে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীর প্রভাব জনসমাজে কম নয়। ঈশ্বর-বিশ্বাসী সাধু ভক্তগণ বিশেষ বিশ্বাসের পথ ধরিয়াই ধর্ম্মজীবন লাভ করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে মানবের সাধারণ বিশ্বাস লইয়া চলে না। বিশেষ বিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন। জীবনে যাহা বিশেষ, তাহার স্থানই প্রথম। মানব জীবনে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের স্থান প্রথম হওয়াই প্রার্থনীয়; আর সকল কর্ত্তব্যপালন সেই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অন্তর্গত হইবে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির জীবনে আসক্তির স্থান প্রথম। ভক্তি ও বিশ্বাসের স্থান দ্বিতীয়, সুতরাং সে বিশ্বাস ভক্তির তেমন কোন মূল্য থাকে না।

শরতে

বরষা হইল অবশেষ
নাহি বর্ষে এবে ঘনচয়;
দম্ভোলী-নির্ঘোষে এবে আর
থেকে থেকে কাঁপে না হৃদয়।
শীত বায়ু থাকিয়া থাকিয়া
বহিতেছে হিয়া কাঁপাইয়া;

চপলার ক্ষীণতম হাসি
অধরে যেতেছে মিশাইয়া ;
—যেন বিষাদের হাসিটুকু !
দুই এক খণ্ড ধারাধর,
ম্লানমুখে ভাসা-ভাসা চোখে
যেতেছে বাতাসে করি' ভর ;
—যেন বারিধির নীল বুকে
ঝটিকান্তে শোভিছে তরণী !
এহেন শরত-আগমনে
নব সাজে সজ্জিতা ধরণী !
সুবিমল সুধাংশু গগনে
হীরার সরোজ-সম ভাসে ;—
সুনীল বিমান-হ্রদে মরি
নির্ম্মল কৌমুদী পরকাশে !
হ'ল দশদিক্ সুনির্ম্মল,
প্রস্ফুটিত শেফালিকা-রাশি ;
যাহে সুখে ভ্রমে শিলিমুখ ;—
আনন্দিত সবে দিবানিশি ।
হায়, আমি কাঁদি নিরন্তর,
খেদে প্রাণ মম যায় যায়,
মম হৃদে র'ল মলিনতা,
অন্তরে রহিল তম, হায় !
জলদের ঘন অশ্রুজল,
অনর্গল প্রবাহিত' যাহা,
গেল তাহা, কিন্তু মম অশ্রু
সমভাবে রহিল রে আহা !
বারিদ-হৃদয়-বিলাসিনী
রূপসী-দামিনী-প্রভানল
নিবিল, কেন রে বিরহাগ্নি
হৃদয়ের মম সুপ্রবল !

বরিষার সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ভীম প্রভঞ্জন-রূপে ছিল
প্রবাহিত যাহা অনুক্ষণ,
এবে তাহা কোথায় মিলিল!
জীবিতেশ-দরশন বিনা
ভয়ঙ্কর বিরহ-রোগেতে
অভাগীর দীর্ঘশ্বাস আরো
বহিতেছে প্রবল বেগেতে।
ধরণী কর্দ্দমশূন্যা এবে,—
শরতে আনন্দে বিকশিতা;
কিন্তু মম হৃদয়-ভূমিকে
অশ্রুনীরে করিছে প্লাবিতা॥
শারদীয় সুবিমল ইন্দু
কুমুদিনী-হৃদয়-রঞ্জন
ধরি' নিজ পূর্ণ অবয়ব
নভ-নীল-হ্রদে সুশোভন।
চকোরের মিটিল পিপাসা,
পিয়া তার কৌমুদী-অমৃতে
বহুদিন মরমে জ্বলিয়া;
—ক্ষোভানল না রহিল চিতে॥
মম হৃদয়-অম্বরোপর
কেন না হইল সমুদিত
আজিও হায় রে মরি দুঃখে
হৃদয়েশ-কিরণ-অমৃত!
বিষণ্ণ চকোর-মন কেন
এ দাসীর বঞ্চিত সে ধনে—
হায় রে মরমে মরি আমি
প্রাণেশ্বর প্রেম-সুধাপানে!
সরোবরে কুমুদিনী-চয়,
বিকাশিতা প্রেমেতে গলিয়া;

নিশিথিনী চারুশোভা ধরে
হৃদিসার প্রাণেশে দেখিয়া,
প্রেমোল্লাসে গদ গদ হ'য়ে
সুকুমার মুখাবগুণ্ঠন
মৃদু হাসি' উন্মোচন করি' !
—সুখস্রোত হৃদে অগণন।
মম মানস-সরসী-নীরে
আজো নাহি বিকশিত হয়,
বিহনে সঁপিনু যারে মন-
প্রাণ, আশা-কুমুদিনী-চয়।
অভাগিনী-চিত্ত-কমলিনী,
তুহিনের ধারা প্রতিদিন
নয়ন-আসার অবিরত
সম্পাতে শরীর মন ক্ষীণ।
হৃদয়েশ-দিবাকর বিনা—
অধিনীর মানসরতন,
কেমনে প্রফুল্ল বল রবে
মম চিত্ত-নলিনী-বদন !
না পারি ধৈরয ধরিবারে,
বিনা মম প্রাণনাথে হায়,
কারে বলি এ বিষম জ্বালা
অভাগীর কে আছে ধরায় !
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ যায়
স্ব স্ব কার্য্য সাধি অবনীতে,
আনন্দে মাতা'য়ে জীবগণে
জ্বালাইয়া এ অবলা-চিতে।
হায়, আজো মম মন-দুঃখ
প্রাণেশের বিরহ জ্বালায়,
সমভাবে পোড়াইছে হিয়া,
—আজো কাঁদি মরম-ব্যথায়।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

কর্ম্মচক্র

সরস্বতীর বর-পুত্র পরেশনাথের বিদ্যার পরিচয় দেওয়াই বাহুল্য। গত ষান্মাসিক পরীক্ষায় ইংরাজি ও গণিতের প্রশ্নের এরূপ উত্তর লিখিয়াছিল যে পরীক্ষক মহাশয় খুসী হইয়া পরেশনাথকে দুইটি বাগবাজারের সরস রসগোল্লা উপহার দিয়াছিলেন। পরেশনাথ উহা নির্জ্জনে উদরস্থ করিয়া স্বচ্ছন্দে হজম করিয়া ফেলিল। কিছুদিন পরে একখানি চিঠিসহ পরীক্ষার রিপোর্ট আসিয়া পরেশনাথের পিতার হস্তে পড়িল। উহা ডাকে আসিয়াছিল। পরেশনাথ ভাবে নাই যে, রিপোর্ট ডাকে আসিতে পারে, সে জানিত শিক্ষক মহাশয় উহা তাহার হস্তে দিবেন, আর সে উহার উচিত ব্যবহার করিবে।

পরেশনাথের পিতা পত্র পাঠে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কাষ্ঠ পাদুকা-হস্তে পরেশনাথের বিদ্যা-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পরেশনাথ সেসময় গভীর মনোনিবেশ পূর্ব্বক বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা পাঠে রত ছিল। পিতার পদশব্দে সহসা তাহার চমক ভাঙিল, সে সম্মুখে পিতার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া বইটার উপর তাড়াতাড়ি একখানা খাতা চাপা দিয়া, ভয়বিহ্বলচিত্তে কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"কি হয়েচে বাবা?"

"হয়েচে আমার মাথা আর মুণ্ড—আমি মাসে মাসে টাকা গুণচি, না ভস্মে ঘি ঢালচি! তোকে এই খড়ম-পেটা করে দূর করে দেবো।"

পরেশনাথ ভীত হইয়া অবনতমস্তকে বলিল,—"বাবা আপনি তো কখনো এত রাগেন না, আর আমি জানি না যে আমি এমন কি অপরাধ করেছি, যাতে আপনি আমাকে খড়ম পেটা করে দূর করে দেবেন।"

পরেশনাথের পিতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হস্তস্থিত রিপোর্টখানি ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া রসগোল্লা যুগলের কৈফিয়ৎ চাহিলেন।

পরেশনাথের ধড়ে প্রাণ আসিল। সে মনে মনে বলিল, বাঁচলুম এরি জন্যেই এত—না জানি কি একটা ভয়ানক কাজই বুঝি করেছিলুম!

পরেশনাথ একটু ইতস্তত করিয়া, দুইবার ঢোক গিলিয়া, একবার কাসিয়া, অস্ফুট-জড়িত-স্বরে কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলিতে লাগিল, "আমি তো তবু দুই Subjectএ পাশ হয়েছি—আমার মাষ্টার নেই, কিছু নেই, আর বোসেদের অমিয়—তার দুবেলা পড়াবার মাষ্টার আছে, তবুও সে চার Subjectএ ফেল

হয়েচে। আমার যদি অমন ঘরে-পড়াবার মাষ্টার থাকৃত তাহলে আমি First হ'তে পারতুম বলিয়া" পরেশনাথ বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিতে লাগিল।

এই কৈফিয়তেই পরেশনাথের পিতার সমুদয় ক্রোধটা বায়ু-বিতাড়িত মেঘ-খণ্ডের ন্যায় নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি হস্তস্থিত কাষ্ঠ পাদুকাখানি দক্ষিণ পদে সংলগ্ন করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া একটু স্নেহভরে বলিলেন,—"আর কাঁদ্‌তে হবে না—আমি পেটে না খেয়ে তোমার জন্যে মাষ্টার রেখে দেবো—ভাল করে মন দিয়ে লেখা-পড়া কোরো, যদি ভবিষ্যতে মানুষ হতে চাও; তা না কর, তোমার দশা ঐ কেলোর মতো হবে।"

কেলো চতুর্দ্দশ বর্ষীয় কৃষ্ণকায় বালক, সে পরেশনাথের বাড়িতে মাসিক দেড় টাকা মাহিনার চাকরি করে, সে ছেলে ধরে, তামাক সাজে, বাজার করে, ফাই ফরমাস খাটে।

পরেশনাথ অধোবদনে বসিয়া রহিল।

পরেশনাথের পিতা একটু নম্রস্বরে বলিলেন,—"এখন কি বই পড়ছিলে?"

পরেশনাথ তাড়াতাড়ি খাতার মধ্য হইতে একখানা কালো মলাটের বই বাহির করিয়া বলিল,—"ও খানা ইস্কুলের বই, (Casabinca) ক্যাসাবিয়ানকা মুখস্ত করছিলুম।"

পরেশনাথের পিতা একটু আগ্রহের সহিত কহিলেন, "কৈ একটু মুখস্ত বল দেখি শুনি?"

পিতার কথা শেষ হইতে না হইতেই পরেশনাথ আরম্ভ করিল।

"The boy stood on the burning deck,
Whence all but he had fled"

পরেশনাথের পিতা ভাবিলেন, বাঃ, ছেলেটার তো বেশ মেরিট্ আছে, একটু চেষ্টা করলেই কিছু করতে পারে। একটা মাষ্টার রাখা উচিত বটে। মুখে বলিলেন,—"বেশ আমি শীগ্‌গির তোমার মাষ্টারের বন্দোবস্ত করে দিচ্চি, খুব মন দিয়ে লেখা-পড়া কোরো।"

পরেশনাথের পিতা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। পরেশনাথ কপালকুণ্ডলায় মনোনিবেশ করিল, এবং মনে মনে বলিল, আজ একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

২

যথা সময়ে পরেশনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হইল। ইনি সন্ধ্যা সাতটা হইতে রাত্রি নয়টা অবধি পড়াইবেন। কিন্তু সাতটার সময় প্রায়ই তাঁহাকে

পরেশনাথের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত। পরেশনাথ বাটীতে আসিলে মাষ্টার বলিলেন,—"কিহে বাপু এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি যে তোমার জন্তে আধ ঘণ্টা বসে আছি?"

পরেশনাথ যেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"সেকি আপনি কি জানেন না যে আজ বিড্‌ন গার্ডেনে বিপিন পালের বক্তৃতা ছিল!"

"বিপিন পালের বক্তৃতা ছিল তা তোমার কি?"

"আপনি কি স্বদেশী নন্?"

"দেখ বাপু, আমি তোমার সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন করতে আসি নি; তোমাকে পড়াতে এসেছি, এখন যদি পড়তে ইচ্ছে হয়, তবে বই কখানা এনে একটু বোসো।"

পরেশনাথ আর বাক্য ব্যয় না করিয়া একেবারে বই খুলিয়া বসিয়া গেল।

মাষ্টার পাঠ ব্যাখ্যা করিয়া দিতে লাগিলেন পরেশনাথ মনে মনে বন্দে মাতরম্ গানটি আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মাষ্টার বলিলেন,—"এইবার বল দেখি আমি যা বলেদিলুম।"

"আর একবার বলে দিন, তা হ'লেই আমি আপনি বলতে পারবো।'

মাষ্টার পাঠ পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন—পরেশনাথ মানসচক্ষে প্রতাপ ও শৈবলিনীকে নদীবক্ষে ভাসিয়া যাইতে দেখিল। পরেশনাথ মনে মনে বলিল, ধন্য শৈবলিনী ধন্য প্রতাপ তুমি! আমারো জীবনে এমনি একদিন তো হ'তে পারে এমনি করে' শৈবলিনীকে নিয়ে আমিও তো একদিন নদীবক্ষে ভাস্‌তে পারি। কিন্তু কি দুরদৃষ্ট! আমি যে সাঁতার জানি নে—তবে কি সাঁতার অভাবে এমন একটা রোমাণ্টিক ঘটনা হতে বঞ্চিত হব! না, তা কখনই হবে না, সাঁতার শিখ্‌তেই হবে।

মাষ্টার বলিলেন,—"এইবার আপনি বলো দেখি, আমি আর বলে দেবো না।" পরেশনাথ বিনয় সহকারে কহিল,—"মাষ্টার মশাই, আর একটিবার বলে দিন।" মাষ্টার আবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

পরেশনাথ এই সময় ভাবিতে লাগিল, অন্ধকারে বাপীতটে বসিয়া কুন্দ অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, পার্শ্বে চোরের মতো ও কে আসিয়া দাঁড়াইল! নগেন্দ্রনাথ? ছি, নগেন্দ্রনাথ এমন চোরের মতো! মাষ্টার বলিলেন,—"এইবার বল?"

পরেশনাথ নিতান্ত ভালো মানুষের ন্যায় মাষ্টারের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। মাষ্টার ক্রোধপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"তুমি অতি গাধা,—তোমার

লেখা পড়া হবে না।" পরেশনাথ বিনীতভাবে বলিল,—"আজ্ঞে আমি বড় গাধা বলেই বাবা আপনাকে দশটাকা মাহিনা দিয়ে রেখেছেন।"

মাষ্টার বলিলেন তবে কি গাধা পিটে ঘোড়া করতে হবে।

পরেশনাথ আর কিছুই বলিল না, মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

যথাসময়ে মাষ্টার বিদায় হইলেন। পরেশনাথ অন্দরে প্রবেশ করিল। পরেশনাথের পিতা বলিলেন,—"পড়া-শুনা কেমন হচ্ছে এখন? এবারকার একজামিনে first হতে পারবে ত?"

"পড়া-শুনা হচ্চে মন্দ নয়, তবে first যদি নাই হতে পারি, Second third তো হবই।"

পরেশনাথের পিতা মনে মনে আনন্দিত হইয়া হস্তস্থিত হুকার সহিত সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

৩

যথাসময়ে পরেশনাথের মাষ্টার আসিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু ছাত্রের দেখা নাই। প্রায় সাড়ে সাতটার সময় পরেশনাথ হেলিতে দুলিতে গৃহে প্রবেশ করিল। সম্মুখে মাষ্টারকে দেখিয়া লজ্জিতভাবে বলিল,— "মাষ্টার মশাই কতক্ষণ এসেছেন?"

"আজ আবার কোথায় গেছলে?"

"আজ কোথায় যাইনি মশাই, এই Evening walk করে' হেদোর ধারে বসে হাওয়া খাচ্ছিলুম। শরীরটাকে তো রাখ্‌তে হবে', তা না হলে এত পরিশ্রম করে পড়াশুনা করবে কে?"

"বেশ বেশ এখন বক্তৃতা রেখে এদিকে এসে বোসো। তোমার হাতে ওটা কি বই?" এটা হ'ল আনন্দমঠ। আহা এ সময় যদি বঙ্কিম বাবু বেঁচে থাকতেন—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মাষ্টার ধমক দিয়া বলিলেন,—"দেখ আমি যখন-তখন তোমাকে নাটক-নভেল পড়্‌তে দেখ্‌তে পাই, আর তোমার নিজের পড়বার বইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই—এসব কথা আমি তোমার বাবাকে বলে দেবো।"

পরেশনাথ বিস্মিতভাবে বলিল,—"বলেন কি মাষ্টার মশাই, এসব বই না পড়লে মাতৃভাষার উপর দখল হবে কি করে? বাংলায় 'এসে' লিখবো কি করে? মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করব কি করে? এত বড় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠকি আপনার নিকট এতই ঝুটো হ'ল!"

"থাম থাম—আমি জানি তোমার কিছু হবে না, এক কলম লিখে দিতে পারি।"

"আমার যদি কিছু না হয় তার জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে—বাবার কাছে না হয় উপরওয়ালার নিকট তো বটেই।"

মাষ্টার স্বরটা একটু নরম করিয়া বলিলেন,—"দেখ পরেশনাথ এখনো তোমার বাৎসরিক পরীক্ষার তিন মাস বাকি আছে, এই তিন মাস যদি তুমি আমার কথা শুনে একটু মন দিয়ে লেখা পড়া কর, তা হলে আমি আশা করি, তোমাকে কোন রকমে পার করে দিতে পারবো।"

পরেশনাথ একগাল হাসিয়া বলিল,—"আচ্ছা মশাই কাল থেকে দেখ্‌বেন আমি কেমন পড়ি।"

মাষ্টার পরেশনাথের পিট্ চাপড়াইয়া বলিলেন,—"এইতো চাই A promising good boy, এখন বই ক'খানা নিয়ে একটু বোসো পড়াটা বলে দিই।"

পরেশনাথ বলিল,—"পড়াটা কাল থেকেই ভালো করে আরম্ভ করা যাবে। আজ আপনি সেই Waterlew battleএর descrpitionটা বলুন, আমি শুনি।"

মাষ্টার বকিতে লাগিল। ছাত্র ভাবিতে লাগিল—বারুণীর জলে রোহিণী ডুবিয়াছিল, আমি যদি গোবিন্দলাল হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিতাম! কল্পনার পটে সে আর্দ্রবসনা স্তিমিতনয়না আলুলায়িতকেশা রোহিণীর সদ্যঃস্নাত মুখপদ্মের মধুর ছবি আঁকিতেছিল।

মাষ্টার খানিকটা বকিয়া থামিয়া গেলেন। দেখিলেন ছাত্র গভীর চিন্তায় মগ্ন; বলিলেন,—"পরেশনাথ ভাব্‌ছ কি?"

পরেশনাথ চকিতে বলিয়া উঠিল। "ঐ আপনি যা বল্লেন সেইগুলো মনে মনে আবৃত্তি করচি।"

"তা বেশ অঙ্ক টঙ্ক কিছু কস্‌বে কি?"

"আজ রাত হয়েচে কাল থেকে সকাল-সকাল আরম্ভ করা যাবে।"

"তবে এখন আমি আসি। তোমাদের স্বদেশী চলচে কেমন?'

পরেশনাথ যেন বিদ্যাদেবীর কঠোর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ফাঁকায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পরে উল্লাস ভরে বলিল,—"স্বদেশী—স্বদেশী খুব ভালই চল্‌চে, এখন ট্রামে পর্য্যন্ত স্বদেশী চল্‌চে।"

মাষ্টার মনে মনে হাসিয়া বলিলেন,—"সে কি রকম?"

"গত বুধবার দশটার সময় আমাকে একবার clive street এ যেতে হয়েছিল, দেখলুম ট্রামে—Second classএর সাম্‌নে ও পিছনে বড় ভীড়, অনেক লোক দাঁড়িয়েছিল আমিও সামনে গিয়ে ঠেসাঠেসি করে' দাঁড়ালুম। গুনতিতে আমরা দশজন হলুম আমি ছাড়া সকলেই আপিসের কেরাণী। কিন্তু তখনো ভেতরে দুই চারিটি সীট্‌ খালি ছিল। বউবাজারের কাছাকাছি এসে, কণ্ডাকৃটর ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে টিকিট বাবু টিকিট বাবু বলে আমাদের দিকে হাত বাড়ালে একটি বাবু বল্‌লেন, আমরা সকলেই স্বদেশী। কণ্ডাকৃটর বল্লে, "না মশাই সে সব হবে না, যদি ইন্‌স্পেকটর ওটে তো মুস্কিল হবে।"

বাবুটি বল্‌লেন "ওটে তো রফা করে ফেলবে ?"

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"রফা রফা !"

কণ্ডাকট্‌র বল্লে "না মশাই ঐ কালো বেঁটে-মতন, মুখে বসন্তর দাগওয়ালা এক বেটা আছে, সে বেটা ভারি পাজি।"

এই কণ্ডাকটরের মনে স্বদেশ-অনুরাগ আছে বুঝতে পেরে, তার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হ'ল, আমি বললুম,—"ভাই হে তোমার নিবাস কোথায় ?''

"সে বল্লে বরিশাল।"

আমি বললুম,—"তবে তো তুমি আমাদের খাস স্বদেশী ভ্রাতা।" আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটি বন্দেমাতরম্‌ ব্যাজ বার করে' তার খাকি কোটের নম্বরেরনীচে পিন্‌ দিয়ে এঁটে দিলুম,আর হাতে আমার নামের একখানা কার্ড দিয়ে বল্লুম,—দু" এক দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, আমি তোমাকে আমাদের captianএর কাছে নিয়ে গিয়ে তোমার স্বদেশ-অনুরাগের পরিচয় দিয়ে তোমাকে আমাদের স্বদেশী ভলেনটিয়ারের লিষ্টে এনরোল্‌ড করে' রাখবো সামনে অর্দ্ধোদয় যোগ চাই কি তোমায় দরকার হতে পারে।"

কণ্ডাকটর দু' একবার হাঁ না করে বল্লে "আমি পিছনে টিকিট দিইগে, দেখবেন আমার লোকসান না হয়।"

সকলেই সমস্বরে বল্লে "কিছু না ! আমরা সকলেই স্বদেশী ?"

"লালবাজারের নিকট এসে দুটি ভদ্রলোক আস্তে আস্তে গা ঢাকা দিলেন। আর দুটি লোক ভিতর থেকে যারা নেমে যাচ্ছিল তাদের টিকিট দুখানি চেয়ে নিলেন। একটি ভদ্রলোক জানালা দিয়ে আমার পা ঠেলিতে লাগিলেন, আমি একটু নীচু হয়ে তাঁহার দিকে চাইতেই, তিনি কিছু না বলে তাঁর টিকিটখানি আমার হাতে দিয়ে নেমে পড়লেন।

"মাষ্টার মশাই দেখুন কেমন নিঃস্বার্থ পরোকার, কেমন একতার দৃঢ় বন্ধন। ট্রামের কণ্ডাকটর থেকে আপিসের বাবুদের প্রাণে পর্য্যন্ত কেমন এক জাতীয় ভাব, কেমন স্বদেশ-অনুরাগ জেগে উঠেচে বলুন দেখি ? আমার বিশ্বাস যদি এরকম একতা আর কিছু দিন থাকে, তা হ'লে আমাদের উন্নতি হবার সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতেই পারে না। মাষ্টার মশাই কি বলেন ?''

মাষ্টার মহাশয় ছাত্রের স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাইয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন ! মুখে বলিলেন,—"তার পর ?"

"তার পর গাড়ি যখন লালদিঘীর মোড়ে এসে দাঁড়ালো আমরা তখন সেই স্বদেশী কণ্ডাকটরের হাতে মাথা পিছু দু পয়সা হিসাবে পাঁচ-দ্বিগুণে দশ পয়সা দেওয়ায়, সে উহঃ পকেটজাত করে' সরে' পড়লো আমাকে ও আর দুজনকে পয়সা দিতে হয় নি, কারণ আমাদের টিকিট ছিল।

মাষ্টার আদ্যোপান্ত শুনিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,'—'পরেশনাথ কাজটা কি ভালো হয়েচে ? এটাকি ট্রাম কোম্পানিকে ফাঁকি দেওয়া হ'ল না ?''

"সেকি মশাই, তবে আর স্বদেশী কি হল ?"

"এরি নাম কি স্বদেশী ?"

"আজ্ঞা হাঁ, এটাও স্বদেশীর একটা দিক্" কোনো ভালো লোককে জিজ্ঞাসা করবেন !''

মাষ্টার মহাশয় ছাত্রের নিকট হার মানিয়া তাঁহার গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

(৪)

আজ পরেশনাথের বাৎসরিক পরীক্ষার প্রথম দিন। পরেশনাথের পিতা পরেশনাথকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, যদি সে এবার পরীক্ষায় সন্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তাহা হইলে তিনি তাঁহার কাষ্ঠপাদুকার সদ্ব্যবহার করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাহাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবেন।

পরেশনাথ তাহার অভীষ্ট দেবদেবীর নিকট পরীক্ষা-রূপ মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত কাতরহৃদয়ে প্রার্থনা করিল ও কিঞ্চিৎ পূজা মানসিক করিয়া বরাবরই স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পরেশনাথের কাতর প্রার্থনা তাহার অভীষ্ট দেবতার কর্ণে পৌঁছিল কি না, তাহা কে জানে ? তবে এরূপ স্বার্থপর প্রার্থনায় ইষ্টদেব তুষ্ট হন না।

বেলা এগারোটার সময় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের ন্যায় একে-একে সকলে আসিয়া sloping টেবিলের ধারে লাইনবন্দি হইয়া বসিল, কেবল লুচি আসিতে বাকি।

যোগেন্দ্রবাবু question paper রূপ লুচি পরিবেষন করিয়া গেলেন। পরেশনাথ সভয়ে কাগজখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। পাঠ করিয়া তাহার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। সে একবার এদিকে একবার ওদিকে চাহিয়া questionpaperখানি পকেট-জাত করিয়া অভুক্ত অবস্থায় পংক্তি হইতে উঠিয়া চম্পট দিল এবং সটান আসিয়া গোলদিঘীর সুন্দর শ্যামল তরুতল-শোভিত, স্নিগ্ধ সমীর-সঞ্চারিত নবঘন-দূর্ব্বাদল-রচিত চারু শয্যায় শয়ন করিল।

পরেশনাথ মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার পরিণাম চিন্তা করিল, সে বুঝিল মাষ্টারকে ফাঁকি দিতে গিয়ে আপনি ফাঁকে পড়িয়াছে। ইস্কুলে শিক্ষকের অগোচরে নভেল-নাটক পড়িয়া আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছে। কিন্তু এখন উপায় কি? সে মনে মনে বলিল "না বাড়িতে আর যাবো না, বাবাকে আর এ পোড়া মুখ দেখাব না। তিনি সকলের সাম্নে খড়মপেটা করে গলা টিপে বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন, সে অপমান আমার সহ্য হবে না। তার চেয়ে মরণ ভাল! পরেশনাথ সুখশয্যা ছাড়িয়া উঠিল। দেখিল পকেটে একটিমাত্র পয়সা আছে, সে সম্মুখের দোকান হইতে একখানি পোষ্টকার্ড আনিল ও পকেট হইতে পেনসিল বাহির করিয়া লিখিল :—

পরম পূজনীয়

বাবা, আপনি বলিয়াছিলেন এবারে পরীক্ষায় ফেল হইলে, সকলের সম্মুখে আমাকে খড়মপেটা করিয়া গলা টিপিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দিবেন। আমি দুরদৃষ্ট বশত এবারও ফেল হইয়াছি। আমি এ মুখ আর আপনাকে দেখাইব না, আপনাকে আর কষ্ট করিয়া আমাকে দূর করিয়া দিতে হইবে না, আমি নিজেই আপনার নিকট—আপনার নিকট কেন, পৃথিবীর নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া দূর হইয়া যাইতেছি। আপনি আমার শেষ প্রণাম জানিবেন, ও মাকে আমার শেষ প্রণাম জানাইবেন। ইতি

সেবক—

শ্রীপরেশনাথ ঘোষ।

পরেশনাথ শীরোনামা লিখিয়া পোষ্টকার্ডখানি নিকটস্থ post boxএ ফেলিয়া দিল। তারপর মনে মনে ভাবিল এখন যাই কোথা, করি কি? বাড়িতে যাওয়াই হবে না, এমুখ বাবাকে দেখাব কি করে' চিঠিতে লিখলুম "আমি পৃথিবীর নিকট হইতে চিরবিদায় লইতেছি" এখন আমাকে মরণের পথে অগ্রসর হতে হবে।

পরেশনাথ একটা প্রাণ-খালি-করা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আশাহীন লক্ষ্য-হীন হৃদয়ে পাগলের মতো উদাসভাবে চলিতে লাগিল। সে জানে না কোথায় যাইতেছে। সে অনেকক্ষণ চলিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল দাঁড়াইয়া ব্যাকুলনয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, দেখিল স্থানটি তাহার পরিচিত বাগবাজারের খালধার। পরেশনাথ সংসারের নির্দ্দয় কশাঘাত বক্ষে লইয়া সেই খালধার বহিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। ক্রমে গঙ্গা ও খালের সন্ধিস্থলে আসিয়া একটি বৃক্ষ-তলে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল। এই স্থানটি পরেশনাথের পূর্ব্বপরিচিত মধুর রমণীয় স্থান। সংসারের অনবরত ঘাত-প্রতিঘাতে যখন তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িত, তখন সে ইহার স্নিগ্ধ-শীতল শ্যাম ছায়ায় বসিয়া প্রকৃতির স্নেহময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সব ভুলিয়া যাইত। তখন তাহার হৃদয়ে আনন্দের শত উৎস উথলিয়া উঠিত, তখন সে জীবনের সার্থকতা অনুমান করিতে পারিত।

এখনো শ্রান্ত রবির কনক-কিরণ সৌধশিখরে, গাছে পালায় ঝিকি-মিকি করিতেছে, এখনো বৃক্ষ-শাখায় দূরাগত বিহঙ্গের কলকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার তরঙ্গায়িত—তরঙ্গিণীর অবিশ্রান্ত কল কল ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছে। মাঝিমাল্লা, কুলিরা এখনো স্নান করিতেছিল। অদূরে দুই চারিখানি ছোট-বড় নৌকা পালভরে ভাসিয়া যাইতেছিল, দুই চারিটি ছোট পাখী, তরঙ্গের উপর ক্রীড়া করিতেছিল। এখনো পশ্চিমাকাশের রাঙা মেঘের বিচিত্র ছবি জাহ্নবীর তরঙ্গে-তরঙ্গে প্রতিফলিত হইতেছিল! মুক্ত সমীর উন্মনা হইয়া বহিতেছিল!

পরেশনাথ সব দেখিল। পূর্ব্বে যেখানে বসিয়া যাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইত, আজ সে সেই স্থানে বসিয়া তাহাই দেখিল, কিন্তু মুগ্ধ হইল না! পরেশনাথ চক্ষু চাহিয়া বসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু আজ দীপ্তিহীন, দেখিবে কে? তাহার হৃদয়খানা নিবিড় আঁধারে ঢাকা, সে বাহ্য জগতের কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার প্রাণটা যেন কোন্ একটা অচেনা জগতে চলিয়া যাইতেছে—আবার ফিরিয়া আসিতেছে—আবার মুহূর্ত্তে চলিয়া যাইতেছে সে এখন এই মধুর জগৎ শূন্য দেখিতেছে। হায়! আজ তাহাকে দুটো কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই! এমনি যেন শূন্য এ সংসার!

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

চন্দ্রনাথ ভ্রমণ

চট্টগ্রাম জেলার সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনেচ্ছা অনেক দিন হইতে অন্তরে জাগরূক ছিল। হঠাৎ সময় হইল। গত ১১ই ফাল্গুন সোমবার শিবরাত্রি-উপলক্ষে তৎপূর্ব্বদিবস রবিবার শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে সীতাকুণ্ডের টিকিট্ কিনিয়া প্রাতে ৭টার ট্রেণে চট্টগ্রাম মেলে রওনা হইলাম।

বহু ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় একটার সময় ট্রেণখানি গোয়ালন্দ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। এখানে জলযোগ সারিয়া লইলাম। এই ট্রেণের যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য ঘাটে ষ্টীমার প্রস্তুত ছিল। কাজেই আর বিলম্ব না করিয়া লগেজ পত্র লইয়া তখনই ষ্টীমারে উঠিতে হইল। ষ্টীমার গোয়ালন্দ ছাড়িয়া পদ্মার বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে আরোহীবৃন্দকে নীলাকাশ ও নদীজলের অপূর্ব্ব শোভা দেখাইতে দেখাইতে চাঁদপুর ষ্টেশনাভিমুখে চলিল। পথে বিশ্রামের জন্য কেবল মাত্র দুইটি ষ্টেশনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। পদ্মাবক্ষে ত্রিতল ষ্টীমারে থাকিয়া মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। দেখিলাম বিশাল নদী প্রায় ২।৩ ক্রোশ বা ততোধিক বিস্তৃত। এই বিস্তীর্ণ স্রোতের প্রচণ্ড বেগ জলরাশিকে বিঘূর্ণিত করিয়া তুলিতেছে এবং তরঙ্গের অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ ফেনিল হইয়া সশব্দে ভীমবেগে নদ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে। সেই ভীষণ স্রোতের প্রতিকূলে এই বহুজনপূর্ণ ষ্টীমারখানি পদ্মার স্ফীত বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উজান বহিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে সদর্পে চলিয়াছে।

ষ্টীমারে সামান্য একখানি খাবারের দোকান আছে, বড় বড় ষ্টেশন হইতে খাবার সংগ্রহ করিয়া তাহাই দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করে। ডেকের উপর আসিয়া দেখিলাম, দুইটি কুম্ভীর ষ্টীমারের কিঞ্চিৎ দূরে ভাসিতেছে। ষ্টীমার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র জলে ডুবিয়া গেল। কয়েকখানি ছোট নৌকা তরঙ্গের হিল্লোলে হেলিতে দুলিতে চলিয়াছে দেখিয়া মনে হইল মাঝিদিগের কেমন অটল বিশ্বাস, অপূর্ব্ব নির্ভরতা! একবার আমার মনে হইল এইবার বুঝি ডুবিল, কিন্তু কই ডুবিল না তো। ডুবিতে ডুবিতে ভাসিয়া আবার বেশ সহজভাবে চলিতে লাগিল, দেখিয়া আমার ভীতি পূর্ণ হৃদয় স্থির হইল।

এইবার পশ্চিমাকাশের শেষ প্রান্তে আমার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, বর্ণ-

বৈচিত্র্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ! কি জানি কোন্ শিল্পী বিশ্বসংসারের সৌন্দর্য্য-সম্ভার একত্র করিয়া তাঁহার নিপুণ হস্তের সূক্ষ্ম তুলিকায় গগনের গায়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। লাল-হরিতের মাঝে মাঝে সোনার তবক বিছাইয়া দিয়াছে। কালো মেঘের তলে তলে সাঁচ্চার পাড় বুনিয়া দিয়াছে। রক্ত রবি তখন ম্লান হইয়া গগনতলে নামিয়া আসিয়াছে। সে দুর্ব্বল তেজহীন চলৎশক্তি-রহিত, তাই বুঝি এতটুকু হইয়া, মলিন সঙ্কুচিত-দেহে পদ্মার বিশাল বক্ষে আত্মসমর্পণ করিতে চলিয়াছে। বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম দীপ্তিহীন ম্লান সূর্য্য পদ্মার নীল জলে ঝিকি মিকি করিতে করিতে স্নিগ্ধ-শীতল তরঙ্গের তলে সে আপনার স্থান বাছিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-বিপর্য্যয়ের একটা জাল পড়িয়া গেল। শিল্পী যেন তখন ক্ষিপ্রহস্তে তুলী ধরিয়া লাল পীত হরিত সোনালি বর্ণগুলির উপর একটা মোটা কালির রেখা টানিয়া দিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় ষ্টীমারখানি চাঁদপুর ঘাটে আসিয়া থামিল। তাড়াতাড়ি লগেজপত্রাদি লইয়া ষ্টীমার হইতে নামিলাম। সম্মুখেই চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশন। ষ্টেশনে চট্টগ্রাম মেলট্রেণ সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। ট্রেণে যাত্রীর ভীড় সত্ত্বেও স্বচ্ছন্দে বসিবার একটু স্থান পাইয়া আনন্দ হইল। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িল। ক্রমে গতি বাড়িতে বাড়িতে ঝড়ের ন্যায় শব্দ করিয়া ছুটিতে লাগিল। তখন যাত্রীরা কেহ ধূম পানে, কেহ আলস্যে মুদিত-নেত্রে যেন ধ্যানে রত হইল।

যখন আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ে জংশন লাকসাম ষ্টেশনে পৌছিলাম, তখন রাত্রি অনেক। এই ষ্টেশনে গাড়ি কিছুক্ষণ দাঁড়াইল। তার পর এখান হইতে সীতাকুণ্ডের মধ্যে যত ষ্টেশন পাইলাম বিশেষ বিলম্ব কোথাও হয় নাই। যখন কুণ্ডেরহাট নামক ষ্টেশনে পৌছিলাম তখন ৩ জন যাত্রীর সহিত আলাপ হইল। কথা-প্রসঙ্গে বুঝিলাম তাঁহারাও চন্দ্রনাথ দর্শনে যাইবেন, সুতরাং আমার সহযাত্রী। একা যাইতেছিলাম, কোথায় থাকিব না-জানি কত কষ্ট হইবে, ইহাই ভাবিতেছিলাম, এখন মনে হইল তবু সঙ্গী পাইলাম। তার পর যখন শুনিলাম তাঁহারা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন ষ্টেটের ম্যানেজার কাছারির তহশীলদার বাবু নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসায় যাইবেন। আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গী হইতে অনুরোধ করায় আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইলাম। ইহাদের সহিত চন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্ত্তায়

পথ ফুরাইয়া আসিল। গাড়ি সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। আমরা নামিয়া পড়িলাম। দেখিলাম সীতাকুণ্ড প্রকাণ্ড ষ্টেশন। জলস্রোতের ন্যায় যাত্রীর ভীড় হইয়া পড়িল, ভীড় ঠেলিয়া ষ্টেশনের একজামিন-ফটক পার হইতে আমাদের একটু বিলম্ব হইল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম পাণ্ডাঠাকুর মহাশয়রা যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন, কোথায় বাড়ি, কোথায় ঘর, কোন ঘরে যাইবেন ইত্যাদি। সহস্র প্রশ্ন করিয়া আপনাদের পরিচয় দিতেছেন, কেহ বা বলিতেছেন মহাশয়,আপনাদের ফরিদপুর হইতে যত লোক আসেন আমাদের ঘরেই থাকেন, কেহ বা প্রমাণ করিতেছেন কলিকাতা হইতে যত লোক আসেন সকলেই তাঁহাদের বাড়িতেই থাকেন। তাঁহার বাড়িতে ঘরের যেমন সুবন্দোবস্ত, পায়খানা প্রভৃতিরও ততোধিক সুবিধা। এ সুযোগ পরিত্যাগ করা কোন যাত্রীরই উচিত নয়। যাত্রিগণও তাহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে স্বীয় স্বীয় আশ্রয়ের সুবিধা অনুভব করিতে করিতে চলিয়াছে। আমিও আমার সঙ্গীদের সহিত আশ্রয়স্থানের অভিমুখে জনস্রোতের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। তখন উষার অঙ্গে লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভোরের আলো গায়ে মাখিয়া তরুশিরে বসিয়া বিহঙ্গগণ কলকণ্ঠে প্রভাতী গাহিল।

ষ্টেশনের পশ্চিম দিকে অনতিদূরেই উক্ত কাছারী-বাড়ি। আমরা সেখানে পৌঁছিয়া উপস্থিত কার্য্যাদি সমাধা করিয়া লইলাম। প্রভাত হইয়া গেল। এখানে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা আগেই জাগিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন।

প্রকাণ্ড দীঘীর পাড়ে কাছারী-বাড়ি। সুন্দর দীঘিটির স্বাদু পরিস্কার জল। চারি পাড়েই ঘর-বাড়ি-বাজার। কাছারী-বাড়ির সান্নিধ্যে পাকা ঘাট, পূর্ব্ব পার্শ্বে খাসমহাল আপিস, তৎসংলগ্ন পুষ্পোদ্যান, পশ্চিম পার্শ্বে সীতাকুণ্ড পুলিস-ষ্টেশন।

একটু বিশ্রাম করিয়া পুলকচঞ্চলহৃদয়ে আমরা চন্দ্রনাথ দেব দর্শনে একসঙ্গে বাসা হইতে বাহির হইলাম। দীঘীর উত্তর পাড়ের রাস্তা, পুলিশ আপিসের সম্মুখ দিয়া পশ্চিম পার্শ্বস্থ বিস্তৃত ট্রাঙ্করোডে উঠিলাম। দক্ষিণাভিমুখে ভৈরব বাজারের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তৃত পথে যাইয়া পড়িলাম। এই রাস্তাটি বরাবর চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(ক্রমশ)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যক্ষ্মা-বীজাণুর উক্তি

—)*(—

আমরা যক্ষ্মা-বীজাণু। আমাদের আকার দৈর্ঘ্যে ·০০০০১ ইঞ্চি ও প্রস্থে ·০০০০১২৫ ইঞ্চি। বীজাণুতত্ত্বজ্ঞ মানবেরা আমাদিগকে "ব্যাসিলাস্ টিউবারকিউলোসিস্" (Bacillus Tuberculosis) বলিয়া সম্বোধন করে। আমরা অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ধরাপৃষ্ঠে আধিপত্য করিতেছি। খৃষ্ট জন্মাইবার তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে Hippocretes নামে একজন লোক তদীয় পুস্তকে যক্ষ্মারোগের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চরক গ্রন্থেও যক্ষ্মার বিবরণ বিবৃত আছে।

সম্প্রতি তোমরা ধরাবাসী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুষ্মান্ হইয়া এবং বুদ্ধিবলে বিবিধ ভেষজ আবিষ্কৃত করিয়া আমাদের ব্যবসায়ের বড়ই ক্ষতি করিতে বসিয়াছ। পূর্ব্বে আমরা কেবল সহরেই বাস করিতাম; পল্লীগ্রামে বড় একটা যাইতাম না। আজকাল সময়ে সময়ে পল্লীগ্রামে যাতায়াত করিতেছি দেখিয়া তোমরা অস্থির হইয়াছ। কিসে আমাদিগকে দেশ হইতে বিদূরিত করিবে—কিসে আমাদিগকে প্রাণে মারিবে—ইহাই এখন তোমাদের চিন্তার বিষয়। তোমরা ইহার জন্য বৈজ্ঞানিকদিগকে মাথা ঘামাইতে বলিতেছ,—স্থানে স্থানে সভাসমিতি করিয়া উচ্চকণ্ঠে কতই বক্তৃতা করিতেছ। যেদিন মার্কিন মুলুকে ফিন্‌লে নামক একজন ধনী ব্যক্তির পুত্রকে আমরা যেমন আক্রমণ করিলাম, অমনি তোমাদের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ফিন্‌লে ঘোষণা করিলেন, যে চিকিৎসক তাঁহার পুত্রকে নিরাময় করিতে পারিবে তিনি তাঁহাকে ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন! পারিতোষিকের লোভে এ-দেশ সে দেশ হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভিষকগণ ছুটিতে লাগিল। একজন জার্ম্মাণ ডাক্তার বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রস্তুত প্রতিষেধক বীজ (Serum) দ্বারা আমাদের বিনষ্ট করিবেন। আবার অপর একজন ডাক্তার বলিলেন যে, তিনি সামুদ্রিক কূর্ম্মরক্ত হইতে এক প্রকার ঔষধ বাহির করিয়াছেন, উহাই আমাদের মৃত্যুশর। শরীরাভ্যন্তরে উহা প্রবিষ্ট করাইলেই আমরা নাকি আর ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারিব না। এই সকল কথা শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

আমরা নবাগত হইলে তোমাদের এই সকল কথায় ভীত হইতাম। আকাশে ঐ যে চন্দ্রদেব দেখিতেছ, দক্ষরাজের অভিশাপে উনিই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। দেব-চিকিৎসক ধম্বন্তরির উপদেশানুসারে রোগ শান্তির জন্য নিশাপতি দিবা-যামিনী অঙ্কে এক শশক ধারণ করিয়া থাকিতেন, এই জন্যই চন্দ্রের আর একটি নাম শশাঙ্ক। মহাভারতীয় যুগে প্রমদা-জন-মনোহারী ভূপতি বিচিত্রবীর্য্য মহিষীযুগলের সহিত নিরন্তর প্রমত্ত থাকায় আর কেহই তাঁহাকে শাস্তি প্রদানে সমর্থ হয় নাই ;—আমরাই তাঁহাকে যৌবনের প্রারম্ভে বাঁধিয়া আনিয়া কৃতান্ত-ভবনে প্রেরণ করি। আমাদিগকে বিনষ্ট করা তোমাদের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। আমাদের দৈহিক আবরণ এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত ; সুতরাং তোমাদের ভেষজাদি সহজে আমাদের দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। আমাদের শরীর এতাদৃশ ক্লেশ-সহনশীল যে বরফের মধ্যে রাখিয়া দিলেও আমরা সহজে গতায়ু হই না। জলে ও ভূগর্ভে আমরা দীর্ঘকাল সজীব থাকি। রোগীর পরিত্যক্ত কাশে আমরা আত্মগোপন করি। ঐ কাশ শুষ্ক হইলেও আমরা তন্মধ্যে দুই মাসেরও অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারি।

পৃথিবীর সকল স্থানেই আমাদের আধিপত্য আছে। তবে য়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যতালোকদীপ্ত দেশগুলিকে আমরা অধিক ভালোবাসি। অষ্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর-মধ্যস্থিত দ্বীপ-সমূহে আমরা পূর্ব্বে একেবারেই যাইতাম না। আজ কাল ঐ দেশবাসিগণ য়ুরোপীয়দিগের সাহচর্য্য করায় আমাদেরও অনুগ্রহ লাভ করিতেছে। আমরা অসভ্য লোকদিগকে দেখিতে পারি না ; তাহাদের নিকট যাইতেও ঘৃণা বোধ করি। যে দেশে যত সভ্যতালোক প্রবেশ করে, সেই দেশ আমাদের তত প্রিয় ! ক্যাসপিয়ন্ সমুদ্র-কূলবর্ত্তী পল্লীসমূহের অধিবাসী অসভ্য কালমুখ (Kalmuk) জাতিকে আমরা কখনই আলিঙ্গন করি নাই। তবে যে সকল কালমুখ নরনারী কর্ম্মোপলক্ষ্যে সুসভ্য দেশে আসিয়া বাস করিতেছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে আমাদের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয় না। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষেও আমরা অধিক সময় থাকিতাম না। তথাকার লোকসকল সেকালে সভ্যতার ধার বড় একটা ধারিত না। কাজে কাজেই আমরাও তাহাদের দেখিতে পারিতাম না। তাহারা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বহিঃশৌচ সমাপনান্তে দেবোদ্দেশ্যে পথে পথে পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইত। তাহারা ত্রিসন্ধ্যা নাসিকা টিপিয়া কি বিড়্ বিড়্ করিয়া

বঞ্চিত। তাহারা দিবাভাগে একটুও নিদ্রা যাইত না, ক্লেশ স্বীকার করিয়া ও ঘৃত ভোজন করিত এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে সিদ্ধিলাভ করিয়া তবে দারপরিগ্রহ করিত। সেই অসভ্য লোকগুলো কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিথি-নক্ষত্রানুসারে খাদ্য দ্রব্যের গ্রহণ-বর্জ্জনের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিত এবং মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিত না। এখন সুসভ্য ভারতবাসী বেলা ছয় দণ্ড না হইলে আর শয্যাত্যাগ করে না; এখন তাহারা দেবোদ্দেশ্যে পথে পথে ঘুরিয়া পুষ্পচয়ন করিয়া না বেড়াইয়া মালীর দ্বারাই পুষ্প ও পুষ্পস্তবক আনাইয়া প্রিয়জনকে উপহার দেয় সে ত্রিসন্ধ্যা নাসিকা টিপিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা রহিত হইয়াছে। তাহারা দিবাভাগে কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রা যায়;—তাহারা পেটে না খাইয়া, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়া সেই উপার্জ্জিত অর্থে গৃহলক্ষ্মীদের জন্য বিবিধ কুন্তলশোভী তৈল, বডি, সেমিজ ও অলঙ্কার ক্রয় করে এবং "প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে" না হইতেই দারপরিগ্রহ করিয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষের মধ্যেই গলিতঅঙ্গ, পলিতকেশ পিতামহ হইয়া বসে। তাহারা খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে না; মদ্য পান করা তাহাদের সভ্যতার একটি অঙ্গ হইয়াছে। সে দেশের ছেলেগুলির মুখে আগুন লাগিয়াছে;—এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও বিড়ি টানিতে শিখিয়াছে। সুতরাং আমাদের বেশ মজা হইয়াছে। আমরা বাল-কিশোর-যুবা এখন আর কিছুই বিচার করি না। যাহার প্রতি যখন অনুগ্রহ করি, তাহারই ভবযন্ত্রণা ঘুচাইয়া দিই।

মানুষের ফুস্‌ফুসই আমাদের শান্তিধাম। অপরাপর যন্ত্র অপেক্ষা ঐ যন্ত্রেই আমরা অধিক সময় বাস করি। অত্যন্ত ধূমপানজনিত প্রদাহ থাকিলে ঐ স্থান আমাদের বাসের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়। রসগ্রন্থি, স্বরযন্ত্র, মেরুদণ্ড, অন্ত্র প্রভৃতি স্থানেও আমরা সময় সময় আশ্রয় গ্রহণ করি। মানব ব্যতীত গবাদি অন্যান্য জীবকেও আমরা আক্রমণ করি। ঐ যে মানুষের অন্ত্রে ক্ষয় রোগ জন্মে, আমাদের দ্বারা পীড়িত গবাদির মাংস ভক্ষণ বা দুগ্ধ পানই তাহার কারণ। এখন আর গাভীসকল মাঠে নব নব তৃণ ভোজন করিয়া, দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে পায় না। তাহারা প্রায়ই অর্দ্ধাশনে এক অন্ধকূপ গৃহে আবদ্ধ থাকে। সভ্য মানুষদের এখন গাভীর দুঃখ দেখিবার অবসর নাই; তাঁহাদের বিলাসিনী গৃহলক্ষ্মীরাও ভ্রমক্রমে গোশালার ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন না, সুতরাং আজ কাল আমরা অতি সহজেই গাভীকে আক্রমণ করিয়া থাকি।

যেসকল মানুষ অত্যধিক পরিশ্রম করে, দুশ্চিন্তা করে, শক্তির অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে, অনুপযুক্ত আহার করে, অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবা করে, মদ্যপান করে এবং দূষিত বায়ু সেবন করে, আমরা তাহাদের শরীরে বড়ই সুখে বাসকরি, আর যাহারা প্রফুল্লচিত্তে মুক্ত বায়ুতে পরিভ্রমণ করে, পরিমিত আহার ও ব্যায়াম করে, দেহকে ভগবানের মন্দির মনে করিয়া সর্ব্বদাই পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহাদের শরীরে আমরা অধিকক্ষণ থাকিতে পারি না। সেই সকল শরীরে এমন একটি সঞ্জীবনী শক্তি আছে, যাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া আমরা আহত হইয়া পড়ি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রোগীর কাশের মধ্যেই আমরা অবস্থিতি করি। ঐ কাশ শুষ্ক হইলে ধূলিকণার সহিত আমরা উড়িয়া বেড়াই এবং সুযোগ পাইলেই নিশ্বাসের সহিত সুস্থ দেহীর ফুস্‌ফুস্-মধ্যে চলিয়া যাই। মক্ষিকার সাহায্যেও আমরা কখনো কখনো খাদ্যের সহিত তোমাদের দেহে প্রবিষ্ট হই। যেসকল ব্যক্তি যক্ষ্মারোগীর চুম্বিত হুকায় মুখ দিয়া তামাকু সেবন করে, রোগীর সহিত একত্র ভোজন, একত্র শয়ন এবং একত্র বসিয়া অনেক ক্ষণ কথোপকথন করে, তাহাদের শরীরে অতি সহজেই আমরা প্রবেশ করিতে পারি।

ক্ষয়রোগগ্রস্ত পিতামাতার সন্তান প্রায়ই পৈতৃক সম্পত্তির সহিত উত্তরাধিকারী সত্ত্বে আমাদের প্রাপ্ত হয়। তবে আমরা জন্মকাল হইতে অন্য সকল সন্তানের শরীরে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদের দেহরক্ষী সেনাগণ যেমন আমাদের বাহির করিয়া দিবার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করে, ঐ বংশজ সন্তানগণের দেহস্থ রক্ষী সেনারা সেরূপ কখনই করে না। আমরা তথায় গিয়া নির্ব্বিবাদে অবস্থিতি করি।

নির্ম্মল বায়ু আমাদের পরম শত্রু। সে আমাদের দেখিলেই আঘাত করে। তোমরা যে আজ কাল নির্ম্মল বায়ু সেবনের পক্ষপাতী হইয়াছ এবং যক্ষ্মারোগীর কাশ জীবাণুনাশক জলে ফেলিয়া আমাদের বংশ লোপ করিতে শিখিয়াছ, ইহাতেই আমাদের সময় সময় শঙ্কা হইতেছে। তবে তোমরা পল্লীজীবন পরিত্যাগ করিয়া যতদিন খাঁচায়-পোরা পাখীর মতো সহরবাসী থাকিবে, যত দিন ত্যাগে সুখ, ভোগে অসুখ এই মহাবাক্যের অর্থ না বুঝিবে, ততদিন আমাদের গ্রাস হইতে কখনই একেবারে নিস্তার পাইবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

যুগপ্রবর্ত্তক রাজর্ষি রামমোহন রায়

২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য প্রতি বৎসর এই দিনে নানা স্থানে সভা হয়। এবৎসর কলিতাতায় রামমোহন লাইব্রেরী-হলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে তাঁহার ৮৩ তম সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভা হইয়াছিল। ৮২ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে তিনি ইউরোপের বৃষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। সেখানে তাঁহার একটি সমাধি আছে। প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর তাহার উপর একটি সুন্দর মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত করিয়া দিয়া ছিলেন। এখানকার অনেকে তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন।

৮২ বৎসর পূর্ব্বে ৫৯ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাহা হইলে ১৪১ বৎসর পূর্ব্বে তিনি হুগলি জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে এক নিষ্ঠাবান গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা এখন যাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন না বা অবগত নহেন তাঁহাদের অবগতির জন্য, আমরা কোন একটি বিবরণীতে যাহা পাঠ করিয়াছিলাম তাহার ভাব অনুসারে সংক্ষেপে কিছু বলিতে পারি।

যখন মুসলমান শাসন লুপ্ত হইয়াছে, অথচ ইংরাজ রাজত্ব সুশৃঙ্খলভাবে বিস্তারিত হয় নাই, দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াতের পথ দুর্গম, রেল-বিস্তার আরম্ভও হয় নাই;—দেশের জমিদার-শ্রেণী অধিকাংশ দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী; সহরবাসী ধনীগণের মধ্যে অধিকাংশ সুরাপায়ী, ব্যভিচারী। সে সময়ে যাঁহারা সভ্য বলিয়া গণ্য তাঁহাদের মধ্যে একটু সুরাপান করা অথবা অপরাহ্নে বায়ুসেবনে বহির্গত হইয়া কুস্থানে একবার বেড়াইয়া আসা সভ্যতার অঙ্গরূপে পরিগণিত হইত। পল্লীর ধনবান গৃহস্থদিগের মধ্যে দলাদলির আধিক্য যথেষ্ট ছিল। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কতকগুলি পূজা-পার্ব্বণ ব্রাহ্মণ-ভোজন দান-দক্ষিণা বার্ষিক সামাজিক বিদায় এই সকলের প্রাচুর্য্যই দেখা যাইত। অন্নবিচার আর বাহ্যশুচি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের বিশ্বাস ছিল। ঐ সকল মানিয়া চলিলেই যথেষ্ট ধর্ম্ম হইল সকলে মনে করিত। আড়ম্বরবাহুল্যও ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল। বেদ বেদান্তের নামও কেহ করিত না। খুজিয়া একখানি গ্রন্থও কেহ দেখিতে

পাইত না। গীতা ভাগবতও দুষ্প্রাপ্য ছিল। দশ কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণগণ পণ্ডিতপদবাচ্য ছিলেন। তদূর্দ্ধে স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক উপাধিযুক্ত পণ্ডিতগণ দেশমান্য ছিলেন। ধর্ম্ম বিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে অল্প দেখা যাইত। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য সংসারাসক্তির আবরণ স্বরূপ ছিল। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যগণ সংবাদপত্রের কার্য্য করিতেন। গঙ্গাস্নান করিয়া কোশাকুশী আর আর্দ্রবস্ত্র কক্ষে তাঁহারা ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে গিয়া কে কত পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে ব্যয় করিল ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করিয়া এবং ধনীগণের মনোরঞ্জন দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পথ সর্ব্বথা পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টা করিতেন। স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যেক কাজে অতি কঠোর শাসনবিধি-নিষেধ নিয়ম-প্রণালী প্রচলিত ছিল। ফলত ধর্ম্মের নামে সর্ব্বত্র বাহ্য আচার বাহ্য শুচি ও বাহ্য ক্রিয়াকলাপ শাস্ত্রের দোহাই আর প্রায়শ্চিত্ত-বিধি ব্যবস্থার বাহুল্য লইয়াই লোকে ব্যস্ত থাকিত। কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ সকলেরই মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। জ্ঞানের বিমল জ্যোতি যেন চির দিনের মত মানুষের মন হইতে নিব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহারাও বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার পরিবর্ত্তে বাহ্য-বেশ বাহ্য-বৈরাগ্য, আর বাহ্য আড়ম্বর লইয়াই তৃপ্ত থাকিতেন। ত্যাগী পবিত্র-চেতার দর্শন দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছিল। তান্ত্রিক বামাচারী ভণ্ড-বৈরাগীর দলেই দেশ পূর্ণ ছিল। দেশের এমন দুর্দ্দিনে নবযুগ-প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে বাঙালীর ঘরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া আজ সমগ্র পৃথিবীর দ্বারে বাঙালী ও ভারতবর্ষের নাম গৌরবান্বিত হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ষোল বৎসর বয়সের পূর্ব্বে রাজার মনে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মচিন্তার উদয় হইয়াছিল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে পার্শী ভাষা শিক্ষার জন্য পাটনা প্রেরণ করেন। তখন রাজ সরকারে কাজ পাইতে হইলে পার্শী ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। সকলে সেই উদ্দেশ্যেই উক্ত ভাষা শিখিতেন। যেমন এখনও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইংরাজী পড়িয়া দর্শন-বিজ্ঞান ও রাসয়নিক তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিব, এ উদ্দেশ্যে কয়জন ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। রাজা রামমোহন রায় পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়া কোরাণ পাঠ করেন। কোরাণ পাঠ করিবার জন্যই তিনি আরব্য ভাষা পাঠ করেন। কোরাণ পাঠ করিয়া একেশ্বরবাদের বিশুদ্ধ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্ব প্রথমে পতিত হইল। তিনি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, সমুদয় চিন্তা

তাঁহার ঐ একেশ্বরবাদের মধ্যে ডুবিয়া গেল। তারপর পাটনা হইতে বাড়ি আসিয়া তিনি পার্শি ভাষায় একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার পিতা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তিনি একাকী পদব্রজে নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বত দেশে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানেও তাঁহার মনে ঐ ধর্ম্ম-চিন্তা ও একেশ্বরবাদ প্রচারের আকাঙ্ক্ষা। সেখানে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। সেখানে লামাদিগের সঙ্গে ধর্ম্ম-তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তাঁহারা এতদূর বিরক্ত হন যে, শেষে তাঁহার প্রাণবধ করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কয়েকটি দয়াবতী স্ত্রীলোক গোপনে তাঁহাকে তথা হইতে সরাইয়া দেন। এই ঘটনায় স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা চিরদিন অক্ষুন্ন ছিল। কোন সামান্য স্ত্রীলোকও তাঁহার সম্মুখে আসিলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেন। তারপর তিনি কাশীতে থাকিয়া বেদবেদান্ত পাঠ করেন। তারপর তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি রংপুর জেলায় কালেক্‌টরীতে চাকরী গ্রহণ করেন। সেখানে থাকিয়াও ঐ ধর্ম্ম চিন্তা ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিলেন। কালেক্‌টর সাহেব তাঁহার ভাব দেখিয়া আপিসের মধ্যে বলিয়া দিলেন—তিনি কাছারীতে আসিলে আর সকলের ন্যায় রামমোহন রায়কে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হইবে না। রামমোহন রায় ঐ সময় সমগ্র বাইবেল পাঠ করিয়া কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল ইংরাজী ভাষায় বাইবেল পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। মূল হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল পাঠ করিলেন। বেদবেদান্ত কোরাণ ও বাইবেল পাঠ করিয়া তিনি দেখিলেন সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলে ঐ একেশ্বরবাদ পরিষ্কার রূপে ফুটিয়া রহিয়াছে। কেবল অবান্তর বিষয়ে ধর্ম্মে-ধর্ম্মে এত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা মানুষের মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়াতে ধর্ম্ম-বিরোধ ঘটিয়াছে। যেখানে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া মানব-হৃদয় পবিত্র এবং আনন্দ-পূর্ণ হইবে, সেখানে কেবল ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ আর মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ। তজ্জনিত জাতীয় শক্তি একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই মহাসত্য তিনি একেবারে সমগ্র হৃদয় দ্বারা উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিলেন। যখন দেখিলেন, সকল ধর্ম্মের মূলে অতি পরিষ্কাররূপে একই তত্ত্ব, তখন ধর্ম্মে একপ্রাণেতা একই গতি না হইবে কেন? তাই বুঝি তিনি ঈশ্বর-পরিচালিত হইয়া একেশ্বর বাদ প্রচারে আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

ইহার পর তিনি চাকরি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্ম প্রচারে একেবারে সমুদয় শক্তি ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার প্রচারের প্রথম প্রণালী বেদ বেদান্তের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নানা ভাষায় মুদ্রিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন মুদ্রাযন্ত্রের কিছু মাত্র উন্নতি হয় নাই, মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধেও অনেক অসুবিধা ছিল, তিনি সময় সময় নিজেই কম্পোজ করিতেন নিজেই ছাপিতেন আবার নিজেই কখন কখন তাহা বিলি করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে বহু ভাষা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল।

তিনি ভারতের ঋষিদিগের পথ ধরিয়াই অন্যান্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভারও আত্মস্থ করিয়া আবার ভারতে একেশ্বরবাদের পথ উন্মুক্ত করিতে যখন কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন দেশ একেবারে তাঁহার ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিল, তাহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে তিনি যদি সেই ভারতের আদি ধর্ম্ম-ঋষিদিগের পথই ধরিয়া ছিলেন, তবে দেশ কেন তাঁহার বৈরী হইয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ হইলেও ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে গিয়া আমরা প্রথমেই ক্ষুব্ধ চিত্তে নীরব হই; কেন না, রাজার বিরুদ্ধে যে অস্ত্রধারণ করা হইয়াছিল তাহা কি আজো সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়াছে? না, তাহা হয় নাই। বিরোধ এখনও চলিতেছে। কারণ একই স্থানে দুইটি বিরোধী সত্যের স্থান কখনই হইতে পারে না, একটিকে গ্রহণ, আর একটিকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ইহার মধ্য পথ কিছু নাই।

রাজা রামমোহন রায় যখন দেখিলেন সকল ধর্ম্মেরই দুইটি দিক দেখা যাইতেছে; এক দিকে ধর্ম্মের যে মৌলিক বিমল ভাব তাহা যেমন শাস্ত্রের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং তাহা ধরিয়া অতি অল্প লোকেই চলিয়াছে, তেমন আর এক দিকে সাধারণ লোকে ধর্ম্মের বাহ্যভাব, বাহ্য ক্রিয়া, অসার আচার ব্যবহার এবং কুসংস্কার ও সংসারাসক্তি লইয়া পাপ তাপে ক্লিষ্ট হইতেছে। তিনি আরো দেখিলেন বাহ্যিক ধর্ম্ম এবং জাতির প্রাধান্য লইয়া সমাজবক্ষে একটি সুদৃঢ় স্বার্থের রাজ্য বিস্তার হইয়াছে। চরিত্র এবং ধর্ম্মের অভাবে শ্রেষ্ট জাতির দোহাই দিয়া জীবিকা এবং মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া মানুষ টিকিয়া আছে। কিন্তু জাতীয় আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব সর্ব্ব প্রধান বিষয় এই ধর্ম্মের জ্ঞানের দিক জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। আবার জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, ক্রমে কুসংস্কার-ছায়া কাটিয়া যাইবে।

অতএব সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানের উদ্বোধন করিতেই হইবে। সুতরাং ভ্রান্তি কল্পনা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সত্য, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোক, প্রচার করিয়া, বহু বৎসরের কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের মূলে যখন তিনি আঘাত করিলেন তখন অপর পক্ষ তাঁহাকে ধর্ম্মবিপ্লব কারী জানিয়া সহজেই তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু আজ রাজার নামে উদ্বুদ্ধ ভারত বলিতেছে,—"তুমি নবযুগেরপ্রবর্ত্তক।"

মহাত্মা ভগীরথ যখন ধরাতলে গঙ্গা আনয়ণ করেন, তখন দেবগণের মধ্যে কথা হইল, গঙ্গার প্রথম বেগ কে ধারণ করিবেন? সে কার্য্যে যিনি মহা-দেব তিনিই সক্ষম হইয়াছিলেন। ইউরোপ হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ধর্ম্মের প্রবল স্রোত যখন সর্ব্ব প্রথমে ভারতে আসিয়া আঘাৎ করে তখন তার বেগ ধারণ করিতে রাজার ন্যায় একজন মহাপুরুষের নিশ্চয়ই যে প্রয়োজন হইয়াছিল তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে। তাই আজ সর্ব্বসাধারণে অন্তত একথা স্বীকার করেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব না হইলে বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষ সমস্ত খৃষ্টান হইয়া যাইত।

রাজার জীবনে অনেক প্রকার সৎকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন সতীদাহ-নিবারণ, স্ত্রীজাতির উন্নতিচেষ্টা, ইংরাজী বিদ্যা বিস্তারের দ্বার উন্মুক্ত করিবার উপায়, রাজবিধি সংস্কার, সমাজ-সংস্কারের পথ পরিস্কার। বাংলা ভাষার সরল পথ প্রদর্শন ইত্যাদি। জাতীয় উন্নতিকল্পে দণ্ডায়মান হইয়া এ সকল কার্য্যে তিনি অনিবার্য্য রূপে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল উন্নতির মূলমন্ত্র তাঁহার ছিল ধর্ম্মজ্ঞানের উন্নতিসাধন। যাঁহারা আজো কেবল তাঁহার বাহ্যিক কর্ম্ম দেখিয়াই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তাঁহারা মহাপুরুষদিগকে ভুল বোঝেন। এভাবে দেখিলে তাহাদিগকে অসম্মান করা হয়।

রাজার কার্য্যকালে যাঁহারা তাঁহার ঘোর বিরোধী হইয়াছিলেন, মনে হয় তাঁহার প্রতি তাঁহারা সম্মানই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেন না সে বিরোধ অকপটেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশ-প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মে তাঁহাদের সম্পূর্ণ আস্থা ছিল, তাহার অধিক কোন ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের চিন্তাতে আসিত না। সুতরাং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানকারীকে ধর্ম্মদ্রোহী মনে করা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। আজ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই পৌত্তলিকতার প্রতি আস্থাশূন্য। তাই কোন তত্ত্বদর্শী বলিয়াছেন, "হয় তাঁহাদিগকে গ্রহণ কর, না হয় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর, ইহার মধ্যপথ কিছু নাই।"

আজ ৮২ বৎসরে আমরা কি দেখিতেছি? দেখিতেছি, তিনি যে মন্ত্রশক্তি বীজ পরিমাণে বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। শিক্ষিত জগত সেই জ্ঞানের উচ্চ আদর্শের পথে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে চলিয়াছে।

রামমোহন

উদ্ধারিতে পিতৃগণে রাজা ভগীরথ
আনিলা জাহ্নবী মর্ত্তে এই জনশ্রুতি॥
তথা তুমি ভ্রমি নানা গিরি নদী পথ
ব্রহ্ম জ্ঞান প্রদানিলে দীন জন-প্রতি।
কত চিন্তা কত ভাষা ষড় দরশন
কত চেষ্টা গবেষণা তর্ক আলোচনা;
সবার কুতর্ক মত করিলা খণ্ডন,
নিরন্তর ভক্তি-ভরে করি উপাসনা;
সাধিলে মহান্ ব্রত ধর্ম্ম-সংস্থাপন
নিবারিয়া কুসংস্কার কুপ্রথা দুর্ব্বার;
আনিলে নূতন স্রোত নব জাগরণ;
ব্রহ্মের পবিত্র পূজা করিয়া প্রচার।
ধন্য তুমি জগতের'—তুমি মহাজন।
জয় পুণ্যবান রাজা শ্রীরামমোহন॥

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত

আমার জীবন কাহিনী

ভ্রমণ ফল

আমি কলিকাতা হইতে কয়েক স্থান ঘুরিয়া কাশীতে আসিয়া সতীশকে এইরূপ একখানি পত্র লিখিলাম,—

প্রিয় ভ্রাতা সতীশ! আমি বড়ই অস্থির চিত্ত হইয়া তোমাদের ছাড়িয়া

বাহির হইয়াছি। আমার চিত্তের অনুরূপই বাহিরে আমার অবস্থা। কোথায় যাই কি করি তার স্থিরতা নাই। তোমরা আমার জন্য ভাবিও না। আমি পরে তোমাদিগকে আমার সংবাদ দিতে চেষ্টা করিব।

কাশী হইতে বহির্গত হইয়া আমি বহু স্থান ভ্রমণ করি, তাহার সমস্ত বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সুদীর্ঘ ভ্রমণে আমার চিত্তের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহাই বলিব।

নানা স্থানে বিচিত্র ঘটনার মধ্যে কখন অনুকূল কখন প্রতিকূল অবস্থার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মানব চরিত্রের বৈচিত্রতা কতই দেখিলাম, আমার মত অপরিণত বয়স্কের পক্ষে একদিকে যেমন শিক্ষার বিষয়, তেমন অন্য দিকে প্রলোভনের বিষয় দেখিয়া অনেক সময় ভয়ে ম্রিয়মান হইয়াছি। তখন বুঝিলাম ধর্ম্ম বন্ধুর শিক্ষা, সংস্কার এবং সঙ্গ আমার জীবনে কি সুমহৎ ফল প্রদান করিয়াছে। প্রলোভনের দিনে স্বর্গীয় মণীন্দ্র দেবতাকে যখনই স্মরণ করিতাম তখনই মনে কি এক বল—কি আত্ম-সন্মান বোধ জাগ্রত হইত, তখন কর্ত্তব্য পথ যেমন পরিস্কার দেখিতাম। তাঁহার উপদেশ কতই স্মরণ হইত যাহার মর্ম্ম পূর্ব্বে বুঝিতাম না, এই পরীক্ষা বিপদের মধ্যে পড়িয়া তাহার অর্থ আমার মনে কে যেন ব্যাখ্যা করিয়া দিত। যে দিন সন্মানের মধ্যে—স্নেহ যত্ন ভালবাসার মধ্যে পড়িতাম সেদিন আমাকে আত্মহারা হইতে হইত না, বিনীত ভাবে চরিত্রের পুরস্কার ধর্ম্মের আশীর্ব্বাদ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম। মানুষের আদর যত্নে স্ফীত কখন হই নাই। আমি গরীবের সন্তান হইয়াও ধনীর সন্তান মণীন্দ্রনাথের আদর যত্ন এক সময় যতদূর সম্ভোগ করিয়াছি তাহাতে সে প্রলোভন আমার কাটিয়া গিয়াছে। তিনি কোন দিন কাহাকে অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি নিজে যেমন স্বাধীনচেতা ছিলেন, তেমন তিনি অন্যের স্বাধীনতারও সম্মান করিয়া চলিতেন। পৃথিবীর ধনী চান, সর্ব্বতো-ভাবে তাঁহার জয়গানকারী একটি দল! মণীন্দ্রনাথের উদার শিক্ষার মর্ম্ম এখন আমি পরীক্ষার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম।

আমাকে দেখিয়া কত লোক কত রকম অনুমান করিতেন, নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া আমার মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। আমি মনের ভাব গোপন করিয়া অন্য রূপ বলিতে পারিতাম না। বোধ হয় আমাকে এক প্রকার শূন্যমনা দেখিয়া প্রায় প্রত্যেকেই একটি না একটি পথের পথিক হইতে উপদেশ দিতেন। কেহ সমাজ সংস্কার, কেহ

সেবাধর্ম্ম, কেহ শিল্পের উন্নতি চেষ্টা, কেহ সাহিত্যসেবা; কেহ নিম্ন শ্রেণীর উন্নতি সাধনে জীবন অর্পণ করিতে উৎসাহ দান করিতেন। আবার কেহ বা আদর যত্ন করিয়া পরিবার মধ্যে স্থান দিয়া ক্রমে আমাকে সাংসারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া সংসার ধর্ম্ম পালনে রত হইতে উপদেশ দিতেন। আমি বাল্যে পিতৃ মাতৃ হীন জানিয়া কোন কোন স্ত্রীলোক অকৃত্রিম মাতৃ-স্নেহ প্রকাশ করিয়া আমাকে তৃপ্ত করিতেন। যাঁহারা কোন না কোন সৎকাজে আত্ম নিয়োগ করিতে বলিতেন, তাহার মধ্যে একটি মুল কথার উল্লেখ করিতে প্রায় কাহাকেও দেখিতাম না—যাহা মণীন্দ্রনাথের মূল শিক্ষা ছিল। মণীন্দ্রনাথ জনহিতার্থে বহুবিধ কাজের অনুষ্ঠান করিতেন কিন্তু তাঁহার সকল কাজের মূলে ছিল ঈশ্বর-প্রীতি। তিনি ভগবানের প্রেমেই মানবের সেবা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং যাঁহারা ঐ কথাটি—ঐ মূল বিষয়টি বাদ দিয়া সৎকার্য্যের কথা বলিতেন, তাঁহাদের প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা দেখিয়া কোথাও কোথাও চুপ করিয়া থাকিতাম।

সাধারণ জনসমাজ ছাড়িয়া কখন কখন গিরিগুহা জঙ্গলে—নদীতীরে সন্ন্যাসী ফকির সাধু পরমহংসগণের সঙ্গেও পড়িয়াছি। অধিকাংশ স্থলে কেবল ভিক্ষুক ভেকধারীর সংখ্যাই অধিক দেখিতাম। সাধক কদাচ,—সাধু প্রকৃতি আরো বিরল, জ্ঞানী অতি দুর্লভ। সাধু সান্ত চেনা আমার শক্তির অতীত ছিল, কিন্তু এই মুক্ত পথে পরিচালিত হইয়া মণীন্দ্রনাথের আদর্শে আমার যেন কি এক দৃষ্টি খুলিয়া গেল, সহজ বুদ্ধিতে এখন ইহা বুঝিতে পারিলাম।

যাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া মনে হইত তাহার মধ্যেও অনেকের মত আমার বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হইত না। তবে ইঁহাদের মধ্য হইতে ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব আমার লাভ হইয়াছিল। এই রূপে প্রায় ৩ বৎসর ভ্রমণের পর একজন জ্ঞানী পুরুষের দর্শন পাই। তাঁহার দুই চারিটি কথায় আমার চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। বস্তুত আমার এই দীর্ঘ ভ্রমণ ও কঠোর ক্লেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আজ প্রাপ্ত হইলাম। যদিও ইনি অনেক সময় ত্যাগী পুরুষের ন্যায় নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া বেড়ান কিন্তু ইনি সন্ন্যাসী নহেন। কাশীতে ইঁহার একটি আশ্রম কুটির বা বাসগৃহ আছে। তথায় তাঁহার পত্নী ও এক কন্যা থাকেন। তাঁহারাও অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। সেবাই তাঁহাদের জীবনের কার্য্য। এই মহাত্মার নাম দাস মঙ্গলানন্দ। ইঁহার সঙ্গে আমার সর্ব্ব প্রথমে হরিদ্বারে দেখা হয়। অল্পক্ষণের কথাবার্ত্তায় এমন আকৃষ্ট হইলাম যে, সে এক আশ্চর্য্য

ব্যাপার। সাধারণ সাধু সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার বেশ ভূষা নয়, অথচ তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে দেহ পরিচ্ছদাদি পর্য্যন্ত সমস্তই ত্যাগী সাধু পুরুষের অনুরূপ। হটাৎ আমার মনে হইল মণীন্দ্রনাথ বুঝি রূপান্তর হইয়া আমার হৃদয় বেদনা দূর করিতে আসিয়াছেন। কিছু দিন তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া আমরা কাশীতে আসিলাম। আমি মাতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম।

(ক্রমশ)

---*---

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

শারদীয় উৎসব বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা প্রধান পর্ব্ব। পূজার অবকাশে প্রবাসীগণ নিজাবাসে আসিয়া প্রিয়জন সঙ্গে আনন্দিত হন। অনবকাশ বিধায় যে সকল কর্ম্ম অসম্পন্ন থাকে তাহা সম্পন্ন করিতে অনেকে সচেষ্ট হন, কেহ দেশ ভ্রমণ, কেহ আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট গমন, কেহ বা এই অবকাশে বিষয় বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। আবার কেহ আপনার অসংযত প্রবৃত্তি ও বাসনা কামনার চরিতার্থতায় অবসর কাল ক্ষেপণ করিয়া পাপ বৃদ্ধি করে। ভক্তধর্ম্মপিপাসুগণ অবকাশ কালে ধর্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গে মিলিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনায় এবং ভক্তি প্রেম বিনিময় করিয়া তৃপ্ত হইতে চেষ্টা করেন।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, গঙ্গার অবনতি সম্বন্ধে জরীপ বিভাগের ডিরেক্টর মেজর হার্ষ্টের রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত নদী সংস্কার কার্য্য স্থগিত আছে। সুতরাং যমুনা-সংস্কার সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ এখনো উপস্থিত হয় নাই।

আমরা গতবারে গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীর রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে কাহার কাহার সায় পাইলাম। এখন আসল কথা নিস্বার্থভাবে কার্য্য করা ও কার্য্য করানো দুই পক্ষেই নাকি অন্তরায় আছে। নিস্বার্থভাবে দেশের কার্য্য করিবার জন্য অগ্রসর কি কেহ নাই ?

মিউনিসিপালিটীর বাহিরে লোকালবোর্ডের অন্তর্গত যে কাঁচা রাস্তা ইছাপুর, শ্রীপুর ঘাটকোমরা গ্রামে গিয়াছে, তাহার অবস্থা আরো খারাপ দেখা যায়। এখন উহার ভার ইউনিয়ান কমিটীর হাতে, ইউনিয়ান কমিটীর সভ্যগণ কেন ঐ সকল রাস্তা ভাল করিবার চেষ্টা করেন না ?

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম এবার যশোহর সাহিত্য সম্মিলনে আমাদের কুশদহর কৃতি-সন্তান শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু (বি, এস, সি, গবর্ণঃ অবসরপ্রাপ্ত জিওলজিষ্ট) মহাশয় বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

বাংলা দেশে দিন দিন লঘু সাহিত্যের অত্যন্ত বিস্তার হইতেছে। গুরু সাহিতের দিকে সাধারণের অনুরাগ তেমন দেখা যায় না। যেখানে যত পুস্তকালয় ও পাঠাগার হইতেছে, কেবল নাটক নভেল আর গল্পের পাঠকই অধিকাংশ। খাঁটুরা পাঠাগারে এত দিন পাঠক হইত না, কিছুদিন হইতে উহার পুস্তক বিভাগ হওয়ায় নাটক নভেল পড়িবার পাঠক কিছু কিছু দেখা যাইতেছে।

আমরা শুনিলাম এবারও নাকি চাষিরা বাঁমড়ে পাট পচাইতেছে; যদি ইহা সত্য হয় তবে হয়দাদপুর—জমিদার কাছারী হইতে ইহার প্রতিকার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

সাহায্য প্রাপ্তি

(৩১ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩১ ভাদ্র পর্য্যন্ত)

শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় (ডেপুটি ইঃ স্কুলস)	৫৲
,, পতিরাম চট্টোপাধ্যায় (ইঞ্জিনিয়ার) ...	৩৲
রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুর	৪৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ পাল	৩৲
,, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কনট্রাক্টার)	২৲
,, নীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল	২৲
,, সহায় নারায়ণ পাল	৩৲
,, যোগীন্দ্রনাথ দত্ত (আহিরিটোলা)	৩৲
,, ক্ষিরোদগোপাল দত্ত (কাঁটাপুকুর)	২৲
শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত	২৲
শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র রক্ষিত	৪৲
শ্রীমতী সুশীলাবালা রক্ষিত	২৲
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত (হাটখোলা)	৫৲



"বঙ্গের বাহিরে-বাঙ্গালী" প্রণেতা

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"তোমারি নামে ফুটেছে ফুল,
গন্ধে প্রাণ করেছে আকুল,
যতনে গাঁথিয়া এনেছি মালা
আদর করে' একবার পর না।"

সপ্তম বর্ষ,  কার্ত্তিক, ১৩২২  সপ্তম সংখ্যা

সঙ্গীত

ললিত—যৎ

কি ভয় ভাবনা রে মন লয়েছি যাঁর আশ্রয়;
সর্ব্বশক্তিমান তিনি অনন্ত করুণাময়।
একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল বলে ডাকলে তাঁরে,
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু দেখা দিবেন তোমায়।
কি করিবে শত্রুগণে, অপমানে নির্য্যাতনে,
না হয় মরিব প্রাণে গাইয়ে তাঁহার জয়।
শুনেছি আশা-বচন, মরিলেও পাব জীবন,
চিরকাল থাকিব সুখে এই তাঁর অভিপ্রায়।
নির্জ্জন হৃদি-কুটীরে, লয়ে সেই প্রাণের ঈশ্বরে,
আনন্দ আহ্লাদে সদা করিব জীবন ক্ষয়।
তাঁর কাছে খাঁটি হয়ে, থাক রে সদা নির্ভয়ে,
বিশ্বাসের দুর্গে বসে' বল জয় জয় দয়াময়।

(ব্রহ্মসঙ্গীত)

পূজার অবকাশে

—✱—

এবার পূজার অবকাশ অতি অল্পই পাওয়া গেল। কিন্তু অল্পের মধ্যে আনন্দ অনেক পাইলাম। বিজয়ার ভক্তি প্রেম সাদর সম্ভাষণ রূপে সে আনন্দের আভাস বন্ধুগণের নিকট কোন্ ভাষায় প্রকাশ করিব জানি না।

২৭শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার ষষ্ঠীর দিনই প্রকৃতপক্ষে কার্য্যালয় বন্ধ করা গেল। গৃহিণী গেলেন হরিনাভি—এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত প্রীতি-সদ্ভাবের আকর্ষণে তাঁহাদের দেশে। প্রত্যুষে তাঁহাকে বিদায় দিয়া যাহা কিছু খুজরা কাজ ছিল শেষ করিয়া বৈকালে গেলাম কোতরং,—ভগ্নী ত্রৈলোক্যের নিকট। বড়বাজার ঘাটে ষ্টীমার হইতে উত্তরপাড়ার ঘাটে নামিয়া একমাইলের বেশী কোতরং। ভদ্রকালী ও কোতরংএ বেশী টাইলের প্রধান খনি। অল্প অল্প বৃষ্টিতে ষ্টীমারের ভিড়ের মধ্যে কোতরং গিয়া কিন্তু বেশ আনন্দ শান্তি পাইলাম।

পরদিন শুক্রবার সপ্তমী; মধ্যাহ্নে বরাহনগর-পথে একটি কাজ সারিয়া কলিকাতায় আসিতে বেলা অবসান হইয়া গেল। রাত্রে বিনয়ের বাসায় আহারাদি করিতে ও সামান্য কাজগুলি গুছাইয়া লইতে সেদিন কাটিয়া গেল।

পরদিন শনিবার অষ্টমী ৪টার ট্রেণে গোবরডাঙ্গায় যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার সময় খাঁটুরা দত্ত-বাটী আসিয়া প্রথমে প্রমথ ভায়ার সহিত স্কুলের প্রাইজ-বিতরণ ও মিউনিসিপালিটীর রাস্তা প্রস্তুত-প্রণালী-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে হইতে বন্ধুবর যোগীন্দ্রবাবু আসিয়া পড়িলেন। ভক্তি বিনয়ে তখন তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। তাঁহার সাদর আহ্বানে দত্ত-বাটীর বারান্দায় আমার নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম স্থানটিতে আশ্রয় লইলাম।

ঠাকুর-দালানে আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। দত্ত-বাটীর এখনকার আড়ম্বর-বিহীন দুর্গোৎসবেও কিন্তু সেই বহুদিনের সঞ্চিত ভাব ও সংস্কার-জনিত যেন তখন ঠাকুর-দালান গম্ গম্ করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যোগীন্দ্র বাবু জনৈক প্রতিবাসী ব্রাহ্মণকে ঠাকুর দালানে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আপনি না আসিলে আমার মন তৃপ্ত হইবে না।" বারান্দায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যোগীন্দ্রবাবু ব্রহ্মোপাসনায় বেশ যোগ দেন, আবার মূর্ত্তি-পূজার মধ্যেও বেশ ভক্তি বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখেন, ইহা তো বেশ উদার ভাব! আমি কিন্তু দেশবাসীর মন হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তাঁহারা আমাদের সম্বন্ধে

বাহিরে মুখে যতই সদ্ভাব প্রকাশ করুন না কেন, হৃদয় হইতে তফাৎ করিয়া রাখেন। আমরাও সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য, উদার ধর্ম্মাদর্শে চরিত্রগঠনের জন্য, বাহ্যিক মমতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যদি ঐ পথে জীবনের প্রকৃত আদর্শ এবং আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম্ম লাভের সম্ভাবনা থাকিত, তবে বোধহয় ঐ প্রচলিত পন্থার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধ হইত না। তারপর ভাবিলাম যোগীন্দ্রবাবু দুই দিক রাখিয়া কি ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতেছেন না? তাহাতে মনে হইল যদি তিনি কেবল এই প্রচলিত পুরাতন প্রণালী লইয়াই থাকিতেন তবে সকলের যে-অবস্থা তাঁহারও তাহাই হইত। তিনি দীর্ঘকাল ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিয়া আসিতেছেন বলিয়াই তাঁহার জীবনে এতটুকু ধর্ম্মপিপাসা আসিয়াছে। মানুষ যতই ধর্ম্ম-চিন্তায় অগ্রসর হইবে ততই উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিবে। মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য পূজার অসারতা বুঝিয়া বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার আকাঙ্ক্ষা এদেশবাসীর ভবিষ্যৎ বংশের মধ্যে আসিবে না কি? তাহা কে বলিতে পারে! সেই আদর্শ ধারণ করিবার জন্য বিধাতা বুঝি আমাদিগকে কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া গড়িতেছেন। যাহা হোক তারপর রাত্রে যোগীন্দ্র বাবুর সেবানুরাগ দেখিয়া এবার সত্যই অবাক হইয়াছিলাম।

পরদিন রবিবার নবমী, দশমীর পূজাও সমাপ্ত। প্রাতে গোবরডাঙ্গা ঘুরিয়া গৈপুর উপস্থিত হইলাম। চারুবাবু, নৃত্যগোপাল বাবু, নবীন বাবু প্রভৃতি খুবই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। গৈপুর আসিয়া দেখিলাম এখানে মিলিতপূজা। মনে হয় এতদিন পৃথক পৃথক যে পূজা হইয়াছে এখন সেই দিনই আসিয়াছে,—ভাই ভাই একত্রে মিলিয়া মায়ের পূজা—শক্তিপূজা করিতে হইবে।

আমি ১টার ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিব ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু চারুবাবু কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না, আহার করিতে হইল,—২টা বাজিয়া গেল। গৈপুরে চারুবাবুর সংস্রবে আসিয়া এই মহত্বই বার বার দেখি, সংস্কারে সংস্কারে কত পার্থক্য—হিন্দুয়ানীর কঠোর বাঁধাবাঁধি নিয়মে আমার যেন হাঁপ লাগে। তবু হৃদয় যেন ইচ্ছা করিয়া সে-বন্ধনের মধ্যে স্থির শান্ত হইয়া থাকিতে চায়, এ যে প্রেমের বন্ধন, এ তো দণ্ডের বন্ধন নয়।

৪ টার ট্রেণে কলিকাতায় রওনা হইলাম। এখানে ছিল "নববিধান-বিশ্বাসী সমিতির" অধিবেশন, আজ সেই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিন-

ব্যাপী উৎসব। ব্রাহ্মের উপাসনায় আসিয়া যোগ দিলাম। কিন্তু পরিশ্রান্ত শরীর অধিকক্ষণ সমর্থ হইল না, আরাধনা-শেষে চলিয়া আসিলাম। পথে দেখি, চাটুয্যে মহাশয়! এখানে চাটুয্যে মহাশয়ের পরিচয় দিতে গেলে প্রসঙ্গ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, তবে সংক্ষেপে বলি ; তিনি শ্রদ্ধেয় পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা—ঘোষের লেনস্থ সুধাংশু বাবুর বাড়িতে থাকেন। তিনি ঐ বাড়ির সর্ব্বময় কর্ত্তা অভিভাবক, আবার ঐ বাড়ির তিনি কেহই নন—দ্বারে দ্বারী মাত্র বলিলেও হয়। চাটুয্যে মহাশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু (খুব গোঁড়া কি না, সে কথাটা কোন্ দিক ধরিয়া কিভাবে বলিব বড় শক্ত বোধ হয়) সুতরাং তাঁহার সঙ্গে প্রথমে ধর্ম্মতর্ক-প্রসঙ্গে আমার কিছু দিনের আলাপ। এখন আমাদের মধ্যে একটু আকর্ষণ জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

চাটুয্যে মহাশয়ের একটি কথা যাহা তিনি একদিন প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,তাহা আমার মনে বড়ই আনন্দদায়ক হইয়াছে ; তিনি পশ্চিমে কোন স্থানে গিয়া একদিন একটি পূজিত স্থানে উপস্থিত হন,সেখানে এক সাধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন. "হিঁয়া ক্যা হ্যা জান্‌তা ?" চাটুয্যে মহাশয় বলেন ; "হিঁয়া তো দেওতান্ কি আস্থান হ্যায়।"সেখানে একখানি পাথরের উপর পূজা হইত। সাধু সেই পাথর লক্ষ্য করিয়া বলেন,—"ইয়া পহেলে থে পাথর, ঠোক্কর খাতে খাতে টিক্ গেই, আব তো পূজা চড়ৎ।" অর্থাৎ প্রথমে ছিল পাথর, ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে চটে নাই, এই জন্য এখন লোকে দেখিল যে, এখানি সাধারণ পাথর নয়, ঘা খেলেও চটে না ; যে মানুষ সুখ দুঃখের ঘা খাইয়াও টিকিয়া থাকে—স্বরূপ হইতে চটে না, ভবিষ্যতে তাহাকে সকলে পূজা করে। চাটুয্যে মহাশয়ের সঙ্গে পথে দাঁড়াইয়া ২।৪টি কথা হইল। তিনি বলিলেন "ব্রাহ্মসমাজে নিশ্চয়ই মহৎ ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের (হিন্দুর) ভাবের ঐক্যস্থাপন-চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য যেখানে একই সত্যানুসন্ধান ভাব আছে, সেখানে ঐক্য হইবে না কেন ?"

পরদিন সোমবার,—২টার সময় 'রামমোহন লাইব্রেরী হলে' নববিধান-বিশ্বাসী সমিতির অধিবেশন ছিল। তাহাতে যোগ দিলাম। তার মধ্যে শ্রদ্ধেয় ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রচারক মহাশয়ের একটি সারবান প্রস্তাব, 'নববিধান বিশ্বাসী মণ্ডলী' "প্রতিবাসীর প্রতি প্রেম সাধন করুন, তাহা হইলে মণ্ডলীর মধ্যে পরস্পরের সঙ্গেও যোগস্থাপন হইবে।" আর একটি প্রস্তাব শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ তালুকদার মহাশয় করেন,—"ব্রহ্মজ্ঞানী না হইলে কেহ নববিধানী হইতে পারেন না।" এই প্রস্তাব সূত্রে শিখধর্ম্ম শাস্ত্র-বর্ণিত ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ দুই তিনটি

মাত্র উল্লেখ করিয়া যাহা বলেন, তাহা অতি মধুর বোধ হইয়াছিল। তালুকদার মহাশয়ের নিজ জীবনগত ভাবের সহিত উহা বলিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা এত মিষ্ট লাগিয়াছিল। কেন না, কোন শুষ্ক উপদেশ কোন দিন প্রায়ই হৃদয়গ্রাহী হয় না।

শিখধর্ম্ম-শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত আছে;—"ব্রহ্মজ্ঞানী সদা সমদর্শী—ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অমৃত বর্ষিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানী দীন দরিদ্রের সহিত মিলিত হন, ব্রহ্মজ্ঞানী পরোপকারে সদাসুখী, ব্রহ্মজ্ঞানীর একই ভাব, ব্রহ্মজ্ঞানীর চিত্ত পরমানন্দে পূর্ণ, ব্রহ্মজ্ঞানীর গৃহে সদা আনন্দ। অত্যন্ত ভাগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানীর দর্শন লাভ হয়।" ইত্যাদি।

বাসাবাড়ি বা কার্য্যালয়ের অংশ খালি হওয়ার অন্য সৎ সঙ্গী ভাড়াটিয়া স্থির করা ও বর্ত্তমান মাসের কার্য্যারম্ভের জন্য মঙ্গলবার হইতে উদ্‌যোগী হইতে হইল বলিয়া এবার পূজার অবকাশ এই পর্য্যন্ত শেষ হইল।

বঙ্গে দুর্গোৎসব

——)*(——

এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, রোগ-শোক-জর্জ্জরিত বাংলা দেশে কয়দিন ধরিয়া কিসের আনন্দ-কোলাহল-ধ্বনি শুনা যাইতেছিল? আবার সেই ধ্বনি সাগর-গর্ভে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় কোথায় মিশাইল? এই হর্ষ-কোলাহল কাহারো হৃদয় মনকে যথার্থভাবে স্পর্শ করিতে পারিল না কেন? উহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই ঘন বিষাদ-মেঘ নরনারীর মুখমণ্ডলকে আবার আচ্ছাদিত করিল কেন? ভক্তগণ বিজয়ার দিনে ভগবতীকে বিদায় দিয়া আজ অশ্রু-নীরে ভাসিতেছেন কেন? শীর্ণকায় জীর্ণপ্রাণ দীর্ণহৃদয় বাঙালী তিন দিন মহা সমারোহে মহাশক্তির পূজা করিল, কিন্তু তিন দিনের বেশি আরাধ্য দেবীকে গৃহে রাখিতে পারিল না! বিজয়ার দিন তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইল।

মহাশক্তি কোথায় লুকাইলে! শুনিয়াছি প্রকৃত সাধকের নিকট উপাস্য দেবতা চিরদিন বাঁধা থাকেন। তবে কি এই সুবিস্তৃত বাংলা দেশে প্রকৃত সাধক নাই? দুর্ব্বল বাঙালীর গৃহে মহাশক্তির আরাধনা কি সত্য সত্যই তামসিক ব্যাপার রূপে পরিগণিত হইয়াছে? এদেশে এমন একদিন ছিল, যখন শক্তি-পূজা সাত্ত্বিক কাণ্ড বলিয়া গণ্য হইত; কিন্তু এখন আর সেদিন নাই।

এখন উহা প্রকৃতপক্ষে তামসিক কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই পতিত জাতির পক্ষে এমন সুন্দর আরাধ্য দেবতা আর নাই। দশভুজে যে মহাশক্তি নিরন্তর বিদ্যমান, তাহার মর্ম্ম আধুনিক বাঙালী বুঝিবে না; সুতরাং তাহারা যে দশভুজা শক্তির পূজা করে, তাহা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। যে জাতি দশভুজার প্রকৃত উপাসক হইয়াছে, বিদ্যা ও বলকে সে জাতি নিশ্চয়ই আয়ত্ত করিয়া থাকে। লক্ষ্মী ও সরস্বতী দশভুজার চিরপার্শ্ববর্ত্তিনী, কার্ত্তিকেয় বীর্য্য ও হস্তীমস্তক গণেশের অসামান্য মানসিক ধারণা-শক্তি সে জাতির অনায়াসলব্ধ সম্পত্তি হইয়া থাকে।

একতা ভিন্ন দুর্ব্বল পতিত জাতির উদ্ধারের যে আর দ্বিতীয় উপায় নাই! দশভুজেই যে মহাশক্তি বিরাজমান, শক্তি-পূজা যে সর্ব্বপ্রকার দুর্গতিনাশের প্রধান সহায়, তাহা এই অভিশপ্ত জাতিকে শিক্ষা দিবার জন্যই এদেশে শক্তি-পূজা প্রচলিত হইয়াছে। জাতীয় অভ্যুত্থানের কেন্দ্র-দেবতা দশভুজা শক্তি, এই একীভূত শক্তি হইতে ক্রমে ক্রমে ধন, বিদ্যা, বীর্য্য ও জ্ঞানের উৎপত্তি হইলেই জাতীয় কল্যাণের চিরশত্রু নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মূর্ত্তি অসুর বিনাশ করিতে পারা যায়। যে জাতি দশভুজা শক্তি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয় ও গণেশ এই পঞ্চ দেবতার প্রকৃত উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছে, কোনো অসুর সে জাতির উন্নতি-পথে বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না। এক অসুর বধ করিলে, তাহার দেহ-মধ্য হইতে অন্য অসুর জন্মিয়া কিছুক্ষণ বিভীষিকা দেখাইতে পারে বটে, কিন্তু সে জাতির উন্নতি চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। বাঙালী যদি এই উপাস্য দেবতার সত্যরূপের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত, তাহা হইলে এদেশের দুঃখ দুর্গতি এতদিনে বিলুপ্ত হইত। দুর্গতিনাশিনী জীবন্ত দুর্গার পূজা বাঙালী ভুলিয়া গিয়াছে। ষষ্ঠীর উদ্বোধনের প্রকৃত তাৎপর্য্য বাঙালী এখন আর বুঝিতে পারিতেছে না। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করিয়া কাঠ খড়ের পূজা করিতেছে; সুতরাং উপাস্য দেবতার প্রকৃত উপাসনার ফললাভে বঞ্চিত হইতেছে। তজ্জন্যই আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হইতেছে না। দশভুজা শক্তির প্রকৃত উপাসনা করিতে হইলে বলিদানের প্রয়োজন, বলিদান ব্যতীত তাঁহার প্রকৃত পূজা হইতে পারে না। বাঙালী ছাগ, মেষ, মহিষ বলিদান করিয়া মনে করে সে শক্তি-উপাসক হইয়াছে, কিন্তু এই পূজায় শক্তিদেবী কখনই সন্তুষ্ট হন না। তিনি প্রকৃত ভক্তের নিকট ইহা অপেক্ষা অনেক কঠোর পূজা পাইবার আশা করেন। সে পূজায় যে বলিদানের প্রয়োজন, বাঙালী এখনো তাহা দানের অধিকারী হয় নাই বলিয়াই এদেশে শক্তি-পূজায় কোনো ফললাভ হইতেছে না। জাতীয় শক্তির আরাধনায়

ভক্ত যখন আত্মজীবন বলিদানে প্রস্তুত হইতে পারেন,তখনই শক্তি-পূজার ফললাভ হয়। বাংলা দেশে এমন সাধক কে আছেন, যিনি দশভুজা শক্তির আরাধনায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইবেন? এখানে তামসিক উপাসক বিস্তর আছেন, কিন্তু সাত্বিক উপাসক নাই। বাক্যের পূজায় শক্তি-আরাধনা চলে না, কার্য্যের পূজা চাই। যতদিন বাঙালী জীবনদানে জীবন্ত শক্তির পূজা করিতে অগ্রসর না হইবেন,তত দিন দুর্গোৎসব করা বৃথা।

বিজয়ার দিনে মহাশক্তির মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া বাঙালী আজ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছ কেন? তোমার পক্ষে এ বিজয়া নূতন নহে। তুমি প্রকৃত শক্তি দেবীকে বহুদিন বিসর্জ্জন দিয়াছ, তোমার পক্ষে এখন চিরবিজয়া। তুমি তোমার যথার্থ কল্যাণের উদ্দেশে নিজ স্বার্থকে বলিদান করিয়া যতদিন দশভুজা শক্তির প্রকৃত উপাসক হইতে না পারিবে, ততদিন আর শক্তিপূজায় প্রবৃত্ত হইয়ো না। নির্জ্জীব দেবতার উপাসনায় কোনো ফললাভ হইবে না,জীবন্ত দেবতার জীবন্ত পূজা অগ্রে শিক্ষা কর, পরে শক্তিপূজায় প্রবৃত্ত হইয়ো। বিজয়ার পর পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া একে অন্যকে আলিঙ্গন করিতেছ, চিরদিনের জন্য যদি এই শত্রুতা ভুলিতে পার; ভাই ভাইকে এবং ভগ্নী ভগ্নীকে যদি চির-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার; তোমার শরীরে যে ভাই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তুমি যদি তাহাকে আদর করিতে পার, তাহা হইলে দশভুজা শক্তির উপাসনায় অধিকারী হইবে। অগ্রে এই মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হও,পরে মহাশক্তির পূজা করিয়ো। সমস্ত নীচতা, ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, ভেদবুদ্ধি ও আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই সাধনায় প্রবৃত্ত হও।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

সারোদ্ধার

(শঙ্করাচার্য্য)

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম-তত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা।
ভ্রান্তা এবাখিলা স্তেষাং ক্ব মুক্তি কেহ বা সুখম্॥

(পঞ্চদশী)

অর্থাৎ যতদিন মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ঈশ্বরতত্ত্ব না জানিতে পারেন, ততদিন তাঁহারা ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়। এ অবস্থায় তাঁহাদের মুক্তি কোথায়, আর সুখই বা কোথায়?

কর্ম্মচক্র

৫

ক্রমে আঁধার ঘনাইয়া আসিল। সেই শান্তিপূর্ণ বিহঙ্গমের কলকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার গাঢ় নীরবতার কোলে লীন হইয়া গেল। প্রকৃতির সেই সরল সুন্দর মধুর ছবি, নিমিষে কালিমায় ভরিয়া গেল! বাহিরের অন্ধকারের সহিত পরেশনাথের হৃদয়ের আঁধার মিলিত হইয়া এক হইয়া গেল।

পরেশনাথ নির্জ্জন তরুতলে বসিয়া মহাপ্রস্থানের সহজ উপায় ভাবিতে লাগিল। মানব জীবনের গন্তব্য পথে এ কি ভীষণ প্রহেলিকা! এ কি অদ্ভুত রহস্য! পরেশনাথ সবেমাত্র যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছে, সে এখনো বালক, তাহার হৃদয়-বৃত্তি সমস্ত এখনো বিকশিত হয় নাই। তাহার বালক-স্বভাব-সুলভ চঞ্চল চাহনিতে, সুকোমল গণ্ডস্থলে যেন একটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল কমনীয়তা মাখানো ছিল। তাহার হাসিভরা মুখখানি শুখাইয়া এতটুকু হইয়া গেল! একটা বিলাপ-রাগিণীর করুণ সুর তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিতে ছিল! কেন সে আজ সামান্য পিতৃ-তিরস্কারে স্বেচ্ছায় জীবনটাকে বিলাইয়া দিতে চলিল!

পরেশনাথ বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে পুলের নিকটে আসিল। দুই মিনিট স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিয়া লইল, পরে জামা জুতা ও চাদর খুলিয়া ফেলিল। জামার ভিতর জুতা যোড়াটি রাখিয়া উহাতে চাদর জড়াইয়া একটি পুঁটুলি করিয়া পুলের উপর এক পার্শ্বে রাখিয়া দিল। পরেশনাথ ঘন অন্ধকারের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে একগলা জলে নামিল, তখন তাহার চিন্তাক্লিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর দিয়া দুইটি মোটা মোটা অশ্রুধারা জাহ্নবীর পূত সলিলে আসিয়া মিশিতে ছিল; একবার সে তাহার পিতামাতাকে স্মরণ করিল, উদ্দেশে বিদায় ভিক্ষা করিয়া প্রণাম করিল। পরে একগলা জলে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময় স্তব্ধ রজনীর নীরবতা ভেদ করিয়া একটি গানের শেষ চরণদুটি আসিয়া পরেশ-নাথের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সে শুনিল—

"কালী বলে' প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী-জলে,
অন্তিমে স্থান পাই যেন মা তোর চরণ-তলে।"

পরেশনাথ শুনিতে শুনিতে এক পা বাড়াইয়া দিল, সে গভীর জলে আসিয়া

ডুবিয়া গেল। কেহ তাহাকে দেখিল না—তাহার জন্য কেহ কাঁদিল না। সে নীরবে জাহ্নবীর তরঙ্গতলে আপনার স্থান আপনি বাছিয়া লইল।

পরেশনাথ ডুবিয়া দুই ঢোক জল খাইয়া হাঁকু পাঁকু করিতে লাগিল। প্রাণের সহিত দেহের একটা ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে লাগিল, তাহার প্রাণটা ভাসিয়া উঠিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু দেহটা জল খাইয়া একটু ভারী হওয়ায় প্রাণ তাহাকে ভাসাইয়া তুলিতে পারে না। পরেশনাথ জলের ভিতর হাত পা ছুঁড়িয়া অস্থির ভাবে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। মৃত্যুর ভীষণ যন্ত্রণা মুহুর্মুহু অনুভব করিতে লাগিল। শত শত বিভিষীকাপূর্ণ মৃত্যুর ভয়াবহ ছবি সকল, তাহার হৃদয়ে সতত প্রতিফলিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, ওঃ কি ভীষণ যন্ত্রণা! যদি একবার সে উঠিতে পারে, তাহা হইলে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর দ্বারে আর আসিবে না।

পরেশনাথ প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে সহসা দুই গাছা মোটা কাছি তাহার হাতে আসিয়া পড়িল, সে উহার উপর পা দিয়া সবেগে ভাসিয়া উঠিল ও ঐ কাছি অবলম্বন করিয়া তীরে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। সে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া গলায় আঙুল দিয়া একবার বমি করিয়া ফেলিল, তাহাতে অনেকটা জল উঠিয়া গেল। সে একটু সুস্থ হইয়া বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিবার আশায় উপরে উঠিয়া তাহার পুটুলিটির অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু তাহা আর খুঁজিয়া পাইল না।

ঠিক যে সময় পরেশনাথ ডুবিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় কৌপিন-ধারী ভস্মাচ্ছাদিত চিম্‌টা-কমণ্ডলু-হস্তে এক সাধু "একটি পয়সা দেলায় দে রাম—পোয়া ভর আটা দেলায় দে রাম" করিতে করিতে এই পুলের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। সে নানা স্থানে প্রত্যাখ্যাত হইয়া মনে মনে সীতারামের মুণ্ডপাত করিতে করিতে যখন পুলের উপর আসিয়া মালিকশূন্য পুঁটুলিটি দেখিতে পাইল, তখন সে মনে ভাবিল বুঝি সীতারাম তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া ঐ পুঁটুলিটি তাহার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। সে একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া উহা তাহার ঝুলি-জাত করিয়া পুল পার হইয়া চলিয়া গেল।

পরেশনাথ পুঁটুলিটি খুঁজিয়া না পাইয়া অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়া সে-পুল পার হইয়া পোর্টকমিশনারদের একটি করোগেট সেডে আসিয়া আশ্রয় লইল। সে সিমেণ্টকরা মেঝের উপর আর্দ্র বসনে শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—এখন কি করা উচিত, বাড়িতে ফিরে যাওয়া কথনই হবে না। এতক্ষণে হয় তো আমাদের পাড়ায় হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়েছে। বাবা হয় তো থানায় থানায় ডায়েরি করিয়া

দিয়াছেন, ইস্কুলের মাষ্টারদের কাছে লোক পাঠাইয়াছেন, আমার বন্ধুবান্ধবদের ভিতরে পর্য্যন্ত হয় তো জানাজানি হইয়া গিয়াছে, হয় তো তাহারা হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে বসিয়া আছে, মোটের উপর সকলেই জানিয়াছে যে, আমি মরণের পথে চলিয়াছি, এখন যদি আমি হঠাৎ বাটী যাইয়া উপস্থিত হই, তাহা হইলে সকলেই আমাকে দেখিয়া হাসিবে। বন্ধুবান্ধবেরা টিট্‌কিরি দিয়া বলিবে, "পরেশনাথ,মৃত্যুটা ততো সহজ নয়।" ওঃ হো, তা আমি সহ্য করিতে পারিব না, পরের বাড়ি চাকর থাকিব সেও ভালো তবু এখন বাড়ি যাইব না। পরেশনাথ সেডেতে শুইয়া চিন্তার অনন্ত স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে।

চোর-সাধু একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়া পুঁটুলিটি মহাআনন্দে খুলিয়া পাদুকা যুগল দেখিয়া সীতারামের উদ্দেশে বিড়বিড় করিয়া কি বলিল, পরে পাদুকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া যাহা পাইল যথালাভ মনে করিয়া পরেশনাথ যে সেডে ছিল বরাবর সেই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইল। সাধু এক ছিলিম গাঁজা সাজিয়া একটি দম মারিল, পরে পরেশনাথকে কলের কুলী মনে করিয়া কলিকাটি তাহার মুখের নিকট আনিয়া বলিল 'পিও বেটা পিও।' পরেশনাথ যখন বলিল,—"আমি গাঁজা খাই না" তখন সে মুখ-ভঙ্গি করিয়া আর একটি দম দিয়া কলিকাটি রাখিয়া তাহারি পার্শ্বে শয়ন করিল।

বালক পরেশনাথ এই সাধু-সহবাসে রাত্রিযাপন করিতে ভীত হইল। তাহার মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে এরূপ সাধু প্রায়ই চোর, বদমায়েস হয়—সুবিধা পাইলেই পথিকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। কিন্তু পরেশনাথের ভীত হইবার কোনো কারণ ছিল না, তাহার পরিধেয় বস্ত্রখানি ছাড়া অপহরণ করিবার আর কোনো সম্পত্তি তাহার সঙ্গে ছিল না। পরেশনাথ মরণের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তাহার প্রাণের উপর একটা বড়ই মমতা জন্মিয়াছিল। সে ভাবিল যদি সাধু তাহাকে এই নির্জ্জন স্থানে মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়! কিন্তু তাহাকে মারিলে সাধুর কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না, তাহা সে একবারও ভাবিল না। পরেশনাথ সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল, এবং মনে মনে স্থির করিল রাত্রিটা কোনো ভদ্রলোকের বাটীতে চাকর থাকিয়া কাটাইয়া দিবে, পরে প্রভাতে উঠিয়া মফস্বলের দিকে চলিয়া যাইবে।

রাত্রি এগারোটা বাজিল, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর পরেশনাথ কলিকাতার রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন ভদ্রপল্লী স্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে। অনেকেরই সদর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পরেশনাথ ঘুরিতে ঘুরিতে কুমারটুলির

একটি তৃতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দেখিল তখনো সেই বাটীতে লোকসমাগম হইতেছে, চারিদিকে আলো জ্বলিতেছে, পরেশনাথ ধীরে ধীরে সেই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং একটি বড় বৈঠকখানার দ্বারের নিকট আসিয়া অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সে দেখিল ভিতরে দুইটি লোক খাতা লিখিতেছে, কত টাকার লেন্ দেন্ হইতেছে, কত লোক আসিতেছে কত লোক যাইতেছে কিন্তু হতভাগ্য পরেশনাথের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকাইল না। লোকের ভিড় একটু কমিলে পরেশনাথ বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে লোকটি নিকটে বসিয়া খাতা লিখিতেছিল তাহাকে উদ্দেশ করিয়া [illegible] বলিল, "মশাই আপনাদের এখানে কি চাকরের দরকার আছে ?" সরকার মশাই খাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "হু আছে, লোক কোথায় ?"

বেচারি পরেশনাথ যুক্তকরে সজলনয়নে,—"বলিল হুজুর, লোক এখানেই উপস্থিত, আমিই সেই লোক।" সরকার মশাই বিস্ফারিতনয়নে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"তুমি—নিতান্ত বালক দেখচি—আচ্ছা বোসো ঐখানে," পরেশনাথ বসিয়া রহিল। সরকার মহাশয় নগেন্দ্রবাবুকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে নগেন্দ্রবাবু আসিয়া বলিলেম,—"কিহে পাঁচু শুতে যাচ্ছিলুম আবার ডেকে পাঠালে কেন, কিছু হিসাবের গোলমাল আছে নাকি ?"

"আজ্ঞে না সে সব কিছু নয়—তবে আপনি যে সেদিন বলেছিলেন বড় খোকা আর ছোট খোকার জন্যে একজন লোক দেখতে, তা আজ ঘরে বসেই একটি লোক পাওয়া গেছে, ও খোকাদের নিয়ে বেড়াতেও পারবে খেলাতেও পারবে।"

"কোথা সে লোক।"

পরেশনাথ বিনীতভাবে নগেন্দ্র বাবুর সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

নগেন বাবু তাহার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "তুমি চাকরি করবে ?"

"আজ্ঞে হাঁ ?

"কেন ?"

"বড় গরীব।"

"তোমার নাম কি ?"

এইবার পরেশনাথ বড়ই বিপদে পড়িল—অনভ্যস্থ অসত্যটা হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া একেবারে বাহির হইল না, সে দুই একবার ঢোক গিলিয়া শ্রী-প-প-প ফরেশ নাথ ঘোষ বলিয়া ফেলিল।

পাঁচু সরকার মুখের হাসি চাপিয়া রাখিয়া বলিল, "সে কিহে, ফরেশনাথ কি নাম হয়—তুমি কি তোত্‌লা—তোমার নাম কি পরেশনাথ ? পরেশনাথ প্রমাদ গণিল—সে জোড়হস্তে কাতরবচনে বলিল, "আজ্ঞে আমি তোত্‌লা নই আমাকে নর্‌সা বলে ডাক্‌লেই হবে।"

"কেন তোমার আদত নাম কি।"

"আজ্ঞে চাকর-বাকরের নাম প্রায়ই হরে নরসা কেলো এই রকমই হয়।"

পাঁচু সরকার হাসিয়া বলিল—"তুমি কি কাজ করতে পারবে?" পরেশ বুঝিল চাকর থাকিলেই কেলো যাহা করে তাহাই করিতে হয়। সে নতমুখে বলিল—"আজ্ঞে,ছেলে ধরবো, তামাক সাজবো, হাট বাজার কোরবো, আর ফাই-ফরমাস্ খাটবো।"

হৃদয়বান নগেন্দ্র বাবুর পরেশনাথকে ভদ্র সন্তান বলিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না,তিনি আরো বুঝিলেন এবালক কোনো গুরুতর বিপদে পড়িয়া চাকর থাকিতে আসিয়াছে নাম বলিতে অনিচ্ছুক। নগেন্দ্র বাবু স্নেহভরে ডাকিলেন—"পরেশ নাথ।" পরেশনাথ কাঁপিয়া উঠিল, তাহার বুকের ভিতর টিপ টিপ করিতে লাগিল—তাহার হৃদয়ে একটা তুমুল ঝড় বহিয়া গেল। পরেশনাথ নতমুখে বলিল—"আজ্ঞে।"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তোমার নাম যে পরেশনাথ তা তোমার কথাতেই বুঝতে পেরেছি। তুমি যে শিক্ষিত ভদ্র সন্তান তা তোমার নামের গোড়ায় শ্রী যোগ করাতেই বেশ বুঝতে পেরেছি ; আর তোমার ভদ্রোচিত চেহারাও লুকাইবার জিনিস নয়, দুঃখে চাকর থাকতে এসেছ বাবা, তোমার বাড়ি কোথায় ? তোমার বাপের নাম কি ?"

পরেশনাথ আবার কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল ! পরেশনাথ একবারও ভাবে নাই চাকর থাকিতে হইলে এত কথা উঠিতে পারে।

পরেশনাথ যোড়হস্তে বিনীতবচনে বলিল—"আমাকে মাপ করবেন্ আমি চলে যাচ্চি আর কিছু বলতে পারবো না"—পরেশনাথের শুষ্ক ম্লান মুখের উপর পাণ্ডুর ছায়া পড়িল—সে ছল ছল নেত্রে নগেন্দ্র বাবুর মুখের দিকে চাহিল।

ধর্ম্মপ্রাণ নগেন্দ্র বাবু সে চাহনির অর্থ বুঝিলেন। পরেশনাথের জল-ভরা আঁখীর ক্ষীণ জ্যোতি নগেন্দ্র বাবুর হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঘাত করিল! বালক পরেশনাথের হতাশ হৃদয়ের কাতর ক্রন্দন তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। তিনি স্নেহভরে পরেশনাথের হাত দুটি ধরিয়া আপনার বুকের নিকট টানিয়া আনিলেন; নিরাশ্রয় পরেশনাথ একেবারে এতখানি স্নেহ-মমতার ভিতরে আসিয়া যেন গলিয়া গেল, সে নিতান্ত শিশুর মতো কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার সেই মলিন মুখখানির উপর দিয়া শত ধারা বহিতে লাগিল।

নগেন্দ্র বাবু পরেশনাথকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া অতি স্নেহের সহিত নম্র স্বরে বলিলেন,—"দেখ বাবা পরেশনাথ,কেঁদ না,বোধ হয় তোমার কিছু খাওয়া হয় নি।"

বালক পরেশনাথ সব ভুলিয়া গেল। তাহার হৃদয়াকাশের কালো মেঘখানা যেন নিমেষে সরিয়া গেল! সে স্নেহের ফাঁদে ধরা পড়িল! সে যেন নব প্রাণে বলিয়া উঠিল—"আজ্ঞে সকালে খাওয়া হয়েছিল।"

উদারচেতা নগেন্দ্রবাবুর প্রাণটা যেন টলমল করিয়া উঠিল। তিনি বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"সকালে হয়েছিল, এত রাত পর্য্যন্ত কিছু খাও নি?"

পরেশনাথ নীরব।

নগেন্দ্র বাবু একজন চাকরকে কিছু জলখাবার আনিতে হুকুম করিলেন। অনতিবিলম্বে কিছু মিষ্টান্ন ও একগ্লাস জল আনিয়া সে পরেশনাথের নিকট ধরিল। পরেশনাথ নগেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিয়া বিনীতভাবে বলিল,—"আমি যে চাকর, আপনাদেয় সাম্‌নে কি করে খাব?"

নগেন্দ্র বাবু একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"শীগ্‌গির খাও বলছি, কে বলিল তুমি চাকর? তুমি যে আমাদের আপনার।"

অভাগা পরেশনাথ এ আনন্দ রাখিবে কোথায়! তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু ভক্তির আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার পাণ্ডু বর্ণ মুখের উপর দিব্য জ্যোতি দেখা দিল, সে কৃতজ্ঞতা-সহকারে নগেন্দ্র বাবুকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। আর মনে মনে বলিল নগেন্দ্র বাবু মানব না দেবতা!

পরেশনাথের আহার সমাপ্ত হইলে নগেন্দ্রবাবু মধুর বচনে বলিলেন "দেখ পরেশনাথ এখন ঠিক করে' বল তোমার বাপের নাম কি?"

এখন পরেশনাথের মনে আর কোনো গোল নাই, সে নিঃসঙ্কোচে বলিল—"আমার পিতার নাম শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।"

"তিনি কি করেন?"

"বেঙ্গল আপিসে কাজ করেন।"

"কত পান ?"

"মাসে ১৫০৲ টাকা।"

"তোমাদের বাড়ি কোথায় ?"

"মাণিকতলার কাছে।"

"আচ্ছা শ্রীশবাবুকে চেন ?"

"চিনি, তিনি আমাদের পাড়ার ডাক্তার।"

"তুমি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের ছেলে, তোমার খাবার পরবার অভাব নেই, এক-বস্ত্রে দীন দুঃখীর ভাবে চাকর থাকতে এসেছ কেন বল দেখি ?"

পরেশনাথ দীনভাবে বলিল—"আমি যখন বাড়ি থেকে আসি তখন জামা জুতা চাদর ছিল ?"

"সে সব কি হল ?"

"চোরে চুরি করেচে।"

"সে কি ! তুমি সব কথা খুলে বল, তোমার কোনো ভয় নেই।"

পরেশনাথ আশ্বস্ত হইয়া সংক্ষেপে বলিল :—"আজ আমাদের বাৎসরিক একজামিন ছিল ; বাবা আমাকে শাসিয়ে বলেছিলেন যে যদি এবার একজামিনে ভালো করে' পাশ হ'তে না পারি, তা হলে তিনি সকলের সাম্‌নে গলা টিপে বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন। আমি একজামিনে কিছুই লিখতে পারি নি। কাজেই বাড়ি যেতে আমার বড়ই ভয় হল, মনে ভাবলুম সকলের সামনে গলা টিপে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন, সে অপমানের চেয়ে মরা ভালো। আমি বরাবর বাগবাজারের ঘাটে এসে বসলুম—তখনো সন্ধ্যা হয় নি, অনেক মাঝি মাল্লারা স্নান করে' উঠে গেল, আমি বসে বসে দেখলুম। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো আমিও জামা, জুতা ও চাদর উপরে রেখে জলে নাবলুম—একটু একটু করে অনেক জলে গিয়ে ডুবে গেলুম, আমি সাঁতার জানি না, জলের নীচে আমার বড়ই কষ্ট হতে লাগ্‌লো, খানিকটা জল খেয়ে যেন ভারী হয়ে পড়লুম, পালিয়ে আসবার জন্য জলের নীচে হাত পা ছুঁড়ে অনেক চেষ্টা করবার পর, আমার হাতটা একটা নৌকার কাছিতে লাগল—আমি সেই কাছির উপর ভর করে উঠে পড়লুম। আমি তীরে এসে একটু সুস্থ হ'য়ে জামা চাদর ও জুতার খোঁজ করলুম কিন্তু পেলুম না। আমি ভিজে কাপড়ে এক যায়গায় গিয়ে শুয়ে রইলুম, সেখানে আমার পাশে একটা সাধু এসে শুলো, তাকে দেখে আমার বড় ভয় হোলো, আমি উঠে কারো বাড়ি

চাকর থাকবো মনে করে রাস্তায় বেরুলুম, শেষে ঘুরতে ঘুরতে আপনার দরজায় এসে দাঁড়ালুম।''

পরেশনাথের কাহিনী শুনিয়া সকলেই অবাক হইয়া রহিল। নগেন্দ্র বাবু একটু ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"দেখ পরেশনাথ, বাপ মা মুখে যা বলেন তা কি কাজে করতে পারেন ? কেবল ভয় দেখাবার জন্যে বলেন, তুমি এই সামান্য কারণে মৃত্যুকে আহ্বান করিতে গিয়েছিলে—কাজটা কি ভালো হয়েছিল ?''

"আজ্ঞে আমি এখন বুঝে দেখলুম, কাজটা নিতান্ত গর্হিত হয়েছিল।''

"এমন কাজ আর কখনো করবে ?"

"আর কখনো এমন কাজ কোরবো না।"

"আচ্ছা আমি লোক দিচ্ছি, গাড়ি দিচ্ছি এখনি বাড়ি যাও।"

"আমি এখানে থাকবো।"

"তুমি ছেলে মানুষ এখনো বুঝতে পারচ না, তোমার বাপ মা এতক্ষণ তোমার জন্যে কি করচেন। তাঁরা পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন, যাও বাড়ি যাও, কাল আমি তোমাদের বাড়ি গিয়ে তোমার বাপের সঙ্গে দেখা কোরবো।"

নগেন্দ্রবাবু গাড়ি তৈরি করিতে বলিলেন। পরেশনাথ নীরবে বসিয়া রহিল।

গাড়ি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। নগেন্দ্রবাবু ডাকিলেন,— "রামসদয়।''

রামসদয় নগেন্দ্রবাবুর পুরাতন ভৃত্য, সে এতক্ষণ নিদ্রাদেবীর উপাসনায় মগ্ন ছিল ; হঠাৎ নগেন্দ্রবাবুর ডাকে চমকিয়া উঠিল ! এত রাত্রে বাবু কেন তাহাকে স্মরণ করিলেন ! তাহা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমচোখে নগেন্দ্রবাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"দেখ রামসদয় এই ছেলেটিকে মাণিকতলায় এর বাপের কাছে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে এসো। এর বাপের নাম অবিনাশ বাবু তাঁর কাছে একে দিয়ে আসবে—পারবে তো ?"

রামসদয় বড়গলা করিয়া বলিল,—"রামসদয় পারেনা এমন কি কাজ আছে ?"

"তবে যাও দেরি কোরোনা।"—পরেশনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন,— "পরেশনাথ গাড়িতে ওঠ।"

পরেশনাথ প্রণাম করিয়া গাড়িতে উঠিল। গাড়ি বন বন শব্দে চলিতে লাগিল।

নিদ্রাতুর রামসদয় কিছুদূর আসিয়া গাড়ির মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কলিকাতার বুকের উপর দিয়া গাড়িখানি সশব্দে

চলিতে লাগিল। পরেশনাথ গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন। একবার সে নগেন্দ্রবাবুর অকৃত্রিম স্নেহের বিষয় ভাবিল, সে তাহার স্নেহময়ী মাতার শুষ্ক মলিন মুখখানি হৃদয়াভ্যন্তরে দেখিতে পাইল। পরেশনাথ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে গাড়িখানি মাণিকতলার একটি গলির নিকট আসিল; পরেশনাথের আদেশে সেই খানেই গাড়ি থামিল। রামসদয় তখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। পরেশনাথ গাড়ি হইতে নামিয়া কোচম্যানকে বলিল,—"দেখ ঐ আমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে, আর এ গলির ভিতর তোমার গাড়ি যেতে পারবে না; আমি এখান থেকে একলা যেতে পারবো। রামসদয় ঘুমিয়ে পড়েচে আর তাকে কষ্ট দিয়ে জাগাবার দরকার নেই, তুমি এখন গাড়ি নিয়ে যাও, তোমার বাবুকে আমার প্রণাম জানিয়ো।"

কোচম্যান আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ি ঘুরাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া গড় গড় শব্দে চলিয়া গেল।

পরেশনাথ গাড়ি হইতে নামিয়া ভাবিল এখন যাই কোথা—এ পোড়া মুখ নিয়ে এত রাত্রে বাড়িতে যাই কি করে'? বাপ মাকে এ মুখ দেখাবো কি করে' —হা অদৃষ্ট,ডুবলুম তো মরলুম না কেন? পরেশনাথের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। সে অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়া ক্ষোভে ঘৃণায় কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার বাটীতে যাইতে সাহস হইল না, একটা লজ্জার গাঢ় আবরণ তাহার সম্মুখে পড়িয়া গেল, সে তাহা ভেদ করিয়া যাইতে পারিল না। পরেশনাথের পিতা মাতা একখানি ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকেন, এই বাটীর অনতিদূরেই তাহাদের নিজ বাটী নির্ম্মিত হইতেছিল। এখানে একখানি চালাঘরের ভিতর ভীম সিং নামে একজন দ্বারবান থাকিত, সে মালপত্র বুঝিয়া লইয়া রসিদ দিত, মিস্ত্রি খাটাইত ও কাজের দ্রব্যাদি হেপাজতে রাখিত।

পরেশনাথ অশ্রুপূর্ণ-নয়নে, নিতান্ত দীনহীন বেশে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া চোরের মতো নিঃশব্দে আসিয়া ভীম সিংহের চালাঘরে প্রবেশ করিল।

পরেশনাথ মিটমিটে জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইল—বিচালি নির্ম্মিত গদির উপর কম্বলপাতা সুখশয্যায় একজন নীরবে ঘুমাইতেছে। পরেশনাথ উহাকে ভীম সিং মনে করিয়া উহারই পার্শ্বে শয়ন করিল। পরেশ নাথ বিস্মৃতির দুয়ারে আসিয়া পড়িল! সে সব ভুলিয়া গেল। নিদ্রাদেবী এই অসহায় বালককে তাঁহার কোমল অঙ্কে তুলিয়া লইলেন।

৬

গৃহাভ্যন্তর হইতে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক মাথা-মুড় খুঁড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন,—"ওগো তোমরা আমার পরেশনাথকে ফিরিয়ে এনে দাও গো, আমি বুক চিরে রক্ত দেবো, দাঁতে কুটো গলায় কুড়ুল বেঁধে সাত বাড়ি ভিক্ষে করে এনে তোমাদের পূজো দেবো।" পরেশনাথের মাতা এখন ভূশয্যায় পড়িয়া আছে; তাঁহার কপালটি ফুলিয়া বেলের মতো হইয়াছে, চক্ষুদুটি রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। পুত্র-শোকাতুরা রমণীর এই করুণ ক্রন্দন বুঝিবা কোন্ দেবতার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল।

বাটীর দরজা খোলাই ছিল। ভরসা করিয়া কেহই দরজা বন্ধ করিতে পারে নাই। যদি পরেশনাথ আসিয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া অভিমানে চলিয়া যায়, সংসারের এমনই মায়া মমতা—এমনই পিতৃমাতৃ-স্নেহ। ভীম সিং একেবারে বাটীর ভিতর আসিয়া ডাকিল,—"বাবুজি ?"

পরেশনাথের পিতার প্রাণটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! ম্লানমুখে বলিলেন,—"কী খবর ভীম সিং ?"

ভীম সিং বলিল,—"বড়া বাবু তো আগিয়া, মেরা ডেরামে নিদ যাতা," পরেশনাথের পিতা পুলক-বিহ্বলচিত্তে বলিলেন,—"অ্যাঁ পরেশনাথ এসেচে! তোর ঘরে ঘুমুচ্ছে ?"

"হাঁ বাবু সাব—আপ আইয়ে।"

পরেশনাথের মাতা যেন আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"অ্যাঁ বাবা আমার এসেচে—আমি ছুটে যাব নাকি ?"

পরেশনাথের পিতা বলিলেন,—"থামো আমি যাচ্চি আর কোনো ভয় নেই।"

পরেশনাথের পিতা কেলোর হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন দিয়া ভীম সিংহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পরেশনাথের দুইটি ছোট ভাই তাহার পিতার আঙুল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পরেশনাথের পিতা বিচালি-শয্যায় দীনহীন বেশে পরেশনাথকে শায়িত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া গেল। তিনি ব্যথিতঅন্তরে ডাকিলেন,—"পরেশনাথ!"

পরেশনাথ চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে পিতা আর দুইটি অপোগণ্ড ভ্রাতা।

ছোট ভাইদুটি আসিয়া পরেশনাথের হাতদুটি ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া

বলিল,—"দাদা তুমি বাড়ি চল—আজ আমাদের কারুর খাওয়া হয় নি, মা তোমার জন্যে কেঁদে সারা হয়ে যাচ্চেন তুমি বাড়ি গেলে তবে আমরা খাবো।"

পরেশনাথের হৃদয়খানা যেন গলিয়া জল হইয়া গেল। সে জল তাহার দু নয়ন বহিয়া টপ টপ করিয়া পড়িতে লাগিল। স্নেহের উৎস উথলিয়া উঠিল। পরেশনাথ ধীরে ধীরে উঠিল। তাহার ছোট ভাইটুটি তাহার হাত ধরিয়া চলিল। পরেশনাথ পথভ্রান্ত পথিকের মতো নীরবে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাঁহার পিতা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

পরেশনাথ দরজায় আসিবামাত্র তাহার মাতা পাগলিনীর মতো ছুটিয়া আসিয়া আকুল উন্মত্তস্বরে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"ওরে বাবা আমার রে।"

সে আকুল ক্রন্দন পরেশনাথের হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঘাত করিল! সেই মর্ম্মভেদী করুণ কণ্ঠস্বর যেন তাহার প্রাণের ভিতর ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্ষণেকের জন্য তাহার ধমনীর গতি যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! সে পাষাণ পুতলীর ন্যায় নিথর নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার মাতৃ-ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

চন্দ্রনাথ ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাস্তার দুইধারে নানাবিধ মনোহারী ও তামা, পীতল, বস্ত্র প্রভৃতির দোকান। তাহা ব্যতীত দধি দুগ্ধ চিড়া মুড়কি মিষ্টান্নের দোকান, চাল দালের মুদিখানা, পান-বিড়ির দোকানও মধ্যে মধ্যে দেখা গেল। আবার রাস্তার ধারে সোনার বিল্বপত্র, তুলসী, প্রভৃতি লইয়া বসিয়াছে যাহাদের মানসিক আছে তাহারাই তাহা ক্রয় করিয়া লইতেছে। কতকগুলি কেবল মাত্র ফুল বিল্বপত্র দূর্ব্বা তুলসী বিক্রয় করিতেছে। যাত্রীদের প্রায় সকলেই ফুল বিল্বপত্র প্রভৃতি কিনিতেছে। ফল মূল পূজার উপকরণও যথেষ্ট বিক্রয় হইতেছে।

পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে চলিতে প্রথমে কালীবাড়ি, তারপর শনিঠাকুরবাড়ি দেখিতে পাইলাম। যাত্রীরা প্রায় সকলেই শনিঠাকুরকে প্রণাম করিতেছে। কেহ কেহ এক একটি পয়সা দিয়া যাইতেছে। শনিঠাকুরবাটীর পাণ্ডা মহাশয়

সর্ব্বক্ষণ বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া গায়ে ব্যাঘ্রডোরা কম্বল বাঁধিয়া "শনি ঠাকুর আপনাদের মঙ্গল করবেন, মনস্কামনা সিদ্ধ করবেন, শনিঠাকুরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে যান," ইত্যাকার বাক্যাবলী বলিয়া দুই একটি পয়সা পাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

রাস্তায় মানুষের ভীড় মন্দ নয়। আমরা অগ্রগামীদিগের পদানুসরণ করিয়া সন্তর্পণে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার ধারে পাইপ দ্বারা জল সরবরাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সকলে প্রয়োজন মতো জল ব্যবহার করিতেছে।

ক্রমে আমরা "প্রেমতলা" নামক একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে তখন এক প্রাচীন বটবৃক্ষ-তলে বৈষ্ণবদিগের একটি বিস্তৃত মেলা বসিয়াছে। তথায় বহু সংখ্যক বৈষ্ণব বৈষ্ণবী হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছে গাইতেছে, কেহ বা ভাবে বিভোর হইয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে। আবার কেহ কেহ লম্বা কলিকাতে গাঁজা চড়াইয়া হর হর বম্ বম্ শব্দে টান মারিয়া কলের চিমনির মতো ধূম নির্গত করিতেছে।

অল্প দূরেই মোহান্তের আবাস-ভবন। অত্যুচ্চ প্রকাণ্ড দ্বিতল বাটী। বাড়ির সম্মুখে নয়ন-প্রাণ-তৃপ্তকর স্বচ্ছ জলপূর্ণ দীর্ঘিকা। পূর্ব্ব পাড়ে শান বাঁধানো ঘাট। বিস্তৃত পাড়ের উপর জটাজূটধারী গৈরিক-বসন-পরিহিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ধূনি জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। কেহ বা কোনো ভক্ত যাত্রীর সহিত হিন্দি ভাষায় আলাপ করিতেছেন। যাত্রীদের কেহ কেহ দুই একটি পয়সা দিয়া প্রণাম করিয়া যাইতেছে। জনৈক সাধু লৌহ-শলাকা-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। কেহ বা পদ্মাসনে বসিয়া জপ করিতেছেন। ফলে ইহারা যাহাই করুন, পয়সা পাইবার দিকে মনটি বেশ সজাগ আছে বলিয়া বোধ হয়। মোহান্তের বাটীর ভিতর একটু দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময় নষ্ট হইবে বলিয়া তাহা আর হইল না; তখন আমরা ব্যাসকুণ্ডাভিমুখে চলিলাম।

এই স্থান হইতে ব্যাসকুণ্ড বেশী দূর নয়; পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা কুণ্ডের পাড়ে পৌঁছিলাম। সেখানে বহুসংখ্যক নর নারী, বালক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কাতারে কাতারে চারি পাড়ে স্নান করিতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা মন্ত্র পাঠ করাইতেছেন, কেহবা কুম্‌কুমের ফোঁটা লাগাইয়া দিবার জন্য স্নাত ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। কোনো কোনো বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবী চন্দন ঘসিয়া রাধাকৃষ্ণের ছাপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, ফলে শেষে সকলেই হস্ত প্রসারণ করিয়া পয়সা আদায়ের জন্য যাত্রীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। আমরাও

স্নানাদি করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের মুখ হইতে উচ্চারিত মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিলাম, তার পর আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ভৈরবদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। শিলারূপী ভৈরবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াও ঐরূপ মন্ত্রাদি আবৃত্তি করিতে হইল। তারপর মন্ত্রপাঠক ঠাকুরকে কিছু দক্ষিণা দিয়া আমরা সত্বর বহির্গত হইলাম, এবং সেখানকার নিয়মানুসারে "অক্ষয়-বট" নামক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আমরা সাতবার প্রদক্ষিণ করিলাম। এই অক্ষয়-বট সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই বিশাল বৃক্ষমূল-দেশে বসিয়া মহর্ষি ব্যাস তপস্যা করিতেন।

অতঃপর আমরা ব্যাসের উত্তর পাড়-সংলগ্ন রাস্তা ধরিয়া সয়ম্ভূনাথ পর্ব্বতে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। উত্তর পাড়ের উপর দুইখানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠ ও পূর্ব্বপাড়ে মহাশ্মশান. সেখানে কয়েকটি সমাধি-মন্দির দেখিতে পাইলাম। এ সকল মন্দিরে সাধু সন্ন্যাসীরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলাম। সয়ম্ভূনাথের বাড়ি হইতে একটি পাকা বাঁধানো সোপানশ্রেণী বহুদূর পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে, আমরা সেই সোপানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ডাইনের মোড়ে পর্ব্বত-গহ্বর-মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী নামক একটি তীর্থ আছে। আসিবার সময় তাহা দেখিব মনস্থ করিয়া আর সেদিকে যাওয়া হইল না। সোপান বহিয়া সয়ম্ভূ-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। এখান হইতে মন্দিরটি বেশ দেখা যাইতেছিল। পর্ব্বত-পৃষ্ঠোপরি উঠিয়া মন্দিরের উত্তর পাশ দিয়া রাস্তার মোড়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পাঁচ জন সন্ন্যাসী একেবারে নগ্ন এবং চারিজন অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় যোগাসনে বসিয়া আছে। সম্মুখে ধুনি জ্বলিতেছে, কয়েকটা লম্বা কলিকা উপুড় হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে। এই মেলায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম নহে, সকলেই আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে স্ত্রীলোক এবং পুরুষগণ একত্রে চলিলাছে, এমত অবস্থায় প্রকাশ্য স্থানে এই নগ্ন সাধুদিগকে বসিতে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। উহাদের উদ্দেশ্য কেবল পয়সা উপায়, ধ্যাননিরত হওয়াটা ভণ্ডামী বলিয়াই বোধ হইল। আমরা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, কয়েকটি ভদ্র ঘরের যুবতী এই সাধুদিগকে পয়সা দিয়া প্রণাম করিতে যাইয়া লজ্জায় আরক্তিমমুখী হইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে।

এবার আমরা সয়ম্ভূ-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে বাঁশের আগড় দ্বারা অবরোধ করিয়া পুলিশ পাহারা নিযুক্ত রহিয়াছে। একদল যাত্রী প্রবেশ করিলে আগড় আটকানো হয়, সেসব লোক

অন্য দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলে পুনরায় আগড় খুলিয়া আর একদল যাত্রীকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। এইরূপে যাত্রিদল মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া সয়ম্ভুনাথ দর্শন ও ফুল বিল্বপত্র দুগ্ধ কলা নারিকেল ও জল দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ফিরিতেছে। মোহান্তের প্রণামী আনা-দু-আনা এবং সেবায়ত ঠাকুরদের দুই এক পয়সা দিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া সয়ম্ভুনাথের আশীর্ব্বাদ পুষ্পাদি প্রদান পূর্ব্বক যাত্রিদের সন্তোষ বিধান করিতেছেন। পূর্ব্বে এখানে পাঁচসিকা কর দিয়া প্রবেশ করিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ে করপ্রথা রহিত করিয়া সদাশয় গবর্ণমেণ্ট যাত্রিদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন সয়ম্ভুনাথ বিগ্রহ দর্শন করিলাম, তখন বাস্তবিকই প্রাণটা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বেশ বুঝিলাম, চিত্তের ভাবান্তর ঘটিয়াছে। আমার ন্যায় ভক্তিহীনের অন্তরটাও সুমধুর ভক্তি-রসে দ্রব হইয়া আসিল। তখন সেই ভক্তিপূর্ণঅন্তরে সয়ম্ভুনাথকে প্রণাম করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিলাম। দেখিলাম কত বিশ্বাসী ভক্ত ঠাকুরকে একবার দেখিবার জন্য, একবার স্পর্শ করিবার জন্য তাঁহাদের কি ব্যাকুলতা, কি আগ্রহ! যেরূপ ভাব সেইরূপ লাভ। আমাদের ভাবেরও অভাব সুতরাং লাভেরও অভাব।

সেখানকার লোকের মুখে সয়ম্ভুনাথ-সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। এখানে রাখাল বালকেরা গোরু চরাইতে আসিত, দুগ্ধবতী গাভীগুলি এই সয়ম্ভু বিগ্রহকে তাহাদের পালানের নিম্নে রাখিয়া দাঁড়াইত। তখন আপনা হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়া এই পাষাণ-খণ্ডের উপর পড়িত। তাহা দেখিয়া গোরক্ষকেরা লোকের নিকট উহা প্রকাশ করে। ক্রমশ এই অদ্ভুত কাহিনী প্রচার হইয়া পড়ে। কেহ কেহ যখন স্বচক্ষে এই আশ্চর্য্য দৃশ্য অবলোকন করিল, তখন সেবা পূজার বিধান প্রবর্ত্তিত হইল। অনেকদিন পর্য্যন্ত মন্দিরাদি কিছুই ছিল না, ক্রমে বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীসমাগম হইতে থাকে। তারপর পাণ্ডা, মোহান্ত, সেবায়ত নিযুক্ত হন। তারপর অর্থসঞ্চয় ও মন্দিরাদিও গঠিত হয়। বর্ত্তমান মন্দিরটির বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের অধিক হইবে না। ইতিপূর্ব্বে উপরে একটি টিনের ছাউনি মাত্র ছিল এবং সয়ম্ভুনাথের চতুর্দ্দিকে পাকা করিয়া বাঁধানো ছিল। (ক্রমশ)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কুশদহ-বৃত্তান্ত

খাঁটুরা

(ব্যবসায় ও জমিদারী)

তাম্বুলি জাতির মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টগ্রামী, চৌদ্দগ্রামী, সপ্তগ্রামী ও বিয়াল্লিশগ্রামী। এই কয়টি গ্রামী ব্যতীত আরো কয়েকটি গ্রামীর অনুসন্ধান "তাম্বুলী সমাজ" নামক তাম্বুলি জাতির জাতীয় পত্রিকার দ্বারা আমরা অবগত হইতে পারি। এই থাক্‌-বিভাগ তাম্বুলি জাতীর মধ্যে কোন্ সময়ে হইয়াছিল তাহা কেহই বলিতে পারেন না! অনেকে অনুমান করেন সপ্তগ্রামে অবস্থান-কালীন এই থাক্ ছিল না। এই সূত্র ধরিয়া স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল-প্রমুখ কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই ভিন্ন ভিন্ন থাকের মধ্যে বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা আংশিক ফলবতী হইলেও এখনো আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না। ইহার একমাত্র কারণ, প্রত্যেক গ্রামী আপনাদিগকে উন্নত মনে করেন। যখন বিয়াল্লিশগ্রামীর যাদববাটীর একটি কন্যার সহিত অষ্টগ্রামীয় মানকর-নিবাসী আশ-বংশের একটি কৃতবিদ্য পুত্রের সহিত বিবাহ হয় তখনো বিয়াল্লিশগ্রামীর মধ্যে এই ঘৃণ্য ভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু শিক্ষা-বিস্তারের সহিত এই সংকীর্ণতা তিরোহিত হইতেছে।

এই সমস্ত "গ্রামী"র মধ্যে কুশদহ নিবাসী সপ্তগ্রামী, ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। এই সপ্তগ্রামী তাম্বুলি যখন সপ্তগ্রামে বাস করিতেন তখনো ইঁহাদিগের ব্যবসায় যে একমাত্র উপজীবিকা ছিল তাহারো অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত (ভূতি) মহাশয় "তাম্বুলি জাতিকে বৈশ্য-শ্রেণীভুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বৈশ্য হইলেই ১৫ দিন অশৌচ ও উপবীতধারী হইতে হয়। এই বিষয় লইয়া তাম্বুলিদিগের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে "তাম্বুলি-পত্রিকা" নামে একখানি নূতন পত্রিকা প্রচারিত হয়। সুখের বিষয় এই মনোমালিন্য মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। তাম্বুলি জাতি বৈশ্যই হউক আর নবশায়কই হউক ইঁহারা ব্যবসায়ী জাতি। সপ্তগ্রামীগণ অন্যান্য গ্রামী অপেক্ষা যে ব্যবসায়ে বিশেষ দক্ষ তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্যবসায়ী হইতে হইলে কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকা চাই; সেই গুণের অভাব হইলেই ব্যবসায়ে সফল-মনোরথ হইতে পারে না। সেইসকল গুণের

মধ্যে কষ্টসহিষ্ণুতা, মিষ্টভাষীতা, সরলতা, প্রতারণা-রাহিত্য ও বিলসিতাশূন্য ; এই গুণগুলি যাঁহার আছে তাঁহার ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর উন্নতি দেখা যায়। ইহা ব্যতীত আর একটি বিশেষ শক্তি থাকা চাই, তাহা সুবিধা অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয় করা।

ব্যবসায়ের ধাতুগত অর্থ—বি+অব+সো ধাতু ঘঙ্‌ প্রত্যয় করিয়া ; সো ধাতুর অর্থ নাশ অর্থাৎ প্রতারণা দ্বারা নষ্ট না করা। খাঁটুরা-নিবাসী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সেন উক্ত গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়া সামান্য ব্যবসায় হইতে অতুল ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইল :—

শ্যামাচরণ সেন ২৪ পরগণার অন্তর্গত খাঁটুরা গ্রামে দরিদ্রতার কোলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অল্প লেখাপড়া শিখিয়া কলিকাতায় অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্য গিয়া স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিতের দোকানে সামান্য বেতনে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে তাঁহার দোকানের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দোকানের এক পার্শ্বে ২।৪ টাকার সূতা কিনিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সময়ে উক্ত গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিতের একটি কন্যার বিবাহ-উপলক্ষ্যে রক্ষিত মহাশয় খাঁটুরার বাড়িতে আসেন। গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় সেসময়ে বড়বাজারের মধ্যে একজন বড় মহাজন বলিয়া ইংরাজ-মহলে খ্যাত। এইসময়ে একখানি সূতার জাহাজ কলিকাতায় আসিলে শ্যামাচরণ সেন জানিতে পারিয়া সকলের অগ্রে গিয়া গোবিন্দ রক্ষিতের নামে সেই জাহাজ ১৫০০০৲ টাকার চুক্তিতে বায়না করিয়া আসিলেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

"There is God always speaking to us and showing Him-self to us. But unbelievers have ever as cribed to human agency things which belong to God."

অর্থাৎ ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বারা চালিত হন।

এখানে শ্যামাচরণও যেন তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়া জাহাজখানি গোবিন্দ রক্ষিতের নামে বায়না করিয়া আসিয়াই রক্ষিত মহাশয়কে এই কথা বলিবার জন্য খাঁটুরায় গেলেন। তখন রেলওয়ে হয় নাই। এই আঠারো ক্রোশ পথ পদব্রজে আসিয়া রাত্রি ১১টার সময়ে বিবাহের রাত্রে রক্ষিত মহাশয়কে এই সংবাদ দিয়াছিলেন ; কিন্তু রক্ষিত মহাশয় ইহা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং শ্যামাচরণ সেনকে এই কার্য্যের জন্য ভৎর্সনা করিলেন। মনোদুঃখে শ্যামাচরণ

কলিকাতায় সেই রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া তৎপর দিবসে জাহাজের অধ্যক্ষকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিলে অধ্যক্ষের দয়া হইল এবং ১৫ দিনের মধ্যে ১৫০০০৲ পরিশোধ করিতে বলিয়া দিলেন। তখন শ্যামাচরণ প্রত্যেক মহাজনের নিকট উক্ত টাকায় সূতা লইতে অনুনয় বিনয় করিলেন। মহাজনেরা তখন সামান্য লোক শ্যামাচরণের নিকট হইতে সূতা লইতে আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিলেন। ঈশ্বর যাহাকে প্রাণ খুলিয়া দিবেন তাহার সব দিকে সুবিধা হয়। সেইসময়ে এমন হইল যে, কলিকাতায় অধিক সূতা ছিল না। চড়া দরে সকলেই ১০০০৲ টাকার ২০০০৲ টাকার করিয়া খুচরা সমস্ত সূতাই কিনিয়া লইল। জাহাজের অধ্যক্ষকে ১৫০০০৲ টাকা দিয়াও অনেক টাকা লাভ দাঁড়াইল। এই লাভের টাকা লইয়া শ্যামাচরণ, গোবিন্দ রক্ষিতের পদ-প্রান্তে রাখিয়া বলিলেন :—

"আপনার নামে জাহাজ বায়না করিয়াছিলাম এবং এই লাভের টাকা ধর্ম্মতঃ আপনারই প্রাপ্য।" কি ত্যাগ স্বীকার! কি মহানুভবতা!

গোবিন্দ রক্ষিত তখন সাশ্রু-নয়নে বলিলেন,—"শ্যাম, এ টাকা ভগবান তোমাকে দিয়াছেন তুমিই ইহার একমাত্র অধিকারী।" বলা বাহুল্য যে এই টাকায় ব্যবসায় দ্বারা তাঁহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহার মূলে আমরা সততাই দেখিতে পাই। তাঁহার দেহান্তে তাঁহার পত্নীদ্বয় বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণী বিনোদিনী দাসী কিছু কিছু দেশহিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

ইংরাজীতে একটী কথা আছে—"Child is the father of man." অর্থাৎ বালকের বাল্যাবস্থার কার্য্য-প্রণালী দেখিলে ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে জানা যায়। তাম্বুলি বালকগণের মধ্যে এই ইংরাজী প্রবচনের অনেকটা সার্থকতা দেখিতে পাই। ইহারা খেলার সময়ে ধূলার চিনি ও জলের ঘিএর ব্যবসাদার হইয়া বসিয়া খরিদদারের সহিত দর করিতে থাকে। বালকগণ পিতামাতার নিকট যাহা সর্ব্বদা শুনে আর দেখে প্রবৃত্তিটা এবং বুদ্ধিবৃত্তিটা সেই দিকেই বেশী ধাবিত হয়। এইজন্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের পুত্র উপযুক্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট বিনা বাক্যব্যয়ে পিতার পদ পুত্রকে দিয়া থাকেন। ইহার ব্যতিক্রম করিয়া যদি কেহ অন্য পথে যায় তবে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে তাহাতে বিফল মনোরথ হইতে হয়। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যবসাদার তাম্বুলি জাতি জমিদারী কিনিয়া অনেকে বিফলমনোরথ হইয়াছেন। আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইলেই লোকসান

দিতে হয়। জমিদারী চালাইতে হইলে কড়ি-কোমল প্রকৃতি হওয়া চাই। নূতন ব্রতীকে যে কত সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় তাহা বলা যায় না। তবে তাম্বুলির অন্য থাকে আমরা জমিদারীবুদ্ধিসম্পন্ন উপযুক্ত ব্যক্তি দেখিতে পাই। এস্থলে শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ও স্বর্গীয় বিপ্রদাস পাল চৌধুরী এবং স্বর্গীয় রাজা রামচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি মহাত্মাগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

আজ যদি সপ্তগ্রামী তাম্বুলিগণ ব্যবসাদার না হইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিতেন তবে তাঁহাদিগকে কুশদহ-সমাজে অন্যভাবে দেখিতাম। পূর্ব্বে এই তাম্বুলিগণ কুশদহের উন্নতি-কল্পে দেহমন সমর্পণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের বংশধরগণের সেরূপ মতি-গতি দেখা যায় না।

বড়বাজারের তাম্বুলি-বারোয়ারি ফণ্ডের টাকা হইতে অনেক দুস্থ ব্রাহ্মণ ও নিঃস্বার্থ বিধবাদিগকে কিছু কিছু দান করা হয়।

খাঁটুরা হয়দাদপুর গোবরডাঙ্গা ও গয়েশপুর এই কয়েকটি গ্রামে কুশদহের সপ্তগ্রামী তাম্বুলিগণ বাস করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে খাঁটুরাই প্রধান। কুশদহে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইত। এক্ষণে বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগীতার ফলে কুশদহের চিনির কারখানাগুলি একে একে উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে প্রায় ১৫০ কারখানা ছিল; ইহার স্থলে এক্ষণে ২টি কিম্বা ৩টি চিনির কারখানা গোবরডাঙ্গায় চলিতেছে! সুখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট আবার এইদেশে যাহাতে চিনি উৎপন্ন হয় তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। আর একটি ব্যবসায়ের জিনিস তামাক। যে হিংলির তামাক বঙ্গ বিখ্যাত, তাহা এই কুশদহে উৎপন্ন হয়। চৌবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী হিংলি নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে এই তামাক প্রথমে হয়, এই জন্য ইহার নাম হিংলির তামাক। হিংলির তামাকের ব্যবসায় চৌবেড়িয়ার স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে করেন।

কুশদহে প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। এই জন্য কিছুদিন হইতে গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকট রেলীব্রাদারের একটি আড়ৎ স্থাপিত হইয়াছে। তথা হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর পাট কলিকাতায় আইসে। ধানকুড়িয়ার স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্লভেরও একটা পাটের আড়ৎ গোবরডাঙ্গায় হইয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

উদ্ধার

আমার ভরসা আশা সব জলাঞ্জলি
দিয়াছিনু একেবারে। কভু ভাবি নাই
এই দগ্ধ অবশেষ, এই ভস্মছাই,
নির্ব্বাপিত এ জীবন, পুনরায় জ্বলি'
উঠিবে কনকদ্যুতি-দীপ্ত শিখামুখে
লভিয়া ইন্ধন নব, প্রাণবায়ু ভরা
ফুৎকার-মারুত তব ! কি অপূর্ব্ব সুখে
দুখনিশি হ'ল ভোর, আলোক অম্বরা
তুমি দেখা দিলে যবে ! চলেছিল ভেসে
জীবন-তরণী মোর বহিত্র-বিহীন
অকূলের মৃত্যুমুখে। কোথা হ'তে এসে
দাঁড়ালে সে তরী-মাঝে, করিলে উড্ডীন
সোনার অঞ্চলখানি, সেই ভরাপালে
বাহি' মোর তরীখানি কূলেতে ভিড়ালে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী *

(সমালোচনা)

আমরা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। এরূপ পুস্তক বঙ্গ ভাষায় এই নূতন ; ইহার জন্য সমস্ত বঙ্গবাসী জ্ঞানেন্দ্র বাবুর নিকট চিরবাধিত এবং জ্ঞানেন্দ্র বাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থখানির প্রতি পত্রে বাঙ্গালীর গৌরব-কাহিনী মালার ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে, যাহা প্রত্যেক বঙ্গবাসীই পবিত্রভাবে এবং শ্রদ্ধার সহিত গলায় ধারণ করিবে। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি যাহা এত দিন

---

* "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। ৫০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। ডিমাই অষ্টাংশিত, ১।৴০+১১+।০+৫৫১+৶ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

ছিন্ন ভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, যাহা কোনো দিন এরূপভাবে লোকচক্ষুর গোচরে আসিবে বা বাঙালী ইহা পাঠ করিয়া আপন জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে পারিবে, ইহা কেহ কল্পনাও করে নাই। জ্ঞানেন্দ্র বাবু সেই লুপ্ত স্মৃতি, সেই সেই প্রদেশের রাজকীয় সংগ্রহ-ভাণ্ডার হইতে, তৎকালীন সংবাদপত্র হইতে, তদীয় বংশধরদিগের নিকট হইতে দশ বারো বৎসর যাবত অতি ধীরভাবে অথচ অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষা-ভাষী বাঙালীকে উপহার দিয়াছেন। যিনি বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে ভীত বা যাঁহারা বঙ্গের সুদূর বাহিরে একাকী স্বীয় কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহারা আগ্রহের সহিত এই পুস্তকখানি পড়িলে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকাটি অতি সারবান জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। গত বর্ষে বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনীতে সভাপতি-রূপে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সমগ্র শ্রোতা ও প্রতিনিধি-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া যে নূতন কথা শুনাইয়াছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই সুলিখিত ভূমিকাটি তাহাপেক্ষা অনেক নূতন এবং আনন্দের কথায় পূর্ণ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট ইহা বহু মূল্যবান বলিয়া গণ্য এবং উক্ত সম্ভাষণ নিতান্ত অসার ও হীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

গ্রন্থকার দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত কর্ম্মের মধ্যে থাকায় অনবসর-প্রযুক্ত অথবা ভ্রমবশত গ্রন্থের দুই এক স্থানে কিছু কিছু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন,—গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় হুগলি তাড়া গ্রামের দয়ারাম বসুর পুত্র কৃষ্ণরাম বসুর পরিচয় দিয়া গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, এসম্বন্ধে দীনেশ বাবু 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে' ও যোগেন্দ্র বাবু "বিক্রমপুরের ইতিহাসে" প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উঁহারা বৈদ্য ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, বিদুষী আনন্দময়ী ব্রাহ্মণ-কন্যা। কিন্তু শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ বসু ১৩০৪ সালের 'ভারতী'তে "আনন্দময়ী" প্রবন্ধে এবং স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার "মায়াতিমির" গ্রন্থ-শেষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আনন্দময়ী বৈদ্য ছিলেন। বোধ হয় জ্ঞানেন্দ্র বাবু ঐ পুস্তকগুলি দেখিবার অবসর পান নাই। আর ভূমিকার ৷৷৹ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার রাজা জানকীনাথ 'সোমে'র বংশধর বলিয়া রাজা রাজবল্লভের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু রাজা রাজবল্লভ বৈদ্য 'সেন' উপাধিধারী ছিলেন। বোধ হয়

মুদ্রাকরের প্রমাদ বশতই জানকীনাথ 'সেনে'র স্থানে 'সোম' হইয়াছে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইবে।

বইখানির ছাপা ও কাগজ সুন্দর, অনেকগুলি হাফ্‌টোন ছবি দ্বারা ইহার শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মুখপত্রে গ্রন্থকারের নিজের চেহারার হাফ্‌টোন ছবি মুদ্রিত হইয়াছে, কুশদহের এই সংখ্যায় গ্রন্থকারের সেই ছবিখানি পুনর্ম্মুদ্রিত হইল। আমরা প্রত্যেক বাঙালীকে "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পড়িতে অনুরোধ করি।

আমার জীবন কাহিনী

গুরুধাম

কাশীতে দাস মঙ্গলানন্দের আশ্রমে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। তিনি প্রথম দিন আমাকে বলিয়াদিলেন, ৭ দিন তুমি এখানে থাকিয়া প্রত্যহ আশ্রম বাসিনীর সহিত ১ ঘণ্টাকাল কথাবার্ত্তা কহিবে। তোমার মনের ভাব অকপটে তাঁহাকে বলিবে, তিনি যে সকল প্রশ্ন করেন তাহার উত্তর দিবে। আমি কিছু পরিশ্রান্ত আছি, ৭ দিন পরে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিব। অতপর তোমার মনের ভাব যেরূপ হয় তাহা অবগত হইবে।"

আশ্রম-বাসিনী সেবিকা মঙ্গলময়ীকে আমি প্রথম দিনের দর্শনের পর হইতে মা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলাম। তিনি প্রথমে আমার জীবন কাহিনী অবগত হইলেন, পিতা মাতার অভাবের পর মণীন্দ্রদেবের শোক আমার পক্ষে কিরূপ গুরুতর হইয়াছিল এবং মণীন্দ্রদেবের জীবনীও তিনি অবগত হইলেন। সতীশের কথা ও তাহাদের পরিবারবর্গের কথা এবং তাঁহারা আমার সম্বন্ধে কি ভাব পোষন করেন সকল কথাই তাঁহাকে ঠিক আপন মায়ের মত মনে করিয়া জানাইলাম। তারপর এখানকার কথা দাসজীর কার্য্য প্রণালীর কথা তাঁহার নিকট কিছু কিছু অবগত হইলাম। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর এই কাশীধামে আশ্রম করিয়া আছেন। নানা স্থানে তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ আছেন। অধিকাংশই গৃহী, যিনি যেরূপ কার্য্য করেন—রাজ সরকারে চাকরী বা স্বাধীন ব্যবসায় কিম্বা অনন্য বিধ চাকরী করেন, কাহারো কোন কর্ম্মই নিষিদ্ধ নয় তাহা যদি সাধনের অন্তরায় না হয়; সত্যভাবে সাধনের অঙ্গীভূত করিয়া বিষয় কর্ম্ম সকলেই করেন। সাধন প্রণালী যাহা তাহা নিয়মিত সকলের পক্ষেই

পালনীয়। সেবার কার্য্য সকলকেই গ্রহণ করিতে হয়। যিনি যেখানে আছেন সেইখানে প্রতিবাসীদিগের মধ্যে সেবার কার্য্য করিতে হয়। কাশীতে যাঁহারা আছেন তাঁহারাও ঐ নিয়মে কার্য্য করেন।

সেবা কার্য্যে যাঁহারা শিক্ষিত, প্রথমপ্রবেশার্থিগণ তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া সেবা শিক্ষা করেন। ইহাদের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ও দেশীয় আয়ুর্ব্বেদী চিকিৎসায় অনেককেই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়। কেহ কেহ কলেজের পরীক্ষাত্তীর্ণ আছেন।

আশ্রমবাসিনী মাতার নিকট দাস মঙ্গলানন্দের সাধন সিদ্ধি ও সেবা প্রণালীর পরিচয় পাইয়া বুঝিলাম ইনি একজন যথার্থ সাধুপুরুষ মহাত্মা ব্যক্তি। ইহার অনুগামী হইয়া, ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধন করা আবশ্যক। ইনিই আমার উপযুক্ত গুরু। আজ হইতে আমি সর্ব্বান্তকরণে ইহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলাম।

গুরুদেবের কুমারী কন্যা সেবিকার মধুর স্বভাব ও কমনীয় মুখশ্রী দেখিয়া আমার প্রাণে কিযে এক স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হইল তাহা কোন্ ভাষায় প্রকাশ করিব। জ্ঞানে প্রেমে, ধর্ম্মে, কর্ম্মের সমাবেশ সাধন শিক্ষার্থিনীর শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া মনে মনে গুরুদেবকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ধন্য তাঁহার সাধন, এবং শিক্ষাদান।

৭ দিন পরে গুরুদেব আমাকে ডাকিলেন, এবং আমার মনের কথা অকপটে প্রকাশ করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম এতদিন আমি অন্ধের ন্যায় পথ খুঁজিয়া বেড়াইতে ছিলাম। সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে আর আমার ইচ্ছা নাই কিন্তু মুক্তির পথ আমি জানিনা—কোথায় পাইব সে পথ এই ভাবনা লইয়া নানা স্থান পর্য্যাটন করিয়া আমার পরম সৌভাগ্যে আপনার দর্শন পাইয়াছি, আমি আপনার প্রদর্শিত সাধন পথ গ্রহণ করিয়া জীবন মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে একান্ত বাসনা করিতেছি; আপনি কৃপা করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন এই আমার প্রার্থনা।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি সশ্রু নয়নে করযোড়ে অবনত হইয়া রহিলাম। আমার কথা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন, তুমি কি প্রকৃত সাধন পথের পথিক হইতে ইচ্ছুক হইয়াছ? এ যে অত্যন্ত ক্লেশ কর পথ, এপথ অবলম্বন করিতে হইলে পদে পদে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আবশ্যক। সুখ-বিলাসবাসনা একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে, আর প্রধান বস্তু চাই বিশ্বাস! ধর্ম্মই যে মানব জীবনের

সার পদার্থ এবং তাহাকে লাভ করাই যে মানবের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য ইহা কি তোমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে ?

গুরুদেবের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম, ধর্ম্মের মহিমা আমি কি বুঝি, তবে মণীন্দ্রদেবের জীবন দেখিয়া আমার প্রাণে ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিৎ জাগিয়াছে, এখন আপনি আমাকে স্নেহাশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করিয়া ধর্ম্মের তাৎপর্য্য উপদেশ ও সাধন দান করিয়া কৃতার্থ করুন।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় আমাদের ৩ দিন চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে আরো ২।৩ জন সাধক ভক্তের সহিত গুরুদেবের কথা প্রসঙ্গ শুনিতে লাগিলাম। তারপর একদিন গুরুদেব আমাকে শিক্ষার্থিরূপে গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ৩ মাস ভূতশুদ্ধি ও বীজমন্ত্র ওঁ কার প্রত্যহ তিনবার (ত্রিসন্ধ্যা) সাধন করিতে উপদেশ দিলেন। ভূতশুদ্ধির নিয়ম, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আহার, দেহ পরিচ্ছন্ন, নিদ্রাদির নিয়ম ও সংযম সাধন করিতে লাগিলাম। তারপর স্বরূপ সাধন, প্রথমে সত্যস্বরূপ, তারপর জ্ঞানস্বরূপ, তারপর অনন্তস্বরূপ, তারপর মঙ্গলস্বরূপ, তারপর পবিত্রস্বরূপ, তারপর আনন্দ স্বরূপ ও সকল স্বরূপের সঙ্গেই অখণ্ড অদ্বিতীয় ভাব সাধন করিলাম। এই স্বরূপ সাধনে প্রায় বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। প্রত্যেক স্বরূপ সাধনের সময় স্বরূপের ভাব ও তাহার তাৎপর্য্য তিনি আরাধনার দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন. এই সাধন প্রণালী অনেকগুলি সাধক একত্রে মিলিয়া সায়ংকালে সাধন করা হইত। অধিকাংশ সময় গুরুদেব ইহার ব্যাখা করিতেন। কোনো অভিজ্ঞ সাধকও মধ্যে মধ্যে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন।

সাধনের সঙ্গে সেবা কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিত। গুরুদেব নিজে সমস্ত পরিদর্শন করিতেন। মাতা আশ্রমের কার্য্য আর কয়েকটি সেবিকাসহ সম্পন্ন করিতেন। যাঁহারা নানা স্থানে গৃহী সাধক আছেন সকলকেই তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ মাসিক দান আশ্রমে পাঠাইতে হয়। যাঁহারা নুতন সাধক তাঁহাদের ব্যয় আশ্রম বহন করিতেন। বাড়ি বাড়ি প্রত্যহ মুষ্টি ভিক্ষার আধার রক্ষিত আছে, সপ্তাহে কোন সেবক এক এক বিভাগের দানাধার হইতে চাউল পয়সা সংগ্রহ করেন। দূর দূরান্তরেও গৃহে গৃহে দানাধার আছে, প্রত্যহ ৩ মুষ্টি চাউল প্রত্যেক গৃহস্থ দান করেন, সেই চাউল বিক্রয় করিয়া সেখানকার প্রধান যিনি সেবক তিনি তাহা মণিঅর্ডার দ্বারা প্রেরণ করেন। নুতন সাধক অধিকাংশ কাশীর আশ্রমেই থাকেন।

এই সময়ের মধ্যে সতীশকে পত্র লিখিয়া সকল জানাইলাম। প্রথম হইতে

গুরুদেব সতীশদের সকল বিষয় অবগত ছিলেন। পত্র লিখিয়া সতীশকে আশ্রমে আনানো হইল। সতীশ এখানে আসিয়া ও গুরুদেবের দর্শনে আশ্রমের কার্য্য প্রণালী ও সাধন তত্ব অবগত হইয়া তাহার প্রাণেও ধর্ম্ম সাধনাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। সতীশ তখন ওকালতি পাশ করিয়াছে মাত্র। গুরুদেব আদেশ করিলেন যদিও ৩ বৎসর সাধনের কাল, কিন্তু সতীশের জন্য এক বৎসর সাধন কাল নির্দ্দিষ্ট হইল।

সতীশ প্রথম হইতে অত্যন্ত সেবা পরায়ণ ছিল, অল্প দিনের মধ্যে সতীশ সেবক দলের একজন উপযুক্ত হইয়া উঠিল। তারপর সতীশ বেশ বুদ্ধিমান ছিল, গুরুদেব উহাকে ওকালতি কার্য্যে জীবন যাপন করিতে আদেশ করিলেন, এবং সতীশের ভাব দেখিয়া গুরুদেব একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্তাব করিলেন কুমারী সেবিকার সহিত সতীশ পরিণয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবেন। সতীশের পিতা মাতা ও নির্ম্মলা কাশীতে আসিলেন। তাঁহারা গুরুদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়া পড়িলেন, যথা সময়ে সতীশের সহিত সেবিকার বিবাহ হইল। নির্ম্মলাকে এক বৎসর সাধনাধীনে রাখিয়া গুরুদেব নিজে আমার সহিত নির্ম্মলার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সতীশ কাশীতে থাকিয়া ওকালতি কার্য্য গ্রহণ করিল, এদিকে সাধন ও সেবা কার্য্য চলিতে লাগিল। সতীশের পিতা অর্থাৎ আমার শ্বশুর মহাশয় ৩ মাস কাল দেশে থাকিয়া আমাকে দোকানের কার্য্যাদি বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সপরিবারে কাশীর আশ্রমে আসিয়া গুরুদেবের সহবাসে ধর্ম্ম-চিন্তায় মন নিবেশ করিলেন। আমি ও নির্ম্মলা দেশে গিয়া সাধন ও সেবা কার্য্যের একটি ক্ষুদ্র আশ্রম করিলাম। গৃহই আমাদের আশ্রম হইল! বিষয় কর্ম্ম কাপড়ের দোকান চালাইতে লাগিলাম।

(ক্রমশ)

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

খাঁটুরা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে, কথা হইয়াছিল, বালকদিগের মনে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে পারিতোষিক বিতরণের জন্য দুই একজন উদযোগী হইয়া ছিলেন বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু এতদিন তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম গত ২২শে আশ্বিন স্কুল বাড়িতে এই উপলক্ষ্যে একটি সভা আহুত হইয়াছিল। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা গৈপুরস্থ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, গোবরডাঙ্গা হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার—বর্ত্তমান জমিদার বাবু জ্ঞানদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ম্যানেজার মাননীয় শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় সভাপতিরূপে স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন, এবং

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি,এ, মহাশয় ছেলেদের কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন। সভার কার্য্যটি বড়ই তৎপর ভাবে করা হইয়াছিল মনে হয়। এরূপ সভা দ্বারা যাহাতে অভিভাবকগণের মনে শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মায় এমন উত্তেজনাসূচক কিছু আলোচনা বা বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইলে ভাল হইত। তা ছাড়া আমরা শুনিলাম, গোবরডাঙ্গার কোন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে আহ্বান করা হয় নাই; আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই পারিতোষিক বিতরণ সভাটি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে কার্য্যকরী হয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ তৎপক্ষে চেষ্টা করিবেন।

পূজার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখেপোধায় বাহাদুর অসুস্থ হইয়াছিলেন, পূজার সময় হঠাৎ তাঁহার ব্যারাম বৃদ্ধির সংবাদ শুনিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া পড়েন। ঈশ্বর-কৃপায় তিনি এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট কামনা করি তিনি আরো দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকিয়া শেষ জীবনে নুতনভাবে দেশের আরো কিছু হিতসাধন করুন।

গৈপুর ফকির পাড়ার ঘাট হইতে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তাটির দুর্গতি দূরের জন্য আমরা কত বার মিউনিসিপালিটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম কিন্তু এপর্য্যন্ত কিছুই হইল না।

ইছাপুর, মাটকোমরা, গৈপুর প্রভৃতি গ্রামবাসিগণের পক্ষে তাড়াতাড়ি গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে আসিতে হইলে এপর্য্যন্ত লাইনের উপর দিয়া বড়ই বিপজ্জনক অবস্থায় আসিতে হয় এবং তাহা রেলওয়ে কোম্পানির নিয়ম-বিরুদ্ধ হয়। অন্যথা গেট পার হইয়া আসিতে গেলে অনেক বিলম্ব হয়। তাহাতেও ঐ লাইন পার হইতে হয়। ট্রেণের সময় বেশী না থাকিলে নিয়ম-বিরুদ্ধ হউক বা বিপজ্জনক হউক, তখন সেই অবস্থার মধ্যদিয়া আসিতে আর কেহই ক্ষান্ত হন না, কিন্তু এই দুরবস্থা দূরের যে কোন উপায় নাই তাহা নয়, যদি ঐসকল গ্রামবাসি, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করেন, তারপর একটু চেষ্টাও করেন তবে একটি সেতুযুক্ত গেট হওয়া অসম্ভব নয়। যেখানে মানুষের জীবনের উপর আশঙ্কার বিষয় সেখানে রেলওয়ে কোম্পানি উদাসীন থাকিতে পারেন না।

গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য—কুশদহ সম্পাদক বা প্রকাশকের পারিবারিক দুর্ঘটনা এবং অর্থাভাব বশত কার্ত্তিক সংখ্যা বিলম্বে বাহির হইল। এজন্য অতঃপর অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা একত্রে পৌষ মাসের শেষে বাহির হইবে, সুতরাং অগ্রহায়ণ সংখ্যা অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে না পাইলে গ্রাহকগণ ব্যস্ত হইবেন না।



উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

২৮শে বৈশাখ, ১২৭০ ৪ঠা পৌষ, ১৩২২

U. RAY & SONS, CALCUTTA.

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"তোমারি নামে ফুটেছে ফুল,
গন্ধে প্রাণ করেছে আকুল,
যতনে গাঁথিয়া এনেছি মালা
আদর করে' একবার পর না।"

সপ্তম বর্ষ, { অগ্রহায়ণ—মাঘ, ১৩২২ } ৮ম—১০ম সংখ্যা

দাসের প্রার্থনা



হে সঙ্কটহারী বিঘ্নবিনাশন দীনবন্ধু, আমরা তোমার আদিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নের মধ্যে পতিত হই। বিঘ্ন দুই প্রকারে উপস্থিত হয়,—এক আমাদের জ্ঞানের অতীত ভ্রম-ত্রুটী-বশত, আর সেই অজ্ঞানতাদূরের জন্যই তোমার গূঢ় নিয়মে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আমরা কৃতার্থ হই তখন, যখন তোমার কৃপায় সেই ত্রুটী এবং ভ্রম বুঝিতে পারি। কিন্তু পরীক্ষা-কালে আমরা অনেক সময় নিরাশ হইয়া পড়ি। তুমি আবার তোমার করুণা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দাও, আমরা কিছুই নই—তুমি আমাদের মধ্যে আছ। দয়াল, যদি পরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিয়া আবার তোমার সেবাব্রত পালনকার্য্যে—কুশদহ-প্রচারে সক্ষম করিলে, তবে তোমার চরণে এই ভিক্ষা করি, কষ্টের ধন কুশদহর এই সংখ্যাগুলি যেন জীবনপ্রদ, মঙ্গলপ্রদ হয়। ইহা পাঠ করিয়া যদি একজনের প্রাণেও তোমার ভাব, তোমাকে প্রাণে লাভ করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।

—০—

স্বরূপতত্ত্ব

কুশদহর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় প্রভৃতি সংখ্যায় ভগবানের স্বরূপ ও তৎপ্রতি মানবের বিশ্বাস-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে, অতঃপর তাহার পরিণতি বা মূল বিষয়-সম্বন্ধে কিছু বলাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

দেখা যায়, মানবজীবনে যতপ্রকার কর্ত্তব্য আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ঈশ্বর-আরাধনা। তবে সকলেই যে সে কর্ত্তব্য পালনে সমানভাবে প্রস্তুত তাহা নয়, সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, ঈশ্বর-আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মানুষকে আরো কত রকমে প্রস্তুত হইতে হয়।

ঈশ্বরোপাসনায় প্রস্তুতি মানুষের দুইটি যন্ত্রের উন্নতিসাপেক্ষ। তাহা না হইলে উপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মে না। সে দুই যন্ত্র হৃদয় ও মস্তিষ্ক ; অর্থাৎ জ্ঞান এবং প্রেম এই দুইটি বৃত্তি মানুষের যখন বিকাশলাভ করে তখনই মানুষ ঈশ্বর-আরাধনার আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারে।

আরো দেখা যায়, মানুষ ঈশ্বর-উপাসনার আবশ্যকতা অনুভব করিলেই যে বিশুদ্ধ উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে। ধর্ম্ম-জগতে অনেক রকম নিম্ন আদর্শের ধর্ম্ম ও সাধন-প্রণালী আছে। ধর্ম্মের উচ্চ ভাব বহুদিনের সাধন-ফলে মানব-সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে। আবার ইহাও দেখা যায়, এক সময় কোনো মহাপুরুষ ধর্ম্মনেতার ভিতর দিয়া যে উচ্চ আদর্শ প্রকাশ পায়, তাহা তাঁহার অনুগামীগণের মধ্যে কিছুকাল জাগ্রত থাকিয়া ক্রমে শিষ্য-প্রশিষ্য-বংশে তাহা বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া যায়।

ধর্ম্ম যে মূলে এক, কেবল তাহার সাধন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন একথা সকলেই বলিয়া থাকেন ; বিশেষত আজ কাল সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে এই মতের খুব প্রচার দেখা যায়। তাই অধিকাংশ স্থলে বিভিন্ন রুচি ও সংস্কার-অনুসারে, অবস্থার অনুকূলে, প্রচলিত প্রণালীর মধ্যে যে কোন একটা প্রণালী গ্রহণ করিতে দেখা যায়। ইহা যত সহজ, সত্যের বিচার এবং পরীক্ষা উৎপীড়ন ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া ধর্ম্মগ্রহণ করা তত সহজ নয়।

আজকাল বাজারে সুলভ দ্রব্যের যেমন কাটতি অধিক, ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও তেমনি অধিকাংশে সুলভপথেই আগে চলিতে চান। অর্থাৎ "আমি যেমন আছি তেমনই থাকিব, যাহা করিতেছি তাহাই করিব, রুচি অভ্যাস যেমন আছে

তেমনই থাকিবে, অথচ ধর্ম্ম-সাধনও চলিবে।” ধর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে কিছু ছাড়িতে হইবে কেন? ত্যাগস্বীকারই বা করিতে হইবে কেন? যেমন চিকিৎসা-রাজ্যেও আজ-কাল দেখা যায়; রোগী বলেন,—“আমার রোগ হইয়াছে চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহা বলিয়া দৈনিক পানভোজনাদির অভ্যাস যাহা আছে, তাহা ছাড়িতে হইবে কেন? তবে আর ঔষধসেবনের প্রয়োজন কি?” ফলত যেখানে উদ্দেশ্য, সহজে ধর্ম্মলাভ সেখানে ধর্ম্মের আদর্শ-বিচার প্রয়োজন হয় না। পথটা সহজ হইলেই হইল। তাই দেখা যায়, উচ্চ জ্ঞানের পথ কেহ তেমন করিয়া ধরিতে চান না।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা কতদূর মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন জানি না। সাকার মূর্ত্তি, মনুষ্যগুরু বা অন্য কোনোপ্রকার কল্পনার উপাসনা ব্যতীত নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা যে কতদূর সত্য এবং জীবনপ্রদ, তাহা হয় তো অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করেন না। তাঁহারা বলেন, “নিরাকারে”র আবার উপাসনা করিব কিরূপে! এইজন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভগবানের স্বরূপতত্ত্বের কিঞ্চিৎ অবতারণা করিয়াছিলাম। যিনি যে ভাবের দ্বারা ভগবানের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করুন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার এই তিনটি স্বরূপ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, করিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না। যিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে কোনরূপে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিতে গেলেই তাহা কাল্পনিক হইয়া পড়ে, সুতরাং সে-অবস্থায় সত্যের ভাব রক্ষা পায় না। তাঁহার ব্যাপকত্বে আঘাত পড়ে। তদ্রূপ যিনি অনাদি অনন্ত, তাঁহার জন্ম বা লীলা আরম্ভ এবং অবসান কালের কল্পনা করিলে অনাদিত্ব থাকে না। স্থান কাল এবং আধারে আবদ্ধ মূর্ত্তিবিশিষ্ট করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিলে তাহা সত্য ঈশ্বরের পূজা হয় না, তাহা কল্পনার পূজা করা হয়। সমুদ্রের সঙ্গে ক্ষুদ্র নদীর যোগে সাগর-জলের যোগ থাকে বটে, কিন্তু নদী কখনই সমুদ্র হয় না। ভগবান কোনো কাল্পনিক বস্তু নন, একেবারে খাঁটি সত্যপুরুষ। তিনি কেবল কোন দেশ বা জাতিবিশেষের ঈশ্বর নন, তিনি সমস্ত বিশ্ব-মানবের। কিন্তু এই সত্য স্বীকার করিয়াও অনেকে বলেন, “একেবারেই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা হয় না, আগে মূর্ত্তিপূজা করিয়া শেষে যখন জ্ঞান হয়, তখন তাহা সম্ভব।” একথা মূলেই সত্য নহে। কেন-না, সত্য সাধকের পক্ষে ঐরূপ কল্পনার পূজা মূলেই অনাবশ্যক। কোনো প্রয়োজনও হয় না। যাহা সরল সত্য তাহা যদি সকলেই বুঝিতে না পারিত,

তাহার জন্য ভ্রমসঙ্কুল আর একটা ধারণা জন্মাইবার জন্য প্রয়োজন হইত, তবে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শিশুপাঠ্য-পুস্তকে 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ' একথা লিখিতেন না। অনন্ত অনাবিল ভগবানকে ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতে কল্পনা করিলে তাঁহার অবমাননা করা হয়। জ্ঞানের অভাবে কুসংস্কার-বশত এ-ত্রুটী ধারণা হয় না। সত্যের সাধক ভগবানকে অনাবিল সত্যরূপেই দেখিতে চান, তাঁহাকে প্রাণের মধ্যে সাক্ষাৎ-ভাবেই পাইতে চান।

তাই ঋষিগণের আরাধ্য সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে লীলাময় প্রেমময় ভগবান, বিধাতা, অথবা বিশ্বজননীরূপে জ্ঞান-ভক্তি-বিশ্বাস-চক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত হন। তিনি যে অতি সত্য। প্রতিদিনের, সারাজীবনের, ইহকাল এবং পরকালের বিধাতা। তাঁহাকে যদি আমরা না জানিলাম, তবে আমাদের অন্তঃকরণের সার্থকতা কি? তাঁহাকে না বুঝিলে, না জানিলে আমাদের বুদ্ধি এবং জ্ঞানের সার্থকতা হয় না। তিনি তো কোনো আকারবিশিষ্ট কোনো জড়-মূর্ত্তি নহেন যে, আমরা তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিব। তিনি যে সচ্চিদানন্দময়। যদি জ্ঞান-চক্ষে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়, তবেই তো তাঁহার এই জগত-সংসারে সকল বস্তুর মধ্যে তাঁহাকেই দেখা যায়, বোঝা যায়। যাঁহারা বলেন, "নিরাকার ভগবান্‌কে ধরা যায় না"। আমি তাঁহাদের পদে ধরিয়া ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব অনুধ্যান করিতে অনুরোধ করি। যেন সকলে সত্য ভগবানের পূজা করেন। ভগবান সকলকে শুভবুদ্ধি দান করুন।

———o———

বিশ্বেশ্বর দর্শনে

——*○*——

একে একে পাঁচটি কন্যারত্নের পর চিন্তাহরণের জন্ম হওয়ায় ছেলেবেলা একটু অতিরিক্ত আদরযত্নেই তাহাকে মানুষ করা হইয়াছিল, এবং স্নেহাদরের ফলে তাহার দৌরাত্ম্য যখন চরম সীমায় উঠিয়া তাহার পিতা-মাতাকে সতর্ক হইতে ইঙ্গিত করিতেছিল, সেই সময় সহসা এক দৈবজ্ঞের আগমনে তাহার আদরযত্ন হ্রাস হওয়া দূরে থাক বরং বৃদ্ধিরই সুযোগ হইয়াছিল। দৈবজ্ঞ ঠাকুর একটি পয়সা আর একটি সুপারি লইয়া চিন্তাহরণের ভাগ্যগণনা করিয়া প্রসন্নমুখে তাহার জননীকে বলিলেন, "মা তুই বড় ভাগ্যবতী অনেক পুণ্যের

ফলে তোর এই সন্তান জন্মেছে, তোর ভাবনা কি মা, তুই তো রাজার মা, তোর ছেলের কপালে এই দেখ রাজদণ্ড রয়েছে।”

সরল বিশ্বাসের সহিত একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া যোগমায়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর, আমার ছেলের হাত দেখলেন, অনুগ্রহ করে আমার হাতটি দেখে বলে দিন, এই ছেলেটি রেখে আমি মরতে পারব কি না? আর আমার বড় সাধ একবার কাশীর বিশ্বেশ্বর অন্নপুন্নো দর্শন করে আসি, তা আমার বরাতে আছে কি না?

দৈবজ্ঞ ঠাকুর তাঁহার হাতটির দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, “শুধু কাশী কেন মা তুই কাশী গয়া বৃন্দাবন হরিদ্বার কেদার বদ্রীনাথ পর্য্যন্ত যাবি; ঐ ছেলের কল্যাণে তোর পুণ্যকর্ম্ম তীর্থধর্ম্ম সব হবে কোনো অভাব থাকবে না। মা, তোর ছেলের কোলে নাতি দেখে তুই হাসতে-হাসতে মরবি।”

চিন্তার মা তখন গভীর আনন্দে পূর্ণহৃদয় হইয়া কুটীর-মধ্য হইতে ক্ষুদ্র একটি বংশপেটিকা বাহির করিয়া বহু অন্বেষণে বহুদিনের সঞ্চিত দুটি টাকা বস্ত্রখণ্ডের গ্রন্থি খুলিয়া দৈবজ্ঞঠাকুরের পদতলে রাখিলেন। ঠাকুর সন্তুষ্ট মনে মাতাপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চিন্তাহরণের পিতা মাতা পুত্রকে ঠিক রাজা না হউক অন্তত ধনী ও বিদ্বান দেখিবার জন্য সাধ্যাতীত চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দুরন্ত শিশু চিন্তাহরণ জানি না কেন সুবুদ্ধির উদয়ে অল্পদিনের মধ্যেই খেলা-ধূলা ছাড়িয়া সুবোধ বালকের মত পিতার আদেশে শরের কলম ভূষোর কালি লইয়া পাততাড়ি বগলে কোঁচায় খুঁটে মুড়ি মুড়কি বাঁধিয়া লইয়া পাঠশালে গেল।

পাঠশালে এ দুর্দ্দান্ত শিশুর আগমনমাত্রে পুরাকালের শাস্তির স্মৃতিগুলি অনুগত ভৃত্যের মত একে একে গুরু মহাশয়ের শরণাগত হইল। কিন্তু সে সকলের বিশেষ আবশ্যক হইল না! পাঠশালার পাঠ স্বল্পদিনেই সমাপ্ত করিয়া চিন্তু গ্রামের ইস্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইল এবং যথাকালে তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পিতা-মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া চিন্তা ইংরেজী-ইস্কুলে ভর্ত্তি হইবার অপেক্ষা করিতে লাগিল। কারণ চিন্তার পিতার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত হীন, কলিকাতার ইস্কুল-মেসের খরচ নিয়মিত যোগানো অসম্ভব, তবু তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া যথাসম্ভব সংসারের অন্যান্য ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া পুত্রের ইস্কুলের

যাহিনা থাই-খরচ ইত্যাদির জোগাড় করিয়া তাহাকে কলিকাতার ইংরাজী ইস্কুলে পাঠাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

চিন্তা যেদিন ধোপদস্ত ধুতিখানির উপর বকের পালকের মত ধবধবে সাদা কামিজ আর পায়ে চকচকে বার্ণিসের চটি পরিয়া ছোট একটি পুঁটুলিতে নিজের আবশ্যক জিনিষগুলি বাঁধিয়া লইয়া পিতার সহিত কলিকাতায় গেল, এই দরিদ্র পরিবারের সেদিনকার আনন্দ বর্ণনাতীত। যে চিন্তাহরণকে চোখের আড়াল করেন না, এখন হইতে তাহাকে একলা দূরে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। কি করিয়া যে মায়ের দিন কাটিবে তাহা বুঝিতে কাহারো বাকি রহিল না, তবু অঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া বড় আশায় বুক বাঁধিয়া যোগমায়া তাঁহার নয়ন-মণিকে নয়নান্তরালে পাঠাইলেন।

চিন্তাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া তাহার পিতা যখন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন আনন্দে উৎসাহে তাঁহার বুক যেন দশ হাত ; চিন্তার মা ও দিদিদের মনে অজস্র আশা অসীম আনন্দ।

প্রথম বৎসর চিন্তা পূজার ছুটীতে বাড়ি আসিল। সম্বৎসর পরে নয়ন-মণিকে নয়নে দেখিয়া যোগমায়া পুত্রকে কোলে বসাইয়া তাহার মস্তক আনন্দাশ্রু-সিক্ত করিলেন। অন্তরের সমস্ত স্নেহ নয়নে পুঞ্জীভূত করিয়া দিদিরা ছোট ভাইটিকে দেখিলেন। তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশংসাপূর্ণ-নেত্রে সাগ্রহে তাহার মুখে তাহাদের ইস্কুলের প্রতিকথা প্রত্যেক ঘটনার কথা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া শুনিলেন, তাহার বই কয়খানি শ্লেট পেন্সিলগুলি একবার নহে দশবার করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, আর সে সকলের অধিকারীকে মনে মনে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মা-বোনের আদর-যত্ন, বাপের সস্নেহ আদেশ-উপদেশ ও শৈশব-সঙ্গীদের সহিত হাসি-খেলায় ছুটীর সপ্তাহ কয়টি নিমেষের মত কাটিয়া গেল। চিন্তা আবার কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

দ্বিতীয় বৎসরেও চিন্তা সম্বৎসরের ধরা-বাঁধার বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল ; মায়ের হাতে রান্না ভাত তরকারি পিষ্টক পরমান্ন সুতৃপ্তিতে উদরপূর্ণ করিয়া খাইল, বিজয়া দশমীর রাত্রি প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিয়া শৈশব-সঙ্গীদের সহিত কোলাকুলি করিয়া সকলের সঙ্গে সারাগ্রামখানির গৃহে-গৃহে ঘুরিয়া প্রণাম ও মিষ্টিমুখ করিয়া আসিল। দিদিদের প্রণাম করিতে তাহাদের শশুর-বাড়ি গিয়া আদর যত্ন স্নেহাশীর্ব্বাদে ও ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়া ছুটীর অবশিষ্ট

দেড়সপ্তাহ কাটাইয়া পিতামাতার চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া আবার চিন্তাহরণ কলিকাতায় মেসের একতালার স্যাঁৎসেঁতে ছোট ঘরটিতে আসিয়া বই খাতা পেন্সিল কলম লইয়া আবার সেই বৈচিত্র্য-বিহীন একঘেয়ে জীবন যাপন আরম্ভ করিল।

ইস্কুলে ভাল ছেলে বলিয়া চিন্তাহরণের যেমন একটা সম্মান সম্ভ্রম ছিল, নিতান্ত গরীবের ছেলে বলিয়া অনেকের মনে তাহার প্রতি একটা অসম্ভ্রমের ভাবও ছিল। পরিচিত ছাত্রদের মধ্যে কে কে তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত, কেই-বা অসম্ভ্রম অনাদরের ভাব অন্তরে পোষণ করিত সে তাহা জানিত, তাই নিতান্তই কাজের খাতির ছাড়া সে বড় কাহারো সহিত আলাপ-পরিচয় করিত না; ইস্কুলের ছুটীর পরে নিজের ঘরটি ছাড়িয়া কোথাও যাইত না, গ্রাউণ্ডে কাহারো সহিত কোনো খেলায় যোগ দিত না, শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় সমভাবে একলা সে নিজের কর্ত্তব্য ও অভাবজনিত অতৃপ্তি লইয়া অপরিচ্ছন্ন অন্ধকূপবৎ ঘরটির মাঝে কাটাইয়া দিত।

প্রথমে যে আনন্দ উৎসাহ লইয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, সে আনন্দ উৎসাহ ক্রমে চলিয়া গিয়াছিল। শান্তি ও তৃপ্তিতে যে হৃদয় পূর্ণ ছিল, তাহা নানা অশান্তি অতৃপ্তি ও ক্ষোভে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সহরের লোকের চমকপ্রদ উজ্জ্বল জীবনের তুলনায় তাহাদের পল্লীজীবন নিতান্তই অসার অকিঞ্চিৎকর। জীবনযাপন-প্রণালী নেহাত সঙ্কীর্ণ ও অনুজ্জ্বল বলিয়া তাহার মনে হইত। সে দেখিত গ্রামের সহিত তুলনায় রাস্তা ঘাটগুলি কেমন সুন্দর সুসংস্কৃত, কেমন জীবন্ত ভাবপূর্ণ। ঘর-সংসার কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও কেমন শৃঙ্খলা। সহরের প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে যে বিশেষত্বটুকু ছিল, চিন্তাহরণের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণগুণে সেগুলি আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিত, আর তাহার শৈশবের স্মৃতি, এমন কি পিতামাতার ও দিদিদের স্নেহস্মৃতিও যেন অনেকটা মলিন হইয়া পড়িত।

ইহার পর পিতার সস্নেহ আহ্বানে আবার যখন পরীক্ষার পরের ছুটীতে চিন্তাহরণ গৃহে আসিল, তখন সে সম্পূর্ণ নূতন মানুষ, কথায় বার্ত্তায় ধরণধারণে তাহাকে সেই চিন্তাহরণ বলিয়া চিনিয়া উঠা ভার। সম্বৎসর যাহারা তাহার দর্শনাশায় উদ্গ্রীব হইয়া দিনের পর দিন গণিয়াছিল, এখন প্রাণভরা আনন্দ লইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া তাহারা দেখিল, তাহাদের চিন্তা আর সে চিন্তা নাই, সে এখন তাহাদের হইতে বহু উচ্চে, তাহার নাগাল পাওয়া দায়।

বাহিরের লোক একটু ক্ষুণ্ন হইল। সেই দুরন্ত পল্লীশিশু আজ সহরের সভ্যভব্য শিক্ষিত যুবকে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া মা-বোনের মনে একটু গৌরবমিশ্রিত হর্ষ জাগিল; আর বৃদ্ধবয়সে অর্দ্ধাহার অনাহারের কষ্ট সহিয়া ঋণভার মস্তকে লইয়া এতদিন প্রাণপণে পুত্রকে যে অর্থ যোগাইয়া আসিয়াছেন, এতদিনে তাহা স্বার্থক হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চিন্তা আর সে চিন্তা নাই বুঝিয়া পিতার হর্ষোজ্জ্বল অন্তরে বিষাদের একটু ছায়াপাত হইল।

ইস্কুল ত্যাগ করিয়া চিন্তাকে এবার কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইবে, তাহার যোগাড়-যন্ত্র করিতে কিছু সময়ের দরকার। সুতরাং ছুটী ফুরাইবার আগেই চিন্তা কলিকাতায় গেল। এত দিন থাকিতে ছেলেকে ছাড়িতে যোগমায়ার কষ্ট হইল, কিন্তু বাধা দিলেন না। আহা, ছেলের যাহাতে পড়ার ক্ষতি হইবে যোগমায়া মা হইয়া কি তাহা করিতে পারেন?

ছুটী ফুরাইল। চিন্তা কলেজে ভর্ত্তি হইয়া বাড়িতে পত্র লিখিলেন। এখন হইতে মাসান্তে আর কতগুলি করিয়া টাকা পুত্রকে পাঠাইতে হইবে, সেই পরিমাণ অর্থ কি উপায়ে তাঁহাকে যোগাড় করিতে হইবে, চিন্তার পিতা তাহারই চিন্তায় কিছুদিন উন্মনা হইয়া রহিলেন। আর মা তাঁহার সংসারের নিতান্ত বাঁধাবাঁধি খরচপত্রের মধ্য হইতেও দুই একটি করিয়া পয়সা রাখিয়া যাহা জমাইতে পারিয়াছিলেন সেগুলির বদলে এই শুভ-দিনে দুটি চকচকে টাকা সেই দৈবজ্ঞঠাকুর আবার যদি কখনো গ্রামে আসেন তাঁহাকে দিবেন বলিয়া বস্ত্রখণ্ডের পর বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া খরচের সময় সহজে নজরে না পড়ে ঘরের এমন একটা নিভৃত স্থানে রাখিয়া দিলেন।

চিন্তার এক সহাধ্যায়ীর চেষ্টায় যাঁহার সুপারিশে চিন্তা একটু সুবিধায় কলেজে ভর্ত্তি হইতে পাইল—চিন্তার প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেন, চিন্তা ছেলেটি মন্দ নয়—শুধু দারিদ্র্যের পেষণে পিষ্ট হইয়াই অকালে দেহমনের স্ফূর্ত্তি হারাইতে বসিয়াছে। ইহাকে সাহায্য দ্বারা উন্নত করার এই উপযুক্ত সময়, এবং ভবিষ্যতে এ সাহায্যের শুভ ফল ফলিবে সন্দেহ নাই। ছেলেটির মুখের ভাব কথাবার্ত্তা চলন-ধরণের মধ্যে যে একটা বিষণ্নতা ও ক্ষোভের ভাব লুকানো ছিল তাহাও তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

বিদায়-কালে স্বীয় নামের একখানি কার্ড দিয়া তিনি চিন্তাকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলেন।

কার্ডে নাম ঠিকানা পড়িয়া চিন্তা বুঝিল, তাহার সাহায্যকারী ভদ্র লোকটির নাম স্যামুয়েল ডি, এন, মল্লিক, বাড়ি বেশি দূর নয়, চিন্তার মেসের কাছাকাছি,—ইচ্ছা বা আবশ্যক হইলে যাওয়া-আসার বিশেষ অসুবিধা হয় না, কিন্তু এতটা কাছে বাড়ি জানিয়া চিন্তা কিছু চিন্তিত হইল। তাহার যেরূপ হীনাবস্থা তাহাতে বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়; নিকটে সম্ভ্রমহানির বিশেষ সম্ভাবনা, আর সেটা চিন্তার কোনোক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।

যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অনুরোধ রক্ষার্থে একদিন চিন্তা সসঙ্কোচে স্যামুয়েল সাহেবের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব গৃহে ছিলেন, তাহার আগমনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া স্ত্রী-কন্যা ও পুত্রদের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন, তাঁহারাও চিন্তার সহিত প্রথম হইতেই বেশ পরমাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিলেন, বহুক্ষণ বহু প্রীতিকর আলোচনার পর অবসর মতো আর একদিন আসিতে অনুরুদ্ধ হইয়া চিন্তা সেদিনকার মতো বিদায় লইয়া তাহার নির্জ্জন অন্ধকূপবৎ ঘরটিতে ফিরিয়া আসিল।

প্রথম সাক্ষাতের পর নিজের প্রয়োজন ও মল্লিক-পরিবারের অনুরোধক্রমে আরো কয়েকবার স্যামুয়েল সাহেবের বাড়ি যাওয়ায় চিন্তার সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। তাহার প্রতি মল্লিক-পরিবারের অপ্রত্যাশিত সদাচরণে চিন্তা পরমাপ্যায়িত হইয়াছিল। কিন্তু এই ধনী-পরিবারের সংস্রবে আসিয়া চিন্তার নিজের দারিদ্র্য আরো ভীষণ আকার ধারণ করিল। নিজের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবনের উপর তাহার অশ্রদ্ধা জন্মিল। স্যামুয়েল সাহেবের বাড়ি হইতে সদ্য-প্রত্যাগত চিন্তাহরণ যখন আবার নিজের জীর্ণ শয্যা অতি সামান্য গৃহ-সামগ্রী ও স্বল্প সংখ্যক বস্ত্রাদির দিকে চাহিত, তখন আরো গভীরভাবে নিজের দৈন্য অনুভব করিয়া মনে-মনে দারুণ অশান্তি ভোগ করিত। গভীর রজনীতে নিদ্রাহীন চক্ষে চিন্তা ভাবিত—এ দারুণ দৈন্য ঢাকিবার কি কোনো-উপায় নাই? এ লজ্জাকর হীনাবস্থা হইতে উদ্ধারের কি কোনো সহজ পথ নাই? সত্য বটে সহরে অন্যের তুলনায় চিন্তাহরণের জীবন নিতান্তই একঘেয়ে রকমে চলিতেছিল। কিন্তু তাহার সেই বৈচিত্র্যহীন জীবনকেই চালাইবার জন্য গ্রামে তাহার জনক-জননীকে যে দুঃখ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছিল, চিন্তার তাহা ভাবিবার অবসর—বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না। স্নেহাধিক্য বশত পিতা-মাতা পুত্রকে এ সম্বন্ধে কিছু জানাইয়া ভাবনায় ফেলিতে চাহিতেন না। এক একবার নিতান্ত অর্থ-কষ্টের উপর নিজের শরীর যখন অবসন্নতার ভাবে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিত,

সেই সময় চিন্তার পিতা বলিতেন—"আর না, এইবার চিন্তাকে বলে পাঠাই আমার সাধ্যে যতদূর হবার হয়েছে, এখন তুমি নিজের পড়ার খরচ নিজে কোনো রকমে চালিয়ে নেও, এই বুড়ো বয়সে দুর্ব্বল দেহে ঋণের ভাবনা আর ভাবতে পারি নে।" কিন্তু যোগমায়া বলিতেন,—"আহা একে বাছা আমার একলা বিদেশে পড়ে আছে, তার উপর আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়ে তাকে ভাবানো কি আমাদের উচিত! শুনেই-বা সে কি করবে, এখন আমরা না দিলে সে পাবেই বা কোথায়? এখন কষ্ট যাচ্চে বলে এ দুঃখ আমাদের চিরদিন থাকবে না, চিন্তা আমাদের রোজগার করতে শিখলে দুদিনে ধার-কর্জ্জ সব শোধ হয়ে যাবে, আমরা সুখী হব।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর অধিকদিন চিন্তার নিকট এ সঙ্কটজনক আর্থিক অবস্থা লুকাইয়া রাখা গেল না। গ্রামের লোকের কাছে আর অধিক কর্জ্জ পাওয়া গেল না। গৃহের বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীও নিঃশেষ হইল।

পিতার পত্রের উত্তরে চিন্তা অনেক দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া অবশেষে লিখিয়া দিল,—আমার মেসের খরচটা কোনো রকমে নিয়মিত পাঠাইবেন, কলেজের খরচ আমি কোনো রকমে ঠিক করিব।

২

কলেজে গিয়া অবধি পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া চিন্তা আর এবারকার ছুটিতে বাড়ি গেল না। সম্বৎসর আশা করিয়া থাকিয়া পুত্র আসিবে না শুনিয়া যোগমায়ার মনে বড়ই কষ্ট হইল, কিন্তু আসিবার জন্য বিশেষ জেদ করিতে পারিলেন না, মা হইয়া ছেলের পড়ার ব্যাঘাত দিবেন কি করিয়া? তিনি ভাবিলেন —আহা, বেঁচে থাক—মন দিয়ে লেখাপড়া করুক, মানুষ হোক, আমার ছেলে আমারই আছে, আজ না হয় দুদিন পরে দেখব। টাকা তো নেই যে, নিজে গিয়ে দেখে আসবো, সে নাইবা এল, আমাদের কি আর যেতে নেই?—তা সে টাকা কই এখন? যোগমায়ার অন্তর হইতে কে যেন বলিল, "তোর ভাবনা কি মা, তুই তো রাজার মা।" যোগমায়া নানা কথায় মনকে প্রবোধ দিয়া পুত্রের অদর্শন-কষ্ট ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিদিরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাইয়ের অনুপস্থিতি-হেতু দেওয়ালের গায়ে ফোঁটা দিয়া উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ করিয়া মনে মনে হরির পায়ে মাথা খুঁড়িয়া বলিল,—"হরি বাঁচিয়ে রাখ, এক ভাই আমার সহস্র হোক, সুনাম সুখ্যাতিতে দেশ পূরুক, ছোট ভাইটি হতে আমার বাপের বংশ উজ্জ্বল হোক।"

যাহা হোক, সুখ, দুঃখ আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া আরো একবৎসর কাটিয়া গেল। চিন্তার পিতার নিকট পত্র আসিল, এবারও চিন্তা পরীক্ষা পাশ করিয়া পরবর্ত্তী শ্রেণীতে পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। নূতন পড়ার বন্দোবস্তেই ছুটী ফুরাইল, আর দেশে যাইবার সুবিধা হইয়া উঠিল না। আগামী ছুটীতে নিশ্চয় যাইবে।

ছেলে আবার পাশ করিয়াছে, কিন্তু বাড়ি আসিতে পারিল না, এই আনন্দ ও দুঃখে যোগমায়া হাসিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইল। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের ডাকিয়া তুলসীতলায় হরির লুট দিল; দেবালয়ে-দেবালয়ে যথাসাধ্য পূজা দিয়া আসিল। কিন্তু গ্রামের মধু সর্দ্দার চিন্তার পিতাকে বাহিরে ডাকিয়া চুপি চুপি কি বলিয়া গেল, তিনি সহসা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কপালের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল, ভ্রূকুঞ্চিত হইল নিশ্বাস জোরে বহিতে লাগিল! পরক্ষণেই আবার কোটরগত চক্ষু দুটি অশ্রুপ্লাবিত হইল, কিন্তু সে অশ্রু ঝরিয়া পড়িবার আগেই আবার দারুণ ক্রোধের উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল! নয়নে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইল; ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, ক্ষোভ বিস্ময় ও ক্রোধের উত্তেজনায় ক্ষণে ক্ষণে মুখের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল! তিনি বহুকষ্টে মনোভাব সম্বরণ করিতে করিতে যোগমায়াকে ডাকিয়া বলিলেন, "গিন্নি, ঘর থেকে আমার চাদরখানা আর ছাতিটা দাও তো, আমায় একবার বাইরে যেতে হবে।"

যোগমায়া রন্ধনশালা হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন গা, কোথায় যেতে হবে এখন? অন্যমনস্কভাবে চিন্তার পিতা বলিলেন, "কলিকাতায় চিন্তার কাছে।"

উত্তর শুনিয়াই যোগমায়ার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতায়! চিন্তার কাছে? কেন। বাছার আমার অসুখ-বিসুখ হয়নি তো? ওগো বলনা গা হঠাৎ চিন্তার কাছে যাবে কেন? কি হয়েচে তার?"

গৃহিণীর উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিয়া চেষ্টাকৃত হাস্যে প্রফুল্ল ভাব দেখাইয়া চিন্তার পিতা বলিলেন, "না গো না, সে-জন্য তোমার ভাবনা নেই, তোমার চিন্তা ভালোই আছে; আমি কলকাতায় যাচ্চি একটা বিশেষ দরকারে। কলকাতায় যখন যাচ্চি চিন্তার বাসায় যাব না তো আর কোথায় যাব।"

যোগমায়ার মন এ কথায় ঠিক শান্ত হইল না; বহুবার বহু প্রশ্ন করিয়া জানিবার চেষ্টা করিলেন—চিন্তা ভালো আছে তো? কোনো অসুখ হয় নি তো?

চিন্তার পিতা বিশেষভাবে বুঝাইলেন যে, চিন্তা বেশ ভালোই আছে, সেজন্য ভাবনা নাই; কিন্তু যে দরকারে তিনি যাইতেছেন কাজ সারিয়া ফিরিতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগিবে।

তাঁহার অনুরোধক্রমে মধু সর্দ্দার ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিল, টিকিট কিনিয়া তাড়াতাড়ি দুজনে ট্রেণে উঠিলেন। গাড়িতে বসিয়া চিন্তার পিতার অন্তর আর বাধা মানিল না; মুখে উড়ানি-ঢাকা দিয়া বৃদ্ধ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। মধু সর্দ্দার তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিল,—"বিপদের সময় অত অধৈর্য্য হলে চলবে না খুড়ো মহাশয়, একটু শক্ত হয়ে খোঁজ-তল্লাস করে আইন-কানুন দেখে বেটাদের হাত থেকে চিন্তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তার দোষ কি? ছেলে মানুষ বোঝে-সোঝে নি, পাঁচজনের কুহকে পড়ে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে। শুনেছি এখনো দীক্ষা হয়নি, জর্ডনের জল মাথায় পড়েনি, এখনো উদ্ধারের সময় আছে। দেশের লোক এখনো কিছু শোনেনি, কিছু জানা-জানি হয় নি, কোনো গোল হবে না। এখন কোনো রকমে একবার এনে ফেলতে পারলে হয়, একবার তাকে হাতে পেলে আর ভাবার ছাড়ান নেই।"

চিন্তার পিতা চুপ করিয়া শুধু শুনিতে লাগিলেন, উত্তর দিলেন না; উত্তর-প্রত্যুত্তরের শক্তিও বোধ হয় তখন তাঁহার ছিল না, তিনি তখন কেবল সংশয়ের সহিত ভাবিতেছিলেন, "অ্যাঁ চিন্তা, আমার সেই চিন্তা! বুকের রক্ত দিয়ে এত কাল যাকে মানুষ করে এলুম, আজ তারি এই কাজ! এত শিক্ষার শেষে এই ফল হল!"

মধু সর্দ্দার আবার আপন মনে বলিল—"দোষ নেই খুড়োমশায়, চিন্তার কোনো দোষ নেই, ওরা কি যাদু জানে, বুড়ো-বুড়ো লোকগুলোর মাথা ঘুরিয়ে দেয়, আর চিন্তা তো আমাদের এই সেদিনকার ছেলে, কলেজে পড়চে তাই বিদ্যেটাই না হয় শিখেছে, বুদ্ধি তো পাকে নি।"

চিন্তার পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বল তো কে সে সামুয়েল সাহেব —আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে, আমার প্রস্তুত অন্নে ছাই দিলে! বৃদ্ধের বদনে" আবার যুগপৎ ক্রোধ ও ক্ষোভের চিহ্ন প্রকটিত হইল।

৩

কিছুতেই কিছু হইল না। এক সপ্তাহ ধরিয়া অনেক সলা-পরামর্শ অনুরোধ-উপরোধ ও উকীলের বাড়ি হাঁটাহাঁটি ছুটাছুটী করিয়া মধু সর্দ্দার ও চিন্তার পিতা হতাশ হইয়া বাসায় ফিরিলেন। চিন্তার উদ্ধারসাধন হইল না। চিন্তা শিশু-

নিরক্ষর বা উন্মাদ নহে, সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান ও সাবালক, সুতরাং পাপ হইতে পরিত্রাণ-কামনায় ধর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া স্ব-ইচ্ছায় সুস্থ শরীরে সে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে তাহার পিতা-মাতার বা বন্ধু-বান্ধবের কিছু বলিবার নাই। ভগ্নহৃদয়, ক্ষীণ আশায় বাঁধিয়া চিন্তার পিতা বলিলেন, "মধু চেষ্টা কর, একবার যাতে চিন্তার সঙ্গে দেখা করতে পারি, আইন-কানুন চুলোয় যাক আমি একবার তার মনের কথাটা তার নিজের মুখে শুনে তবে বুঝব। আমি যে তার বাপ, সে আমার ছেলে, তার নিজের মুখের কথা না শুনে লোকের কথায় আমি ফিরতে পারবো না।"

বহু চেষ্টায় চিন্তার পিতা চিন্তার সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হইলেন। পিতার ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব সকলই হইল, কিন্তু স্যামুয়েল ভি এন, মল্লিকের ভাবী জামাতা শ্রীমান চিন্তাহরণ নূতন আলোকের নবজীবন হইতে আর অন্ধকারে ফিরিল না।

চিন্তার পিতা চিন্তার বর্ত্তমান গ্যাসদীপ্ত সুবাসামোদিত সুসজ্জিত পাঠগৃহ হইতে বাহির হইয়া শুনিতে পাইলেন, কোনো তরুণী বীণানিন্দিত-স্বরে চিন্তাকে প্রিয় সম্বোধনে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে পালাবার নানারকম ফন্দি এঁটে কে সে বুড়োটি এইমাত্র তোমার কাছে এসেছিল বলত ?"

চিন্তা তাহার কি উত্তর দিল তাহা শুনিবার মত ধৈর্য্য ও প্রবৃত্তি তখন তাহার ছিল না ; কোনোমতে তিনি গেটের বাহিরে আসিয়া মধু সর্দ্দারের স্কন্ধ-অবলম্বনে অর্দ্ধ-জ্ঞানশূন্য অবস্থায় গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন।

সোজাসুজি ঘরে না গিয়া একটি দিন অন্যস্থানে থাকিয়া দেহমনের কথঞ্চিৎ সুস্থতা বিধান করিয়া মধুসর্দ্দার, চিন্তার পিতাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া যোগমায়া শিহরিয়া উঠিলেন—"এ কি গো ! এই ক দিনে তোমার এ কি চেহারা হয়েচে ! অসুখ করেছিল নাকি ! চোখ খোলে পড়েচে, মুখে যেন কে কালি মেড়ে দিয়েছে ! দেহ আধখানা হয়ে গেছে ! এ কি ! দেখে কান্না পাচ্ছে যে !"

চিন্তার পিতা কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"না অসুখ কিছু নয়, তবে ঘরে শরীর থাকে এক রকম, আর কোথাও গেলে সময়ে নাওয়া-খাওয়া ঘুম হয় না, শরীর খারাপ হয়ে যায়।"

সরলহৃদয়া যোগমায়া তাহাই বুঝিয়া সন্তুষ্টমনে চিন্তার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। চিন্তার পিতা কুশল সংবাদ দিলেন, মায়ের প্রাণ শান্ত হইল।

অনুগত প্রতিবেশী মধু সর্দ্দারের সাহায্যে সপ্তাহ-মধ্যে বহুকালের বাসভূমি বিক্রয় করিয়া চিন্তার পিতা চিন্তার শিক্ষাব্যয় সঙ্কুলান-জন্য যে ঋণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পরিশোধ করিয়া গৃহিণীকে বলিলেন,—"চিরকাল শুনতে পাই, বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা-দর্শন করবার তোমার বড় সাধ, তা এইবার চলনা একবার দুজনেই কাশী যাই।"

আশ্চর্য্য হইয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁগা বিশ্বেশ্বর-অন্নপুন্নো দেখতে যাবে তা ভিটে বেচে বাস উঠিয়ে যাবে কেন? দুদিন পরে ফিরে আসতে হবে ত?"

"তখন আবার কিনলেই হবে; ধার রেখে তীর্থে যাবো পথে যদি মরেই যাই। টাকা হলে বাড়ি আবার কিনতে কতক্ষণ!"

"এই, মাসখানেক পরেই তো চিন্তা আসবে, সেই সময় গেলে হয় না? তাকে নিয়ে যাবার যে আমার বড় সাধ; আর নিভা যে আমায় বলে রেখেচে 'মা, তুমি যখন কাশী যাবে তখন আমায় খবর দিয়ো নিজে খরচ পত্র করে তোমার সঙ্গে যাব, তাকে একবার খবর দাও না?"

চিন্তার পিতা যোগমায়াকে তাড়া দিয়া বলিলেন,—"না না, কাকেও না—কাকেও না, যাকে নিয়ে যাবার সাধ অন্যবারে নিয়ে যেয়ো, এবারে দুজনে যাই চল। আর এক কথা, দূরের পথে যাচ্চ, গ্রামে যার যার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে দেখা করে কথা কয়ে নেও, বলা যায় কি যদি আর দেখা নাই হয়।"

উদ্বিগ্নভাবে যোগমায়া বলিলেন, "কেন আর আসতে পাবনা নাকি? তোমার কথার ভাবটা কি বল তো? অমন কর তো আমি যাব না, তোমার অন্নপুন্নো-বিশ্বেশ্বর দেখাতে হবে না, আমার চিন্তা আমায় নিয়ে যাবে, তার সঙ্গে গেলে আমার সব তীর্থ হবে।"

চিন্তার পিতা জোরে একটা নিশ্বাস ফেললেন,—"হুঁ" বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন, কিন্তু সেটা ঠিক হাসি কি কান্না যোগমায়া তাহা ঠিক বুঝিল না, স্বামীর মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল!

চিন্তার পিতা আবার তাড়া দিয়া বলিলেন, "যাবে তো শীঘ্র চল না, আর দেরি কিসের? টিকিট কেনা হয়ে গেছে আজকের গাড়িতেই যাব।"

যোগমায়া হাসিয়া মনে মনে ভাবিল, তোমার সকলি বিপরীত, যাবে না তো যাবে না, আবার নিয়ে যাবার মন হয়েচে তো আর দেরি সইচে না।

স্বামী-স্ত্রীতে যাত্রা করিয়া পথে পা দিয়াছেন, এমন সময় ডাক-পিয়নের সহিত

মধু সর্দ্দার ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"খুড়োমশায় ডাকওলা আপনার নামের একখানা পোষ্টকার্ড আর দুখানা ইন্‌সিওর্ড চিঠি এনেচে, দুটো সই দিয়ে দিন।" চিন্তার পিতা বিস্ময়ের সহিত সই দিবার জন্য কলম উঠাইয়া পোষ্টকার্ডখানা পড়িয়া বুঝিলেন, তাঁহার সুপুত্র নিজের শিক্ষার ব্যয় পিতা-মাতার খোরাকি বাবদ দুই হাজার টাকা পাঠাইয়াছে এবং ভবিষ্যতে পাঠাইবার আশ্বাস দিয়াছে। দৃঢ়তার সহিত অকম্পিত হস্তে ইনসিওর্ড পত্র দুইখানির উপর মোটা মোটা গোটা গোটা অক্ষরে "Refused" লিখিয়া পিওনের হাতে দিয়া একবার উদাস দৃষ্টিতে গ্রামের দিকে চাহিয়া চিন্তার পিতা প্রসন্নমনা প্রফুল্লমুখী যোগমায়ার সহিত মূর্ত্তিমান বিষাদের মতো নীরবে ষ্টেসনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তীর্থযাত্রী দম্পত্তির সম্মুখ দিয়া এক কৃষক-বালক করুণ-সুরে গাহিয়া গেল—

"ওমা নন্দরাণি! তোর নীলমনিকে হারিয়ে এনু মথুরায়,
কত ডাকনু কেঁদে এলোনা মা কাঁদিয়ে দিলে উভরায়।"

প্রয়াস-প্রবাসিনী।

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জন্ম—২৮ শে বৈশাখ, ১২৭০
মৃত্যু—৪ ঠা পৌষ ১৩২২

কুশদহর পাঠক-পাঠিকাগণ ইউ, রায় এণ্ড সন্সের কৃত সুন্দর সুন্দর ছবি অনেক দেখিয়াছেন, বস্তুত তাঁহাদের সাহার্য্য না পাইলে আমরা কুশদহর কলেবর চিত্র-সম্পদে সুন্দর করিতে পারিতাম না। আজ আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের সেই উপকারী বন্ধু—শ্রদ্ধাস্পদ উপেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী আর ইহ-জগতে নাই। আমরা যে কেবল চিত্র-সম্বন্ধে তাঁহার নিকট ঋণী তাহা নহে, তাঁহার উচ্চ ধর্ম্ম জীবনের যে আদর্শ আমাদের চিত্ত-পটে অঙ্কিত করিয়া গেলেম, তাহা ভুলিবার বিষয় নহে। আগাগোড়া তাঁহার জীবন-

কাহিনী উপদেশপূর্ণ,—বিশেষত শেষ জীবনে তিনি যে গভীর যোগ ও শান্তির সমাচার দিয়া গেলেন তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাসী ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। এবার কুশদহের মুখপত্রে তাঁহার একখানি চিত্রসহ এই সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মসুয়া গ্রামে ১২৭০ সালে (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) ২৮ বৈশাখ উপেন্দ্রকিশোর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ তেজস্বী ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ বলিয়া দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ ৺লোকনাথ রায়ের পুত্র উদার তেজস্বী স্বাধীনচেতা কালীনাথ রায় লোকসমাজে মুন্সী শ্যামসুন্দর নামেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও পার্সি ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাত্যহিক দেবার্চ্চনাদিতে তিনি স্বরচিত স্তোত্রাদি ব্যবহার করিতেন।

শ্যামসুন্দরের দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার খুল্লতাত ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল ও জমিদার হরিকিশোর রায় চৌধুরী তাঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। সেই অবধি তাঁহার নাম হইল উপেন্দ্রকিশোর।

বালক উপেন্দ্রকিশোর ময়মনসিংহ জেলা ইস্কুলে ভর্ত্তি হন। অতি শৈশবে তিনি আপনা হইতেই শিল্প সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। কথিত আছে, শিশু উপেন্দ্রকিশোর পিতার সম্মুখে নাচিতে নাচিতে "যদু বলে কানু ভাই, ছাড় দুনিয়ার বাদশাই" বলিয়া গান করিতেন। বিনা শিক্ষা ও সাহায্যে অতি অল্প বয়সে শুধু স্বাভাবিক প্রতিভা ও নিজের আগ্রহে তিনি বাঁশী ও বেহালা বাজাইতে ও ছবি আঁকিতে শিখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনের শেষ ভাগে বেহালা তাঁহার প্রধান আরাম ও আনন্দের কারণ হইয়াছিল। শ্রান্তি, নৈরাশ্য, দুঃখ এমন কি রোগযাতনা তিনি বেহালা বাজাইতে-বাজাইতে ভুলিয়া যাইতেন। সেই সুমিষ্ট বাজনা শুনিয়া অনেক সময় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সঙ্গীতের উপর ভক্তির উদ্রেক হইত।

তখন ময়মনসিংহে শরচ্চন্দ্র রায় নামে একজন উৎসাহী ছাত্রবৎসল সহৃদয় ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উত্তর কালে উপেন্দ্রকিশোর একজন মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবে। যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইল, শরৎবাবু ইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে বলিলেন,—"কই তাঁর প্রিয় ছাত্র এখনও বেহালা ও তুলি লইয়াই মত্ত, এখনও তো তার মন বইএর দিকে ফিরিল না!" শিক্ষক মহাশয় ছাত্রকে ডাকাইয়া

বলিলেন, "তোমার উপর আমাদের অনেক আশা-ভরসা, দেখো যেন আমাদের নিরাশ কোরো না"—সেই দিনই বালক উপেন্দ্রকিশোর ঘরে আসিয়া আপনার সাধের বেহালাটি ভাঙিয়া ফেলিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। যথাকালে ১ ৲ টাকা বৃত্তি লইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপরে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং কিছুদিন মেট্রপলিটন কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই শেষোক্ত কলেজ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এ পাশ করেন।

কলিকাতায় আসিবার কয়েক বৎসর পরেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করায় তাঁহার দেশের লোকে তাঁহার উপর অনেক শাসন ও অত্যাচার করিয়াছিল। কিন্তু তিনি এমন প্রশান্তচিত্ত লোক ছিলেন যে, তাহাতে বিচলিত না হইয়া তিনি কেবল আপনার সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলকে শান্ত করেন।

বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা হরিকিশোর রায়ের মৃত্যুতে তাঁহার জীবনে এক পরীক্ষা-সঙ্কট উপস্থিত হইল। নিষ্ঠাবান ও প্রতিষ্ঠাবান হিন্দু-সমাজ-নেতার শ্রাদ্ধে যতপ্রকার সমারোহ দান-দক্ষিণাদির ব্যবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহার আয়োজন হইয়াছে ; এমন সময় স্বাধীন-চেতা অকুতোভয় যুবক উপেন্দ্রকিশোর বলিয়া বসিলেন, "আমি প্রচলিত দেশাচার মতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিব না।" ক্রুদ্ধ রুষ্ট আত্মীয়-স্বজন স্তম্ভিত ! সমাজে তাঁহার নিন্দাবাদে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সে একনিষ্ঠ দৃঢ়চিত্ত যুবক সকল ভ্রূকুটিভঙ্গীকে উপেক্ষা করিয়া অবিচলিতভাবে আপন বিশ্বাস-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালন করিয়া সে অগ্নি পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।

ইহার অনতিকাল পরেই দেশবিশ্রুত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ-সঙ্কল্পের সংবাদ দেশে গিয়া পৌঁছিল। এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অনুষ্ঠান অসবর্ণ বিবাহ হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু প্রতিবাদের তপ্ত নিশ্বাস কোনো দিনই তাঁহার চিত্তের অটল স্থৈর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কোনোরূপ বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত না হইয়াও তাঁহার চিরপ্রসন্ন স্বভাবের বলে প্রতিবাদের কোলাহল থামিয়া গেল।

এই সময় হইতে অথবা ইহার পূর্ব্বেই তিনি শিশু-সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। এখন শিশুদের জন্য কতরকমের বই আর কাগজ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সময় তাহার কিছুই ছিল না। শিশুরা কটমট উপদেশপূর্ণ গুরুগম্ভীর বিষয় পড়িয়া হয়রাণ হইত। প্রথমে ৺প্রমদাচরণ সেন 'সখা' নাম দিয়া শিশুদের উপযোগী একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। এবং উপেন্দ্রবাবুর এদিকে অনুরাগ

আছে দেখিয়া তাঁহাকে "সখা"য় লিখিতে আহ্বান করেন। সেই অবধি তিনি শিশুদের সেবায় এমন উৎসাহে—এমন অকাতরে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন যে, শেষ জীবনে রুগ্ন শরীরেও এ ব্রতপালনে তিনি পরম আনন্দলাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি শিশুদের জন্য যে কাজ করিয়াছেন, জীবনে যদি আর কোনে কাজও না করিতেন, তবু এই কাজই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

তাঁহার প্রথম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ "ছেলেদের রামায়ণ" মুদ্রাঙ্কন-কালে তাঁহার স্বহস্তাঙ্কিত চিত্রগুলি উড্‌এনগ্রেভারের হস্তে যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তাহারই ফলে এ'দেশে বিজ্ঞানসম্মত চিত্র শিল্পের প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি উৎসুক হইয় পড়েন। লঘুভাবে কোনো কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। যখন যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহারই সাধনায় একেবারে নিমগ্ন থাকিতেন। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি শক্তি অর্থ স্বাস্থ্য ও সময় অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, এবং গুরুতর মানসিক শ্রমের ফলে অকালে আয়ুক্ষয়কর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

হাফটোন শিল্প তখন সবেমাত্র প্রতিপত্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—তখনও তাহার মূল সূত্রাদি সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই; মতসঙ্কুল অস্থিরতার মধ্যে তাহার কার্য্য-প্রণালীর সঙ্কেতাদি তখনও সুসঙ্গতরূপে নির্ণীত হয় নাই। তিনি স্বাধীনভাবে এইসকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহার যেপ্রকার সমাধান করেন, তাহাই বর্ত্তমানে সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছে। হাফটোনের যেসকল প্রণালী পাশ্চাত্য দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে বহুল পরিমাণে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থাই অনুসৃত হইয়াছে। এ-ক্ষেত্রে তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার কৃতিত্ব নানাদেশে সুখ্যাতিলাভ করিয়াছে।

এ সব তো বাহিরের কথা। আসল মানুষটির পরিচয়,—তিনি খাঁটি লোক ছিলেন চিন্তায় বাক্যে আচরণে সত্যকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে তিনি কোনো দিন ইতস্তত করেন নাই। কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বুঝিতেন, তাহা পালনের জন্য সুখ-দুঃখ সাংসারিক লাভ-ক্ষতি সমস্তই তাঁহার কাছে তুচ্ছ বোধ হইত। এত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার অহঙ্কার ছিল না। তিনি নিরভিমান, নিরহঙ্কার, সরলপ্রাণ, সর্ব্বজনপ্রিয় ও সকলের বন্ধু ছিলেন।

দুরন্ত রোগ-নির্য্যাতনের মধ্যে আপনার চিত্তের স্থৈর্য্যকে রক্ষা করিয়া চিকিৎসকের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা তিনি পালন করিয়া আসিতেছিলেন।

মৃত্যুর প্রায় ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে রোগ যখন সহসা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেহকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তিনি চিকিৎসকদিগের শত আশ্বাস সত্ত্বেও তাহার মধ্যে কালের আহ্বান শুনিয়া অটল বিশ্বাসে, প্রশান্তচিত্তে পরম আনন্দে লোকান্তর-প্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কি পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তিনি পরকালের কথা বলিয়া গেলেন! মৃত্যুর বিভীষিকা কি অপরূপ আনন্দময় মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট দেখা দিয়াছিল! তিনি পরিবারবর্গকে বলিয়াছিলেন, "আমার জন্য তোমরা শোক করিয়ো না, আমি আনন্দে আছি, আনন্দেই থাকিব।" এ কি আশ্চর্য্য সান্ত্বনার কথা! যেমন আনন্দ কোলাহলের মধ্যে শিশু এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি আনন্দের আহ্বানে অমর আত্মা লোকান্তরপ্রাপ্ত হয়, এই সাক্ষ্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে ভক্তিভাজন নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে তিনি প্রার্থনা করিতে বলেন। তিনি প্রার্থনার সময় বলেন, "তুমি ইহার জীবনের অপরাধ সমুদয় মার্জ্জনা কর।" উপেন্দ্রকিশোর এ প্রার্থনায় তৃপ্ত হইলেন না। আবার তিনি নিজেই আকুলভাবে প্রার্থনা করিলেন, "আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, এ প্রার্থনা আমি করি না। যদি দণ্ডদান আবশ্যক হয়, দণ্ডই দাও। কিন্তু আমায় পরিত্যাগ করিয়ো না।"

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন, রবিবার উষার প্রাক্কালে পাখীর কাকলী শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাখীরা এমন করিয়া ডাকে কেন?" দুটি ছোট ছোট পাখী জানালার কাছে আসিয়া কিচির-মিচির করিয়া উড়িয়া গেল। তিনি বিস্মিত-ভাবে তাকাইয়া বলিলেন, "পাখী কি বলিয়া গেল শুনিলে না? পাখী বলিল—'পথ পা' পথ পা।'" রবিবার দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সকলের আশারও অবসান হইয়া আসিল। আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আত্মীয়-স্বজন সকলে সমবেত হইলেন।

প্রয়াণ-কালে উষালোকে সঙ্গীত হইতেছিল—যখন গান আরম্ভ হইল, "জানি হে যবে প্রভাত হবে তোমার কৃপা-তরণী লইবে মোরে ভবসাগর-কিনারে" তখনও তাঁহার মৃদু-কম্পিত ওষ্ঠ যেন এই সঙ্গীতের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়াছিল। তারপর আপনা হইতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে নিশ্বাস থামিয়া গেল—অস্তমিত জীবন-সূর্য্য কোন্ নূতন লোকে নূতন প্রভাতের নব আনন্দে উদিত হইল জানি না। যে দয়ার সাক্ষ্য তিনি আজীবন বহন করিয়া গেলেন, সে-দয়া আজো তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। যে-আনন্দের আস্বাদনে বিভোর হইয়া তিনি বলিয়া-

ছিলেন, "আমি আনন্দে আছি, আনন্দেই থাকিব" সেই আনন্দ তাঁহার অনন্ত জীবন-পথের শাশ্বত সঙ্গী হইয়া চলিয়াছে।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তি।"

কুশদহ-বৃত্তান্ত

(পীর-মাহাত্ম্য)

মুসলমানদিগের শাসনকাল হইতে কুশদহে কয়েকটি পীর পূজিত হইয়া আসিতেছেন! এইসকল পীরের মধ্যে সত্যপীর, ঠাকুরবর সাহেব, ওলাবিবি, বিবিচম্পা, দক্ষিণরায়, পীরহৈদর, মাণিক পীর ও মুস্কিল আসান। ইঁহাদিগের মধ্যে ওলাবিবি, ও বিবিচম্পা স্ত্রীলোক এবং দক্ষিণরায় হিন্দু হইয়াও পীরের ন্যায় পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এইসকল পীর ব্যতীত হাড়োয়ায় পীর গোরাচাঁদ, পাণ্ডুয়ার গাজী সাহেব ও একদিল্ সাহেব এবং হিজ্‌লির মছন্দি সাহেবের নামও উল্লেখযোগ্য।

১। উপরি-লিখিত পীরগুলির মধ্যে কুশদহে সত্যপীরের প্রভাব সর্ব্বোপরি। কোন্ সময় হইতে সত্যপীরের পূজা এই কুশদহে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মুসলমান শাসন-কালের পূর্ব্বে সত্যপীরের পূজা প্রচলিত ছিল কি না, তাহা বলা যায় না। কারণ সত্যপীরকে সত্যনারায়ণও বলা হয়, এবং এই সত্যনারায়ণের বিবরণ পুরাণাদিতে দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয়, মুসলমান শাসন-কালের পূর্ব্বেও সত্যনারায়ণের পূজা প্রচলিত ছিল।

"যেই সত্যনারায়ণ সেই সত্যপীর।
দুই কুল লইছে পূজা করিয়া জাহির॥"

স্কন্দ পুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডে ভগবান্ যাহা নারদকে বলিয়াছিলেন, তাহাই আবার নৈমিষারণ্যে মুনিগণ দ্বারা কথিত হইয়া পুরাণে স্থান পাইয়াছে। রেবাখণ্ডে লিখিত সত্যনারায়ণ কোথাও পীর, এবং প্রসাদ কোথাও সিন্নি আখ্যাপ্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু রামেশ্বরী, শিবরাম প্রভৃতি-রচিত সত্যপীরের কথার সহিত

রেবাখণ্ডের সত্যনারায়ণের সহিত পূজা ও কথায় একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। রেবাখণ্ডের সত্যনারায়ণ ব্রাহ্মণ, এবং রামেশ্বর ও শিবরামের সত্যপীর মুসলমান ফকির বলিয়া উল্লিখিত আছে।

১৩১৭ সালের প্রবাসীতে "বঙ্গে তিন পীর" প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন যে, উত্তরবঙ্গ ষ্টেট্-রেলওয়ের জামালগঞ্জ ষ্টেসনের ৪ মাইল পশ্চিমে মালঞ্চা নামে একটি নগর ছিল। সেই নগরের রাজা মৈদনবের অবিবাহিতা কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে সত্যপীর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমে পিতামহকে, তৎপরে অন্যান্য লোককে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সত্যপীরের পূজার প্রকরণে অনেকটা ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভাব জড়িত রহিয়াছে। কিন্তু রেবাখণ্ডের সত্যনারায়ণকে কোথাও "পীর" আখ্যা দেওয়া হয় নাই। কেবল পীরের স্থানে "দণ্ডী" এই কথা লেখা আছে। রেবাখণ্ডে-লিখিত সত্যনারায়ণের বিবরণ সংক্ষেপে এখানে লিখিত হইল।

একদিন মহর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে গিয়া নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, কলিকালে জীবের কিরূপে উদ্ধার হইবে?" নারায়ণ বলিলেন—"কলিকালে সত্য-নারায়ণের পূজা করিলে জীব উদ্ধার পাইবে।"

নারায়ণ যাহা নারদকে বলিয়াছিলেন তাহাই আবার নৈমিষারণ্যে সূতমুনি শৌনকাদিমুনিদিগকে বলিয়াছিলেন।

ব্রত-কথা—

কাশীপুর গ্রামে সতানন্দ নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সত্য-নারায়ণের কৃপায় তিনি ধনশালী হইয়াছিলেন। সতানন্দ ব্রাহ্মণ হইতে একে একে কাঠুরিয়াগণ তৎপরে উল্কামুখ নামে জনৈক রাজা এবং তাহার স্ত্রী প্রমুগ্ধা, ভদ্রশীলা নামক নদী-তীরে সত্যনারায়ণের পূজা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক অপুত্রক সওদাগর তথায় নৌকারোহণে আসিয়া সমস্ত শুনিয়া পুত্রার্থে সত্যনারায়ণের পূজা করিলে তাঁহার স্ত্রী লীলাবতী কলাবতী নামে একটি কন্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সওদাগর সত্যনারায়ণের পূজা করিতে ভুলিয়া যাওয়ায়, জামাতা-সহ রত্নসারপুরের রাজা চন্দ্রকেতু-কর্তৃক চোররূপে ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। গৃহে সওদাগরের কন্যা সত্যনারায়ণের পূজা করিলে, সওদাগর কারামুক্ত হইয়া রাজা-কর্তৃক ধন-ধান্যে বাণিজ্য-তরণী পরিপূর্ণ করিয়া বিদায় দিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে সত্যনারায়ণ "দণ্ডী"র বেশে দেখা দিলে, সওদাগর সত্যনারায়ণের সহিত মিথ্যা বলায় পুনরায় বিপদে পতিত হন। তৎপরে সওদাগরের

স্ত্রী সত্যনারায়ণের কথা অমান্য করায় ঘাটে নৌকাসহ জামাতা ডুবিয়া যায়। পরে সত্যনারায়ণের কৃপায় পুনর্ব্বার সমস্ত প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয় অশ্বধ্বজ নামে একরাজা অরণ্য-মধ্যে গোপদিগকে সত্য-নারায়ণের পূজা করিতে দেখিয়া উপহাস করায় তাঁহার একশত পুত্র বিনষ্ট হয় এবং তিনি হৃতসর্ব্বস্ব হন। তৎপরে সত্যদেবের পূজা করায় সমস্ত প্রাপ্ত হন। ইহাই স্কন্দপুরাণের সত্যনারায়ণ। ইহাতে পীরের কোনো সংস্রব নাই। পূজার প্রকরণেও কোনোপ্রকার অপভাষা ব্যবহার নাই।

পূজার প্রকরণ—

সংক্রান্তি বা পূর্ণিমা তিথিতে সায়ংকালে পবিত্র হইয়া, 'মণ্ডল' স্থাপনপূর্ব্বক বন্ধুগণসহ রম্ভা, ঘৃত, ক্ষীর (দুগ্ধ), ময়দা (ময়দা না পাইলে চাউল-গুঁড়া), চিনি বা গুড় এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রসাদ প্রস্তুত করিতে হয় এবং এই প্রসাদ সকলকে দিতে হয়। কিন্তু রামেশ্বরী সত্যপীরে কেবল পীরের মতো ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। রামেশ্বরী সত্যপীরে পূজার প্রকরণ একটু অন্য প্রকার—

"গোময়েতে বেদি সংস্কার করে স্থান।
আলিপনা দিবে ধ্বজা পতাকা নিশান॥
বেদিতে পাতিবে পীঠ তাতে দিব্য বাস।
তাতে ছুরী কাটারী বা খড়্গ চন্দ্রহাস॥
তার চারি তরফে সুচারু চারি তীর।
তার মধ্যে অবগত আমি সত্যপীর॥

দুগ্ধ গুড় আটা আর রম্ভা পান গুয়া। সম্ভব বৈভব তব সব সওয়া সওয়া॥
এই রামেশ্বরী সত্যপীরের পূজাই কুশদহের মধ্যে প্রচলিত।

২। ঠাকুরবর সাহেব—ইনি একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একজন পীরের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। ইনি হাড়োয়ার পীর গোরা-চাঁদের সমসাময়িক। ঠাকুরবর সাহেবের লীলাক্ষেত্র সমগ্র কুশদহে হইলেও চারঘাট গ্রামটি তাঁহার প্রধান লীলাস্থান। এই স্থানেই তাঁহার জাহির এবং সমাধি। তাঁহার সমাধির উপর চারঘাটের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে একটি বিলের ধারে একটি সুদৃশ্য মস্‌জিদ বা মন্দির নির্ম্মিত আছে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এখানে হাজৎ বা পূজা দিয়া থাকেন। স্থানীয় ফকিরগণই ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

ঠাকুরবর সাহেব যে-প্রকারে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ চারঘাট-নিবাসী স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এবং জনশ্রুতিতে যেসকল বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই এইখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

চারঘাট গ্রামটি যমুনা নদীর উপর অবস্থিত। এক্ষণে যে-স্থানে চারঘাটের হাট হয় সেইস্থানে হরে শুঁড়ি নামক এক দরিদ্র বাস করিত। সংসারে তাহার মাতা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। হরে শুঁড়ির মাতার দরিদ্রতা দেখিয়া ঠাকুরবর সাহেবের দয়া হইল। তিনি হরে শুঁড়ির মাতাকে বলিলেন যে, তাঁহার নামে পূজা দিলে তাহার আর কোনো কষ্ট থাকিবে না। হরে শুঁড়ির মাতা তাহাই করিল। ঠাকুরবর সাহেবের কৃপায় অল্পদিনের মধ্যে হরে শুঁড়ির অবস্থা ফিরিল। কিন্তু হরে শুঁড়ি ঠাকুরবর সাহেবের কৃপায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া ঠাকুরবর সাহেবের পূজায় বিরত হইল। তাহাতে ঠাকুরবর সাহেবের ক্রোধ হইল। সেই ক্রোধে পতিত হইয়া হরে শুঁড়ি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শোকে ও অভিমানে সপরিবারে যমুনা নদীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। যে স্থানে হরে শুঁড়ি ডুবিয়াছিল আজো লোকে তাহাকে "হঁরে শুড়ির দহ' বলিয়া থাকে। হরে শুঁড়ির বাড়ির সামান্য মাত্র ধ্বংসাবশেষ আজো সেই পুরাতন কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

৩। ওলাবিবি—পীরের সমাধি বা অধিষ্ঠিত স্থানকে দর্‌গা বলে। ওলা বিবির দর্‌গা কুশদহে অনেক আছে। তন্মধ্যে গৈপুর গ্রামের উত্তর-প্রান্তে খালের ধারের দরগাটি সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর ১লা চৈত্র হইতে ৩ দিন এখানে মেলা হয়। পূর্ব্বে এই মেলা সামান্য আকারে ছিল। এই মেলার উন্নতিতে ইছাপুরের দোলের মেলার অবস্থার অবনতি হইতেছে। ওলাউঠা বা কলেরার অধিষ্ঠাত্রী ওলাবিবি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সম্মান পাইয়া থাকেন।

৪। বিবিচম্পা—২৪ পরগণার অন্তর্গত দেগঙ্গা থানার অধীন দেউলা গ্রামের উত্তর পূর্ব্ব-প্রান্তে যে একটি বিস্তীর্ণ মাঠ দেখা যায়, তাহাই চন্দ্রকেতু রাজার গড় ছিল। এই চন্দ্রকেতু রাজার সহিত পীর গোরাচাঁদের বিবাদ হওয়ায় চন্দ্রকেতু রাজা সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার কন্যা চম্পাবতী পীর গোরাচাঁদ কর্ত্তৃক কুশদহের অন্তর্গত সাতবেড়িয়ায় আনীত হইয়া বিবি চম্পা নামে অভিহিত হন। সেই সময় হইতে উক্ত সাতবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানকে বিবিচম্পা বলিয়া থাকে।

৫। দক্ষিণ রায়—ইনি হিন্দু হইয়াও পীরের ন্যায় এই দেশে পূজিত হইয়া

আসিতেছেন। রাজা মুকুটরায়ের ইনি ইষ্টদেবতা ছিলেন। ইঁহার বাহন ব্যাঘ্র। এই জন্য ইঁহাকে লোকে ব্যাঘ্র-দেবতা ব'লিয়া থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলে ও হাওড়া জেলায় ইঁহার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। দক্ষিণ রায়ের সহিত কালুরায়েরও পূজা এই কুশদহে অল্প-বিস্তর দেখা যায়। দক্ষিণরায়ের বিশেষ বিবরণ এই 'কুশদহ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন বলিয়া এখানে আর লিখিত হইল না।

পীর হৈদর—গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকট হয়দাদপুর কাছারির পূর্ব্বদিকে কঙ্কনা হ্রদের তীরে পীর হৈদরের আস্তানা। ইনি রাজা রত্নেশ্বরের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

৭। মাণিক পীর—গো-চিকিৎসায় মাণিক পীর সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গোরুর পীড়া হইলে লোকে মাণিক পীরের সিন্নি মানিয়া থাকে। মাণিক পীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে লিখিত হইল ;—

মাণিক পীরের পিতার নাম মনোহর সওদাগর। ইনি বাণিজ্য করিতে যাইবার সময় মাতাকে বলিয়া গেলেন যে, স্ত্রীর চরিত্র-সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেই তাহাকে যেন বনবাস দেওয়া হয়। বাণিজ্যে বহির্গত হইবার ছয় মাস পরে রাত্রি কালে যখন তিনি শয়ন করিয়া আছেন, তখন শুনিতে পাইলেন যে, শুক পক্ষী শারী পক্ষিণীকে বলিতেছে যে, যদি অদ্য এই মনোহর সওদাগরের স্ত্রীর গর্ভ হয়, তবে তাহার গর্ভে একটি পুত্র হইবে এবং সেই পুত্র হাসিলে মাণিক ও কাঁদিলে মুক্তা পড়িবে। আর, এই পুত্র ভবিষ্যতে পীর হইবে। যদি মনোহর সওদাগর আমার পীঠে উঠিতে পারে তবে আমি তাহাকে এই ক্ষণে তাহার স্ত্রীর নিকট লইয়া যাইতে পারি, এবং পুনরায় এই রাত্রের মধ্যেই উহাকে এখানে আনিয়া দিতে পারি। এই কথা শুনিয়া মনোহর সওদাগর পক্ষী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, মুহূর্ত্ত-মধ্যে শুক পক্ষী তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীর নিকট লইয়া গেল ; এবং সেই রাত্রিতেই পুনরায় তাঁহাকে পূর্ব্ব স্থানে আনিয়া দিল। তাঁহার স্ত্রী ঘরের দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়া নিদ্রিত হন। প্রাতে মনোহরের মাতা উঠিয়া পুত্রবধূর গৃহের দ্বার খোলা এবং বধূর অবস্থা দেখিয়া তাহার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাহাকে বনবাস দিল।*

মনোহরের স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক ভ্রমণের পর একটি লোকের

* এমন অস্বাভাবিক কাহিনী মুদ্রিত করার প্রয়োজন ছিল না ; কিন্তু প্রবন্ধের অঙ্গহীন করা অনুচিত বিবেচনায় লেখকের দায়িত্বে ইহা প্রকাশ করা গেল। (সম্পাদক)

বাড়ি আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। এই লোকটির সন্তানাদি না থাকায় তাঁহাকে কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা মনোহরের স্ত্রীর নাম কাঙালিনী রাখিল, কাঙালিনী গর্ভবতী ছিলেন, তাহা তাহারা জানিতে পারিল। সেই স্থানের রাণীও গর্ভবতী ছিলেন। রাজা রাণীকে বলিলেন যে, এবার যদি তোমার কন্যা হয় তবে তোমাকে কন্যা-সহ বনবাসে দিব। রাণী এই কথা শুনিয়া ধাত্রীকে আদেশ করিলেন যে, এই রাজ্যে কে পূর্ণগর্ভা আছে দেখ, এবং তাহার পুত্র হইলে আমার যদি কন্যা হয়, তবে আমার কন্যা রাখিয়া সেই পুত্রকে হরণ করিয়া আনতে হইবে। ধাত্রী অনুসন্ধানে জানিল, কাঙালিনী পূর্ণগর্ভা। এদিকে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোক-পরম্পরায় শুনিল যে, প্রসবের ৬ দিনের রাত্রে কাঙালিনীর পুত্র হৃত হইবে ও তৎস্থানে রাজার কন্যাকে রাখা হইবে। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ৬ দিনের সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শেষরাত্রে নিদ্রাভিভূত হইলে ধাত্রী পুত্রটিকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। প্রভাতে কাঙালিনী যখন দেখিল তাহার পুত্র নাই, তখন শোকে পাগল হইয়া গেল। এই পুত্রটি হাসিলে মাণিক পড়ে ও কাঁদিলে মুক্তা পড়ে। মাণিক রাজার পুত্র হইয়া রাজভোগে লালিত-পালিত হইতে লাগিল। একদিন মাণিক দেখিল, এক পাগলিনী মলিনবেশে ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া বেড়াইতেছে। মাণিক যখন জানিতে পরিল যে, সেই পাগলিনীই তাহার মাতা। তখন সে পাগলিনী মাতাকে রাজার নিকট পুত্র প্রাপ্ত হইবার জন্য নালিশ করিতে পরামর্শ দিল। ঐ নালিশ শুনিয়া রাজা আদেশ করিলেন যে, যাহার স্তনের দুগ্ধ পাথরের দেওয়াল ভেদ করিয়া মাণিকের মুখে পড়িবে, সেই-ই মাণিকের প্রকৃত গর্ভধারিণী। রাণী ও পাগলিনী উভয়ে দেওয়ালের এক পার্শ্বে রহিল এবং মাণিক অপর পার্শ্বে রহিল। রাণীর স্তনের দুগ্ধ অল্প দূর গেল, কিন্তু পাগ্‌লীর স্তন্য পাথরের দেওয়াল ভেদ করিয়া মাণিকের মুখে পড়িল। মাণিক 'পীর' আখ্যা প্রাপ্ত হইল এবং যথাসময়ে ফকির হইয়া দেশত্যাগ করিল।

৮। মুস্কিল-আসান—ইনিও একজন পীর। লোকে মুস্কিলে অর্থাৎ বিপদে পড়িলে ইঁহার সিন্নি মানিলে বিপদ হইতে উদ্ধার হয়। কুশদহের মধ্যে কেবল চারঘাট ও রামনগর প্রভৃতি স্থানে ইঁহার পূজার আধিক্য দেখা যায়।

এইসকল পীর ব্যতীত পীর গোরাচাঁদ, গাজী সাহেব ও একদিল্ সাহেবও বিখ্যাত পীর।

গাজী সাহেবের মেলা ও একদিল্ সাহেবের মেলা ১লা মাঘ হইয়া থাকে। হুগলি জেলায় পাণ্ডুয়ার নিকট গাজী সাহেবের মেলা এবং ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসাতের নিকট কাজী পাড়ায় একদিল্ সাহেবের মেলা হইয়া থাকে।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

চন্দ্রনাথ ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা স্বয়ম্ভু-মন্দিরের অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়া চন্দ্রনাথের দিকে অগ্রসর হইলাম। পথ ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া পাহাড়ে উঠিয়াছে, চলিতে চলিতে শরীর অবসন্ন বোধ হয়। কিছু দূর আসিয়া একটি সোপান, আবার বাম পার্শ্বে একটা পথ দেখা গেল। সঙ্গীগণ বলিলেন, এইপথে বিরূপাক্ষ-মন্দির হইয়া চন্দ্রনাথ দর্শন করিয়া এই সোপান-পথে নামিয়া আসা যায়। তাহাই করা হইল। আমরা বিরূপাক্ষ-মন্দিরাভিমুখে একেবারে সোজা পথে উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম। আরো অনেক যাত্রী আমাদের আগে-পিছে চলিতেছে। ঊর্দ্ধদিকে পথিপার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। পারুল, গাম্ভার, শাল, পিয়াল প্রভৃতি সারবান বৃক্ষ অনেক দেখা গেল। বিল্ব কাঞ্চন শেফালিকা প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষও কিছু কিছু ছিল।

বিরূপাক্ষ-পাহাড়ের মনোহারিত্ব দর্শন করিয়া বাস্তবিক মুগ্ধ হইতে হয়। ইহা যেন সৌন্দর্য্যের পূর্ণ ভাণ্ডার—প্রকৃতি-সুন্দরীর লীলা-নিকেতন। যে-দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে এক অপূর্ব্ব শ্যাম শোভা। অগণিত তরুশ্রেণী যেন একটির পর একটিকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! কি সুন্দর সে মিলন! এক-একটি পুরাতন বিটবী যেন মৌনমুগ্ধ ঋষির ন্যায় স্থির অচঞ্চল-ভাবে বসিয়া আছে। এবং তাহাদের বিরাট বাহু বিস্তার করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকদিগকে স্নিগ্ধ-শীতল ছায়াদানে তাহাদের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। পাহাড়ের উপর অশোক কুঞ্জগুলি দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, তাপসকুমার-দিগের শান্তি-নিকেতনে কে যেন লাল পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে। এখানে ইলেকট্রিক আলো-পাখা নাই—হারমোনিয়মের সুর-তাল নাই, আছে কেবল মেঘ-মুক্ত আকাশ-দীপ্ত শশীকর, দিশাহারা সান্ধ্য সমীরণ, বন-ফুলের সুরভিসঞ্চার, আর

সেই তরুশাখায় মুক্ত বিহঙ্গমের কলকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার ও নির্ঝরের ঝর ঝর রব, প্রাণে বাস্তবিক একটা শান্তি আনিয়া দেয়।

এরূপ খাড়াই পাহাড়ে উঠা সহজসাধ্য নয়। কিয়দ্দূর উঠিলেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়। স্থানবিশেষে এমন ভীষণ পথ যে, যদি কোনোক্রমে পা-সরিয়া যায়, তবে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। নিম্নদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। এই সকল দুরারোহ পার্ব্বত্য পথ অতিবাহিত করিয়া আমরা বিরূপাক্ষ-গিরির শিখরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরটির দরজা দক্ষিণমুখী। এখানে দাঁড়াইয়া পশ্চিম-প্রান্তে চাহিয়া দেখিলাম, এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! বঙ্গোপসাগরের নীল ফেনীল জলরাশি তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাসমান তুলারাশির ন্যায় তটভূমির দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। অদূরে সন্দীপ দ্বীপের শ্যাম শোভাও তরল-শুভ্র রূপালী পাতের ন্যায় ঝিকি-মিকি করিতেছে। তখন শ্রান্ত রবির কনক কিরণ সন্দীপ দ্বীপের তরুশিরে সোনার মুকুট পরাইয়া দিয়াছিল! আশে পাশে হাট মাঠ রেলপথ গ্রাম সমূহ চারিদিকের ফল-ফুলে-ভরা শ্যামল ক্ষেত্রগুলি সোনার কিরণ গায়ে মাখিয়া ঝল-মল করিতেছিল। ম্লান সূর্য্য তখন পশ্চিমাকাশে রক্ত রেখা টানিয়া ধীরে ধীরে সাগর-জলে নামিতেছিল।

এইবার আমারা উত্তর-পূর্ব্বদিকে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এখান হইতে মন্দির দেখা যাইতেছিল। যাত্রিগণের কোলাহল ও তার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগীদিগের হরিনাম কীর্ত্তনের খোল-করতালের ধ্বনি শুনিয়া মনে সহজেই উৎসাহ ও আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। এখন আমরা উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথ পূর্ব্বের ন্যায় তত কঠিন নয়।

চন্দ্রনাথের পুরাতন মন্দিরের ভগ্ন দেওয়ালের নিকট দিয়া বর্ত্তমান মন্দিরে যাইতে হয়। পাহাড় ধ্বসিয়া কোন্ অতল গহ্বরের নিম্নে পুরাতন মন্দিরটির কতকাংশ লইয়া গিয়াছে; নিম্নস্থ অন্ধকার গহ্বরের বৃক্ষাদির অগ্রভাগস্থ শাখা ও পত্রাদির দ্বারা সেখানকার অন্ধকার ও নিবিড়তা আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সকল নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে নূতন মন্দিরের উত্তর ধার দিয়া বারান্দায় উঠিলাম। মন্দিরের দরজা পূর্ব্বধারে; দক্ষিণ ধারেও একটি দরজা আছে। উত্তরাস্য হইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে হয়।

এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। পশ্চিম-দক্ষিণ দিকস্থ লবণময় জলরাশি এবং পূর্ব্বদিকে চট্টগ্রাম জেলাস্থ

অনেক গ্রাম-পল্লী ও মাঠ দেখা যাইতেছে। এইখান হইতে কর্ণফুলী নদী দেখিতে ঠিক যেন একখানা সুদীর্ঘ শাদা মার্কিণ কাপড় বিছাইয়া দিয়াছে; পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের পর্ব্বতশ্রেণীও নিবিড় অরণ্যানী বক্ষে লইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মনে হয় সমুদ্র-সদৃশ অগাধ জ্ঞানের সম্মুখে ইহারা সারি সারি দাঁড়াইয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছে। ইহাদের আবার চন্দ্রনাথ ভূধরই নেতা, তাই তিনি সকলের পুরবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য কল্পনার অতীত। স্বপ্নের অগোচর।

এইবার নামিবার পালা। ঠাকুরের বন্দনা-প্রদক্ষিণাদি সমাপন করিয়া নামিতে লাগিলাম। নামিবার সময় নীচের দিকে পড়িবার ভয়ও কম নহে। শুনিলাম, কয়েকদিন পূর্ব্বে একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে সীতাকুণ্ড দাতব্য-চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা অতি সাবধানে চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর আসিয়া সোপানশ্রেণী দেখিতে পাইলাম। যে-সকল স্থানে উঠা-নামা নিতান্ত দুষ্কর, সেইসকল স্থানে পাকা সোপান বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সোপানশ্রেণী অনেক দিনের হইয়াছে, কিন্তু গাঁথুনি অত্যন্ত দৃঢ়। শুনিলাম, আগরতলার মহারাজার অর্থসাহায্যে এই সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ সীতাকুণ্ড-যাত্রীদের মহা উপকার সাধন করিয়াছেন; নতুবা এই দুরারোহ পর্ব্বতের উপর এইসকল তীর্থদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। ধন্য ভগবানের করুণা। শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমার জীবন-কাহিনী

দেবকুমার দাদা

কাশী হইতে দেবকুমার দাদাকে কয়েকবার পত্র লিখিয়া কোনো উত্তর পাই নাই; এইবার একখানি পত্র লিখিয়া বিশেষ করিয়া জানাইলাম যে, এই পত্রের উত্তর না পাইলে শীঘ্র আমি আপনার নিকট যাইব। কয়েকদিন পরে পত্রের এইরূপ উত্তর আসিল, "ভাই অক্ষয়, তুমি আর পত্র লিখিয়া আমার সংবাদ লইতে চেষ্টা করিয়ো না, এবং তুমি এখানে কদাপি আসিয়ো না, আসিলে বিপদে পড়িবে! মনে করিয়ো আমি পৃথিবীতে নাই।" কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ সকল কথার অর্থ কি? নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে। শীঘ্র হাতের

কাজ শেষ করিয়া কয়েকদিনের জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া নির্ম্মলাকে সকল বুঝাইয়া বলিয়া আমি আসাম যাত্রা করিলাম।

এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে দুঃখে ক্ষোভে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। বুঝিলাম একটি আসামী রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া দাদার চরিত্রের পতন হইয়াছে। দাদার একি পতন! ইনি যে খুব সচ্চরিত্র পবিত্রমনা ছিলেন—ইঁহার এমন চরিত্রদোষ ঘটিল! আমি তো দাদাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত হইলেন কেন? একলা বিদেশে থাকার কি এই ফল হইল! অন্যান্য অনেক রকম দুর্ব্বলতাও ঘটিয়াছে। দাদা এখন আর সে মানুষ নাই। ভগবানের কৃপায়—গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে আমার মনে হইল, মানুষ কেবল বিদ্যা-বুদ্ধি বা বাহ্যজ্ঞান-বলে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। গভীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস ভিন্ন চরিত্র রক্ষা করা বড়ই কঠিন। সৎকার্য্যে উৎসাহী হইয়াও যদি তার সঙ্গে ধর্ম্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তাহারও একদিন পতনের সম্ভাবনা। এখন উপায় কি? দাদাকে পাপ-পথ হইতে কি ফিরাইতে পারিব না?

দাদা আর আমার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহেন না, সর্ব্বদা ব্যস্ততার ভাব দেখাইতে লাগিলেন; দেখিলাম, কাজেও শৃঙ্খলা নাই। বোধ হয় সাহেব আর তেমন সন্তুষ্ট নন, তবে তাঁহার হাতে অনেক কাজ থাকায় সহসা কিছু করিতেছেন না। বোধ হয় পরিণামে কাজ থাকিবে না। এইজন্য আমি চেষ্টা করিলাম, যাহাতে দাদাকে এখান হইতে কলিকাতায় লইয়া যাইতে পারি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ক্ষুণ্ণ মনে আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল।

বাড়ি আসিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কাশীতে আসিয়া গুরু-দেবের নিকট সকল নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন, "প্রার্থনা কর, অবশ্য একদিন সুফল হইবে।"

এই ঘটনার পর সাবেক বাটী হইতে কাকার এক পত্র পাইলাম—কাকী-মা পরলোকগমন করিয়াছেন, কাকারও শরীর ভালো না। আমাকে যাইতে লিখিয়াছেন। আমি গিয়া কাকার অবস্থা ভালো দেখিলাম না, সুতরাং তাঁহাকে ও তরঙ্গিণীকে লইয়া আসিলাম। কাকার বিধবা কন্যা তরঙ্গিণী এখন আর বালিকা নহে। কিছুদিন গ্রামের বাড়িতে রাখিয়া কাকার চিকিৎসা করানো হইল; তারপর কলিকাতায় আসার এক মাস পরে তিনি মারা গেলেন।

এখন তরঙ্গিণী একলা আর দেশে থাকিবে কি জন্য, বিশেষত সে বিধবা। সুতরাং দেশের বাড়ি বিক্রয় করিয়া তাহাকে আমাদের নিকট রাখিলাম। কিছু

দিন কাশীতে আশ্রমে রাখিয়া গুরুদেবের নিকট তাহার শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ হইল। তারপর মধ্যে-মধ্যে সে কাশী ও বাড়িতে নির্ম্মলার সহিত বাস করিতে লাগিল।

এইসকল ঘটনার পর আর একবৎসর গত হইয়া গেল। একদিন আমি দোকানের কাপড় খরিদ করিতে কলিকাতায় আসিয়া অপরাহ্নে কলেজ-স্কোয়ার হইতে উত্তরমুখে যাইতেছি, ঠন্ঠনের কালীতলার নিকট ফুটপাথের উপর সম্মুখে দেখি, একটি ভদ্রলোক লাঠি ধরিয়া আস্তে-আস্তে আসিতেছেন। মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, মুখ বিবর্ণ—কঠিন রোগে দেহভগ্ন। তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া পড়িবার মত হইয়া এক পার্শ্বে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। আমি ভালো করিয়া দেখিলাম ; এ কি দেবকুমার দাদা যে ! তাঁহার এই পরিনাম ! সকলই বুঝিলাম। কিছু দিন বাটীতে সেবা-শুশ্রূষা চলিল, তার পর গুরুদেবের আদেশ-মত যথাসময়ে তাঁহাকে কাশীর আশ্রমে লইয়া গেলাম। গুরুদেবের কৃপায় তাঁহার দেহ রোগমুক্ত হইল! তিনি অবশিষ্ট জীবন সেবা-কার্য্যে অর্পণ করিয়া আবার নবজীবন লাভ করিলেন।

পরিশিষ্ট

নফর কাকাকে দেখিতে দেবগ্রামে গিয়া আবার বড়বাবু—শচীন্দ্রপ্রসাদের স্নেহের বন্ধনে পড়িলাম। কিছুদিন সেখানে থাকিলাম। তারপর তিনি সপরিবারে এবং নফর কাকাও স্বইচ্ছায় ঐ সঙ্গে সপরিবারে কাশীর আশ্রমে গুরুদেবের নিকট আসিলেন। তাঁহারা সকলেই গুরুদেবের দর্শনে পরিতুষ্ট হইলেন। সেই হইতে শচীন্দ্রবাবু কাশীতে একটি বাড়ি করিলেন। সেই বাড়িতে নফর কাকাও বাস করিতে লাগিলেন। নফর কাকার মেয়ের শ্বশুর-বাটীর অবস্থা ভালো ছিল ; সুতরাং সেজন্য তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

অবশেষে আমরা সকলে একটি বৃহৎ প্রেম-পরিবারে গুরুদেবের আশীর্ব্বাদের মধ্যে পরম শান্তিতে জীবনযাপন করিতে লাগিলাম। আমার দুঃখের জীবনে ভগবান্ এমন সুখ-শান্তির পথ রচনা করিয়াছিলেন, তাই আমি আমার জীবন-কাহিনীতে কেবল তাঁহারই মহিমার কথা বলিলাম। সম্পাদক মহাশয়, আপনার কুশদহর পাঠক-পাঠিকাগণ আমার জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া কি মনে করিবেন জানি না।

মাঘোৎসব

—০—

ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য এখন আর কেবল ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ নাই; সকল সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের ভাব গ্রহণ করিতেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসবের কথা বোধ হয় কাহারো অবিদিত নাই; তবে কেহ কেহ জানেন যে কেবল বুঝি ১১ই মাঘই উৎসব হয়; কিন্তু পক্ষকাল-ব্যাপী উৎসব-সংবাদ ব্রাহ্মনামে যাঁহারা পরিচিত নন তাঁহারও জানেন। যাঁহারা হিন্দুনামে পরিচিত এমন বহু সংখ্যক ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি সত্য-সত্যই মাঘোৎসবের জন্য অপেক্ষা করেন। এই উৎসবের মধ্যে স্বর্গীয় সুধা-ধারা বর্ষিত হয়! যাঁহারা তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা তজ্জন্য আবার বর্ষকাল উৎসুক হইয়া থাকেন। যাঁহারা উৎসবে আসিতে পারেন না, তাঁহারা কাগজে ইহার বিবরণ পাঠ করিয়াও আনন্দিত হন।

এবার ৮৬তম মাঘোৎসব হইল। এবারকার উৎসবের মধ্যে সকল উপাসনা, উপদেশ, আলোচনা সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনের মধ্য দিয়া এক মহাবাণী প্রকাশ পাইয়াছে। সে-বাণী শ্রবণ করিয়া পিপাসু আত্মা তৃপ্ত হইয়াছে। স্বর্গের ঈশ্বর পাপী মানুষের নিকট তাঁহার বাণী প্রকাশ করেন, পাপী তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে সক্ষম হয়, এই সুসমাচারই এই নবযুগের একটি বিশেষ বার্ত্তা। যেমন চারিদিকে অবিশ্বাস, সন্দেহ, তেমনই এই সত্যবাণী। ইহা কল্পনা বা অনুমানের বিষয় নহে—একেবারে প্রকাশিত সত্য। কত নর-নারী যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বিশ্বাস করিয়া সকলেই সশরীরে স্বর্গলাভ করিলেন। স্বর্গ তো কোনো স্থান নয়—এই জীবন এবং সংসারই স্বর্গ হইয়া গেল। কেবল বিশ্বাস; কেবল বিশ্বাস! আর কিছু না; বিশ্বাসও তাঁর কৃপা—কৃপা বিশ্বাসের আকারে এবার এসেছে, বিশ্বাসেই বাণী শোনা যায়। একটু কান পাতিয়া থাকিতে হয়, সকল সময়ই সে-বাণী শোনা যায়। আবার বিশেষ বাণীও শোনা যায়। উৎসব একটি বিশেষ সময়। যে উৎসবেও কিছু শুনিল না, সে বড় কৃপাপাত্র। সে-বাণী শুনিয়া বিশ্বাসী সাধক কি সাক্ষ্য দিতেছেন;—

"শোনো বাণী শোনো; পূত হও, পবিত্র হও, ত্যাগী হও, প্রেমে সকলকে আলিঙ্গন কর, আর প্রাণ মন দিয়া প্রভুর পূজা কর, আর দুঃখীর দুঃখ দূর

কর, রোগীর সেবা কর, পাপীকে হাত ধরিয়া তোলো, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও; হৃদয় প্রশস্ত হউক, দৃষ্টি স্নেহে পূর্ণ হউক, বাক্য মধুবর্ষণ করুক, চিত্ত সংযত হউক, ভাষা মিষ্ট হউক, ব্যবহার কল্যাণপ্রসূ হউক।"

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গোবরডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর কঠিন পীড়া হইতে মুক্ত হইয়া গত ৩রা মাঘ কলিকাতা হইতে নিজ নূতন বাসভবনে গমন করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে গ্রামবাসী তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। তিনি পুষ্পমাল্যে সুশোভিত যানে, পতাকা-ধারী ছাত্রবৃন্দ ও ভদ্রমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া গৃহপ্রবেশ করেন। তিনিও এতদুপলক্ষ্যে গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী ও ছাত্রগণকে একটি প্রীতিভোজন দ্বারা হৃদয়ের সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা প্রার্থনা করি, তিনি আরো দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিয়া আপন কর্ত্তব্যপালন দ্বারা ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করুন।

হয়দাদপুর কাছারীর সন্নিহিত পীর হৈদরের একটি পীঠস্থান আছে। বহুদিন হইতে তাহা একপ্রকার জঙ্গলাবৃত হইয়াছিল। আহ্লাদের বিষয়, সম্প্রতি হয়দাদপুরের জমিদার গুণেন্দ্র বাবুর ইচ্ছায় এবং কাছারীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু শিখরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে স্থানটির সংস্কার হইয়াছে অতঃপর যাহাতে একজন ফকির নিযুক্ত হইয়া নিয়মিত সেবাদির কার্য্য চলে তাঁহারা তাহার ব্যবস্থা করিলে আরো ভালো হয়।

শীতের গতি কমিয়া আসিতে না আসিতেই দেশে কলেরা বসন্তের আগমন দেখা যায়। এসময় ম্যালেরিয়ার কবল হইতে লোকে একটু অবকাশ পায় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক আক্রমণ-ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়ার এক প্রধান কারণ জঙ্গল ও মশা। কলেরা এবং রক্তামাশয়ের কারণ নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব। এসকল বিঘ্ন অভাব দূর করা কি অধিবাসিগণের শক্তির অতীত?

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ড দ্বারা কলিকাতা ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট,
প্যারাগণ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।



স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত

U. RAY & SONS. CALCUTTA

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"তোমারি নামে ফুটেছে ফুল
গন্ধে প্রাণ করেছে আকুল,
যতনে গাঁথিয়া এনেছি মালা,
আদর করে' একবার পর না।"

সপ্তম বর্ষ, | ফাল্গুন—চৈত্র. ১৩২২ | ১১শ, ১২শ, সংখ্যা

দাসের প্রার্থনা

হে বিশ্বজননী! আজ তোমার চরণে একটি বিশেষ প্রার্থনা। যিনি "কুশদহ" পত্রিকার আদি প্রবর্ত্তক এবং প্রচারক, যিনি রোগ-ভগ্ন দেহে অশীতিকল্প জীবনে এ পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেছিলেন, আজ তিনি মাটির দেহ মাটিতে রাখিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। পরলোক যেমনই হউক, তাহা তোমার মঙ্গলময়, প্রেমময় ক্রোড় ছাড়া কখনই নহে। সেখানে তোমার প্রত্যেক সন্তানের জন্য স্থান আছে। তুমি তোমার এই সন্তানকে পাঠাইয়া আমাদের দেশের সম্মুখে যে আদর্শ প্রদর্শন করিলে, তাহা কোনো পার্থিব পদার্থের ন্যায় অন্ধকারের অন্তরালে মিশিয়া যাইবার নয়। সত্যনিষ্ঠা, চরিত্র-বল, উদার ধর্ম্মভাব যেখানে যখন ফুটিয়া উঠিবে, তখন সেখানে সেই জীবনাদর্শ সজীব হইয়া উঠিবে, তাহাতে কোনো সংশয় নাই, কেননা জীবন ছাড়িয়া জীবন হয় না। তিনি তো ইহ-জীবনের কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনদ্বারা যদি আমাদের দেশের কোনো প্রকার কল্যাণ হইয়া থাকে তাহা যেন আমরা সরল প্রাণে স্বীকার করিতে পারি তাঁহার প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য আছে তাহা যেন বুঝিতে পারি। তুমিই আমাদিগকে শুভবুদ্ধি ও শুদ্ধচিত্ত দান কর। এবং তোমার সন্তানকে তোমার শান্তি-ক্রোড়ে স্থান দান কর।

স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত

জন্ম—খাঁটুরা গ্রামে, আষাঢ় ১২৪৫

মৃত্যু—কলিকাতা ১৬ই ফাল্গুন, ১৩২২

(বয়ক্রম প্রায় ৭৮ বৎসর)

কুশদহ সমাজের অন্তর্গত খাঁটুরা গ্রামে সুবিখ্যাত দত্ত-পরিবারে মহাত্মা ক্ষেত্রমোহনের জীবন বিধাতার একটি বিশেষ দান। কেবল নিজ স্ত্রী-পুত্রাদি ব্যতীত দেশের এবং দশের জন্য যাঁহারা জীবনযাপন করেন, তাঁহারা তো সাধারণের সম্পত্তি। তাঁহাদের চরিত্র এবং দৃষ্টান্তের দ্বারা জনসমাজ উপকৃত হয়। সুতরাং তাহা দেশের পক্ষে ভগবানের দান ভিন্ন আর কি বলিব। কিন্তু মানুষ আমরা সকল সময় কি ভগবানের দান স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিতে পারি? তবু তিনি যাহা পাঠান তাহা ব্যর্থ হইতে দেন না। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়াও তিনি তাহাকে সফল করেন। এতদিন আমরা যে ক্ষেত্রমোহনের জীবন বুঝিতে চেষ্টা করি নাই, অথবা বুঝিতে পারি নাই; আজ তাঁহার নশ্বর দেহ আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁহার ভিতরকার যে-সুন্দর চরিত্র তাহা ফুটিয়া উঠিতেছে। যদি কিছু দেখিবার বুঝিবার এবং গ্রহণ করিবার থাকে, তবে এখন মৃত্যুই সে সুযোগ উপস্থিত করিয়াছে। তাই আজ আমরা তাঁহার জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তিনি নিজ জীবনী-সম্বন্ধে যাহা নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সুন্দর। আমরা তাহা হইতেও কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী 'কুশদহ'র পাঠক-পাঠিকা এবং বিশেষভাবে স্বদেশবাসিগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

জন্মকাল

রথযাত্রার দিবসে ক্ষেত্রমোহনের জন্ম হয়। অনেকগুলি কন্যার পর এই বিশেষ দিনে এই শিশুর জন্ম হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত খ্যাতনামা কালীকুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার একটি জন্মোৎসব করেন। কথিত আছে, কালীকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র তৎকালে জগন্নাথের রথযাত্রা দর্শন করিয়া বাটীতে আসিয়া এই শিশুর জন্ম সংবাদ শ্রবণ করেন, এজন্য তিনি ইচ্ছা করিয়া শ্রীক্ষেত্র নাম রাখেন।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ক্ষেত্রমোহনের বিদ্যারম্ভ। তৎকালে ও-প্রদেশস্থ তাম্বুলীশ্রেণী ইহার অধিক ইস্কুল কলেজে অধ্যয়নের কোনো আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। তাঁহাদের চিনি ঘৃতাদির ব্যবসায় কার্য্যের পক্ষে উহাই যথেষ্ট ছিল। এমন কি কোনো কোনো নিরক্ষর ব্যক্তিও লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় হস্তাক্ষর এবং শুভঙ্করী অঙ্কের জন্য দশের নিকট পরীক্ষা হইত। তাহাতে গুরুমহাশয়গণ অত্যন্ত গৌরব অনুভব করিতেন। কেবল দত্ত-পরিবারে কালীকুমারের এক পুত্র হারাণচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে হিন্দু কলেজে ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। বাটীর ছেলেদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি পিতা ও খুল্লতাতকে অনুরোধ করিয়া কলিকাতা আহিরিটোলায় শঙ্কর হালদারের লেনে একখানি বাটী ক্রয় করেন।

বিদ্যারম্ভ

পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া ক্ষেত্রমোহন এবং তাঁহার সমবয়স্ক ভ্রাতুস্পুত্র বসন্তকুমার কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ক্ষেত্রমোহনের পিতা বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয় একমাত্র পুত্রকে (তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র যোগীন্দ্রনাথ তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই) লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ছাড়িয়া রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। বিশেষত তাঁহার মনে-মনে আশঙ্কা ছিল, ইংরাজী পড়িলে হয় তো পুত্র খৃষ্টান হইয়া যাইবে। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার অগ্রজ কালীকুমারবাবুর আগ্রহে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন।

ক্ষেত্রমোহনের বয়স যখন ৯।১০ বৎসর তখন বৃহৎ দত্ত-পরিবারের মধ্যে কালীকুমার বর্ত্তমানে তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে প্রসন্নকুমারের মৃত্যু হয়। বাটীতে পরিজনবর্গের চীৎকারস্বরে ক্রন্দন ও এক গভীর হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়। কিছুদিন ধরিয়া সে ক্রন্দনের রোল চলিয়াছিল। সেই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে যেরূপ চিন্তার উদয় হয়, সে সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন ;—

ভবিষ্যদ্দর্শন

"মানুষ হইয়া মরিয়া যাওয়ার সময় সকলকে এইরূপ যদি কাঁদাইতে হয় তবে মনুষ্য-জন্ম কি কেবল আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইবার জন্য ? আমি যখন পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইব, তখন যাঁহারা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন তাঁহারা সকলে আমার জন্যে তো এইরূপ হাহাকার করিয়া কাঁদিবেন। মৃত্যু কেন হইল ? মৃত্যু না হইলেই ভাল হইত। যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন তাঁহারা যখন পৃথিবীতে থাকিবেনা, তখন যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে ভাল হয়। এই চিন্তা যখন হইতে মনের মধ্যে আন্দোলিত হইত তখনই দুঃখ হইত।"

বাল্যকালে বাটীতে থাকিয়া তিনি শুনিতেন, কলিকাতায় জলের উপর দিয়া গাড়ি যায়, তাহার নীচে দিয়া নৌকা যায়, সেখানে সাহেবরা ইংরাজী পড়ায়। এই সকল কারণে কলিকাতা দেখিবার তাঁহার বড় কৌতূহল হইত। এক সময় তাঁহার পিসিমা খাঁটুরার বাটী হইতে শ্বশুরালয় বরাহনগর আগমন করেন। সেখান হইতে কৃষ্ণসখা আশ নামক জনৈক আত্মীয়ের সহিত তাঁহাকে বড় বাজারে তাঁহার পিতার নিকট চিনির গদিতে পাঠাইয়া দেন, এই সময় তাঁহার জীবনে যে বিশেষ ঘটনা হয় তৎসম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন ;—

ভবিষ্যতের আশা

"পাড়াগেঁয়ে ছেলে আমি কখন সহর দেখি নাই, বাগবাজারের পুলের উপর আসিয়া জলের উপর দিয়া গাড়ী, তাহার নীচে দিয়া নৌকা যাইতে দেখিয়া কৌতূহল চরিতার্থ হয়, তাহার পর সহরের বাড়ী গাড়িঘোড়া ও জনতা দেখিতে দেখিতে যখন চিৎপুর রোডে জোড়াসাঁকো আসিলাম, তখন তিনি গাড়ি থামাইয়া আমাকে লইয়া একটা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শেষে জানিলাম, উহা ব্রাহ্মসমাজ। কাষ্ঠের সিঁড়িতে উঠিয়া দেখিলাম, সুন্দর পরিচ্ছদধারী প্রশান্তমূর্ত্তি এক ব্যক্তি সকলকে আস্তে আস্তে আসিতে বলিতেছেন। ত্রিতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম মস্তকোপরি শ্রেণীবদ্ধ সুসজ্জিত আলোকমালা। তন্নিম্নে দুই পার্শ্বে স্তরে-স্তরে শ্রেণীবদ্ধ জনতার শুভ্র বেশ ও মুখমণ্ডল বহুদূর পর্য্যন্ত শোভা করিয়া রহিয়াছে। মধ্যস্থলে সৌম্য মূর্ত্তি পুরুষ সকল গম্ভীরভাবে সমস্বরে সংস্কৃত গাথাসকল উচ্চারণ করিতেছেন। এইসকল দেখিয়া-শুনিয়া মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। মনে হইল এই স্বর্গধাম, মধ্যস্থানে ঐ দেবতাদিগের সঙ্গে একবার বসিতে পারিলে জীবন সার্থক হয়।"

ক্ষেত্রমোহন শৈশবে মাতৃহীন হন। তাঁহার মাতৃদেবী অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন। শিশু ক্ষেত্রমোহন কিছু দিন তাঁহার জেঠাইমার নিকট প্রতিপালিত হন। তাঁহার জ্যাঠা মহাশয় তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনিও তাঁহার অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। বাটীর বালকগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষেত্রমোহনকেই শান্ত শিষ্ট দেখিয়া তিনি বলিতেন, "ইহার দ্বারা আমার বংশের নাম ও গৌরব রক্ষা হইবে।"

জ্যেষ্ঠতাতের ভবিষ্যদ্বাণী

অনতিবিলম্বে পৌত্রমুখাবলোকন-মানসে ক্ষেত্রমোহনের ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ক্রম পূর্ণ না হইতেই তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দেন। ঐ গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু ভগবতীচরণ দের জ্যেষ্ঠাকন্যা সপ্তমবর্ষীয়া কুমুদিনীর সহিত ক্ষেত্রমোহনের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই সম্মিলনের মধ্যে প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম—জগজ্জননীর স্বর্গের দান লুকায়িত

বিবাহ

ছিল তাহা কে জানিত! সাধ্বী কুমুদিনী ক্ষেত্রমোহনের আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে কিরূপ অনুকূল হইয়াছিলেন, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ

তিনি যখন ইস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন একদিন ব্রাহ্ম-সমাজের লিখিত কোনো বিষয় পড়িয়া দেখিতে পান, তাহার মধ্যে এইরূপ লেখা ছিল;—

"মানুষের মৃত্যু হয় না, শরীর বিনষ্ট হয়; কিন্তু প্রকৃত মানুষ যে আত্মা তাহা চিরদিন থাকে।"

ইহার পর তিনি বলিতেছেন;—

"ইহা পড়িয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। বাল্যকাল হইতে মৃত্যু দেখিয়া মনে যে ভয় ও চিন্তা উপস্থিত হয়, অমরত্বের জন্য অন্তর্নিহিত যে এক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা চরিতার্থ হইল। তখন মন বলিয়া উঠিল, ইহাই আমার স্বভাব চায়, ইহা বিশ্বাস করিয়া আমার প্রাণ সুখী হয়। এই সময় হইতে ব্রাহ্ম সমাজের পুস্তকাদিতে আত্মার অমরত্বের বিষয় পড়িতে অনুরাগ হয়।"

তারপর তাঁহার লিখিত জীবনীর মধ্যে আর একস্থানে বলিতেছেন;—

"বাধাবিঘ্নের মধ্যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পড়িতে পড়িতে যখন হেয়ার সাহেবের ইস্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, তখন সিন্দুরিয়াপটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইস্কুলে কতকগুলি সমবয়স্ক ছাত্রের মধ্যে আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। যে-দিন রবিবারে ইস্কুল খুলিবে সেইদিন আমরা জানিতে পারি; বন্ধুগণের মধ্যে কয়েকজনের সহিত বসন্তকুমার ও আমি ইস্কুলে গমন করি। পরে আমাদিগের মধ্যে ব্রাহ্ম আত্মীয়-সভা (ব্রাহ্ম ইন্টিমেট এসোসিয়েসন) নামক একটি সভা স্থাপিত হয়। তাহাতে শিক্ষা, নীতি, ধর্ম্ম, ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য ও স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় স্বাধীনভাবে সমালোচনা করা হইত। এই সভা হইতে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত প্রথমে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।"

১৩১৬ সালের আশ্বিন মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় উহার জন্মোৎসব-উপলক্ষ্যে, এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—

"১২৭০ সালে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, বসন্তকুমার দত্ত, ক্ষেত্রমোহন দত্ত, নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালীনাথ দত্ত, এই কয় মহাত্মার যত্নে ও উদ্যোগে এই পত্রিকার প্রচার আরম্ভ হয়। প্রথমে বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও বাবু বসন্ত-কুমার দত্ত পত্রিকা-পরিচালনের ভার লইয়াছিলেন।"

যুবক ক্ষেত্রমোহন কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া দিন-দিন তাঁহার কিরূপ আশ্চর্য্য আত্মবিকাশ হইতে লাগিল, সে সম্বন্ধে তিনি একস্থানে বলিতেছেন;—

"কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ও (কেশব বাবুর) কলুটোলার বাটীতে সঙ্গতসভায় সভ্য হইয়া যাঁহারা জ্ঞান ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষালাভ করিতেন, তাঁহাদিগের সে শিক্ষা সাধারণ বিদ্যালয়ের

শিক্ষার মত কেবল বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিত না—একেবারে হৃদয় মন প্রাণকে উন্নত করিত। তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যে জ্ঞানলাভ করিতেন এবং সঙ্গতে যে নীতিশিক্ষা পাইতেন, তাহা জীবনে পরিণত করিবার জন্য এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন যে, দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্নের সহিত জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। শির দিয়া তো রোনা কায়া, সঙ্গতের এই মহাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া বীরত্বের সহিত জয়লাভ করিতেন।"

তিনি আর একস্থানে বলিতেছেন ;—

"সত্যের সহায় ঈশ্বর ; আমরা তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া সত্যের সমরে প্রবৃত্ত হইব। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেছি, তাহাই পালন করিব। মানুষ আমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ফলাফল গননা করা অবিশ্বাসের কার্য্য।"

তাঁহার পিতার মনে প্রথম হইতে যে আশঙ্কা ছিল ইংরাজী শিখিলে খৃষ্টান হইয়া যাইবে, এখন এই আশঙ্কা তাঁহার মনে নিঃসন্দেহে ভয়ে পরিণত হইল। পড়িতে দিবেন না সঙ্কল্প করিয়া পুত্রকে বাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই অবস্থায় একদিন তিনি এবং বসন্তবাবু বাটী হইতে বহির্গত হইয়া হাঁটিয়া দত্তপুকুর পর্য্যন্ত আসেন। এই সময় তিনি বলিতেছেন ;—

"কখনো দুই ক্রোশ পথ চলা অভ্যাস ছিল না, একদিন প্রত্যূষে উঠিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত গোপনে কলিকাতা অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। সমস্ত দিন চলিতে চলিতে সন্ধ্যার সময়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া খাটুরা হইতে নয় ক্রোশ রাস্তা—দত্তপুকুরে আসিয়া পৌছিলাম। একটি দোকানদারের ঘরে একখান চেটাইয়ের উপর উভয়ে বিশ্রাম করিতে বসিয়া এমনই নিদ্রাভিভূত হইলাম যে, সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর চৈতন্য হইল না। প্রাতে উঠিয়া একখান পাল্কী ও বেহারা আমাদিগকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত দেখিলাম।"

ক্ষেত্রমোহনের চিত্ত জ্ঞানের সুবিমল কিরণে যখন উন্মুখ হইয়া উঠিল, তখন জ্ঞানানুরূপ কার্য্য করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি স্বভাবত অনুরাগ বশত প্রথমে নিজ পরিবারের মধ্যেই তাহার সূত্রপাত করিলেন। এই হইতে সতী কুমুদিনীর জীবনে যে সুফল ফলিল, তদ্বিরণ কিঞ্চিৎ কুমুদিনী-চরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল ;—

সাধ্বী কুমুদিনী

"বিবাহের কয়েক বৎসর পরে তাঁহার স্বামী স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদরা এবং এক ভ্রাতৃজায়াকে পাঠ বলিয়া দিতেন, সেই সময় কুমুদিনী গৃহের একপার্শ্বে উপবিষ্টা থাকিতেন। স্বামী গৃহ হইতে উঠিয়া গেলে ভগ্নী এবং ভ্রাতৃজায়া যে সকল পাঠ ভুলিয়া যাইতেন তিনি তৎসমুদয় তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, 'আমরা পড়া লইয়া যাহা শিখিতে পারি না, একজন শুদ্ধ আমাদের পড়ান শুনিয়া তাহা শিক্ষা করিয়াছে। তাঁহার এইরূপ স্মরণশক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার স্বামী তাঁহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত

ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের একটি বৃহৎ হিন্দু পরিবার-গুরুজন সকলেই তৎকালে বর্ত্তমান, পল্লিগ্রামবাসী বাণিজ্য ব্যবসায়ী ধনাঢ্য লোক বলিয়া গণ্য ; গুরুমহাশয়ের পাঠশালার শিক্ষা ব্যতীত বিদ্যানুশীলনের প্রতি তাহাদিগের এককালে যত্ন ছিল না। *** পল্লীগ্রামস্থ বৃহৎ হিন্দু পরিবারের মধ্যে থাকিয়া পত্নীকে শিক্ষা দেওয়া তাঁহার স্বামীর পক্ষে সুসাধ্য হইল না। তিনি কেবল আপনার একান্ত যত্ন এবং অধ্যবসায় দ্বারা বিদ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। *** অতঃপর তিনি যখন চারুপাঠ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, তখন প্রচলিত জঘন্য দেশাচারের প্রতি তাঁহার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইল। অল্প দিন মধ্যে তিনি যেপ্রকার সচ্চরিত্রা ও বিশুদ্ধ সংস্কারাপন্ন হইলেন, বাল্যাবস্থা হইতে তরুণ বয়স পর্য্যন্ত রাশি-রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও অনেক পুরুষকে সেপ্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে দেখা যায় না। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ক্রমের পূর্ব্বে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়া অনধিক তিন বৎসর কাল মধ্যে অনেকগুলি সাহিত্য-সংক্রান্ত পুস্তক অধ্যয়ন ও বিশুদ্ধ ভাষায় সুন্দর হস্তাক্ষরে পত্র লিখিতে সক্ষম হন। সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প ব্যাকরণ শিশুপালন এবং বিশিষ্টরূপে ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে তিনি মনোনিবেশ করিতেন। অধ্যয়ন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইল যে, গ্রন্থ অধ্যয়নে যেজ্ঞানলাভ হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে সার্থক, নতুবা নিরর্থক অধ্যয়নে প্রয়োজন কি ? *** জঘন্য দেশাচারের প্রতি তাঁহার যেমন বিরাগ উপস্থিত হইতে লাগিল, পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতিও তৎ সঙ্গে-সঙ্গে অশ্রদ্ধা ও অনাদর এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস উপস্থিত হইল।"

কুমুদিনীর শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল তাঁহার আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারিণী বলিয়া তিরস্কার ও গঞ্জনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ১২৬৮ সালের ১১ই আশ্বিন তাঁহার প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। একমাসান্তে তাঁহার ষষ্ঠীপূজা তৎপরে অন্নপ্রাশনের সময় তাঁহার বিশ্বাসের যে-পরীক্ষা হয়, তাহা কুমুদিনী-চরিত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। এই সময়ের কথা ক্ষেত্রমোহন নিজে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া সতী কুমুদিনী-সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিব।

"অতঃপর তাঁহার একটি পুত্র হইলে একমাসান্তে গ্রামের প্রচলিত প্রথানুসারে চণ্ডীতলায় গিয়া ষষ্ঠীপূজা করিবার উদ্‌যোগ হয়। পুত্তলিকার পূজা করিয়া সন্তানের কল্যাণ প্রার্থনা করা পুত্রমাতার বিশ্বাসবিরুদ্ধ হওয়ায় তিনি তাহা করিয়া কপটাচরণ করিবেন না সঙ্কল্প করিলেন। ইহাতে এমন সংগ্রাম ও পরীক্ষার অবস্থায় তাঁহাদিগকে (স্বামী স্ত্রীকে) পড়িতে হইল যে, এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে মহর্ষি তাঁহার বাটীতে তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য বসন্তকুমারকে পাঠাইয়া দিলেন। এই সংবাদ যখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন জ্ঞাত হইলেন, তখন ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে জ্ঞান ও অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য সাধনচিন্তা তাঁহার মনকে প্রবলরূপে অধিকার করিয়াছিল। তজ্জন্য বক্তৃতা উপদেশ দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি অনুষ্ঠান,-ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে

ছিলেন, ; এমন সময়ে অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গান্ত পুরের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।

কিছুদিন পরে পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত হইল। পৌত্তলিক মতে অন্নপ্রাশন দিতে তিনি সস্ত্রীক অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে এমন নির্য্যাতন পুনরায় আরম্ভ হইল যে, এবার প্রাণের ভয়ে সহধর্ম্মিনীকে লইয়া কলিকাতায় আসিতে হইল।"

পঁচিশ বা ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রমে যৌবনকালে ক্ষেত্রমোহনের স্ত্রীবিয়োগ হয়। তিনি পুনরায় দ্বারপরিগ্রহ করেন নাই।

স্বদেশহিতৈষী ক্ষেত্রমোহন

মানুষের মনে খাঁটী ঈশ্বর বিশ্বাস এবং ঈশ্বর-ভক্তি হইলে সে মানুষ কিছু-না-কিছু পর-সেবায় রত না হইয়া পারে না। বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্তের জীবনী আলোচনা করিয়া



আমরা দেখিতে পাই, তিনি সাধু প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াও তাঁহার সেই সৎ প্রকৃতির বিকাশ হইয়াছিল। যেখানে বাধা উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে প্রকৃতি আরো প্রবল বেগে আপন গতি-অভিমুখে ধাবিত হইয়া খাঁটী বিশ্বাসের ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আবার সেই বিশ্বাসী জীবনের ফল-স্বরূপ তাঁহাকে আজীবন পরদুঃখে দুঃখী করিয়াছিল। তাই তিনি আপন ক্ষুদ্র শক্তি স্বদেশবাসীর সেবায় নিযুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্য্যের আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়, তবে তাঁহার সকল কার্য্যের মূলে ছিল একটি কথা,—'খাঁটী ধর্ম্ম-বিশ্বাস'। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, মানুষকে বিশ্বাসে, প্রেমে, শুদ্ধতায় এবং সৎসাহসে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইলে শিক্ষা তাহার সহায়তা করে! তাই তিনি নিজে খুব উচ্চশিক্ষিত না হইয়াও চিরদিন উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আজীবন খাঁটুরা বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদকতা করিয়া এবং একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ দ্বারা সে বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রমজীবীদিগের জন্য নৈশবিদ্যালয়, দরিদ্র ও ছাত্রগণের সাহায্যার্থে দরিদ্রালয়, যুবকদিগের জ্ঞানোন্নতি ও নীতি চরিত্র গঠনের জন্য পুস্তকালয় ও সংবাদ পত্র পাঠের ব্যবস্থা, সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুস্পাঠী, দেশমত গঠনের জন্য 'কুশদহ' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রচার, যৌবনে ধর্ম্মসংস্কারের সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ এবং ছোট-ছোট বালিকাদিগের জন্য বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন; ফলতঃ নানা উপায়ে তিনি সেই অন্তরের একই ভাব ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কুশদহবাসী বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত 'খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ-কাহিনী' নামক পুস্তকে ক্ষেত্রবাবুর সৎকার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস এবং মতের নিন্দাও করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম ;—

স্বর্গীয় কালীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র ক্ষেত্রমোহন দত্ত কলিকাতা হইতে কুশদহে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া যান। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বসন্তকুমার তাঁহার সহযোগী ছিলেন। খাঁটুরা গ্রামের সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কর্ম্মে ক্ষেত্রমোহন বাবুকে উদ্যোগী দেখিতে পাওয়া যায়। কুশদ্বীপের উন্নতির জন্য 'কুশদহ' নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। "খাঁটুরা বঙ্গবিদ্যালয়" ক্ষেত্রমোহনের যত্নে পরিচালিত গ্রামস্থ বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি কয়েকবার পাঠালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ইত্যাদি

তিনি আর একস্থানে লিখিয়াছেন ;—

" ক্ষেত্রমোহন বাবুর স্ত্রী, বিশ্বাস ও কার্য্যের সামঞ্জস্য দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।"

তারপর গ্রন্থকার সাধুভাষায় দোষের বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছেন। সমুদয় উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। সংক্ষেপে মর্ম্ম লিখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

"ব্রাহ্মদের দোষ এই, তাঁহারা আপন বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করেন। তাঁহারা বলেন, ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দিতে হইবে, কপটতাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না; সমাজের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা উচিত, তাহা তাঁহারা মানেন না। বিশ্বাসানুসারে চলাতে তাঁহারা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা বংশের কোনো উপকার হয় না। স্বানুবর্ত্তিতা খর্ব্ব করিয়া সমাজানুবর্ত্তিতা বৃদ্ধি করা উচিত নতুবা সমাজ তোমার কথা শুনিবে না।

গুরুজন ও সমাজের সন্তোষার্থে ব্রাহ্মেরা আপন বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য করেন না। এজন্য 'কুশদ্বীপ-কাহিনী'র লেখক উপরোক্ত নীতির উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মদের দেশহিতকর কার্য্যসকলের উল্লেখ করিয়া কার্য্যত দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ধনবান ও বিদ্বান লোক বিদ্যমান সত্ত্বেও তিনি অধিকতর দেশহিতৈষী আর কাহাকেও দেখাইতে পারেন নাই। ইহার মূল কারণ এই ঈশ্বরপরায়ণ লোক সকল বিষয়েই কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়। যিনি পিতাকে ভালবাসেন, তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। মনের বিশ্বাস অনুরাগ ও সৎসাহসের অভাবে, কেবল মাত্র বাহিরের বাধা দূর হইলে মানুষ কখনো সৎকার্য্য করিতে পারে না। এই সহজ সত্য যে কেবল পল্লীগ্রামের সামান্য লোকেই বুঝে না, তাহা নহে; অনেক কৃতবিদ্য ভদ্রলোকও বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, বাহিরের লোকবল ও অর্থবল সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। যেন বিশ্বাসের বল ও মনের বল না হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে তদ্বিপরীত দেখা যায়। জ্ঞান প্রেম বিশ্বাস প্রভৃতি মনের মহত্ত্বে মানুষ জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যেসকল মহাকার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার অভাবে কেবল বাহিরের শক্তিতে কখনো সেরূপ কার্য্য করিতে পারে না।

কৃষ্ণনগর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কর্ত্তৃক গোবরডাঙ্গার নাবালক জমিদার (গিরিজাপ্রসন্নবাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃ) গণের অভি-ভাবক (গার্জ্জেন) নিযুক্ত হন। রামতনুবাবু গোবরডাঙ্গায় অবস্থিতিকালে সর্ব্বদা খাঁটুরা দত্ত-বাটীর ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত সকল বিষয় যোগদান করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ

প্রদান করিতেন। একজন বিজ্ঞ প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চিরপ্রচলিত জাতি এবং কুসংস্কার অগ্রাহ্য করিয়া যুবক ব্রাহ্মের সহিত সকল বিষয়ে যোগদান করিতেছেন, ইহা পল্লীগ্রামের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। তাঁহার এইরূপ কার্য্য দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইত। কিন্তু তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশত নিন্দা-সূচক কোনো কথা কেহ ব্যক্ত করিতেন না। যেরূপ লোক কখনো উপাসনায় যোগ দেন নাই, এমন কৃতবিদ্য ও পদস্থ লোক তাঁহার আহ্বানে সে সময়ে উপাসনায় যোগ দিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কারাপন্ন হিন্দুদিগের সহিত ব্রাহ্মদিগের বিচ্ছিন্ন ভাব ছিল, রামতনুবাবু সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের বাটীতে গিয়া উদারভাবে মিশিয়া তাঁহাদিগের সদ্ভাব আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সে-সময়ে ক্ষেত্রবাবুর সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীগণের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লিখিত হইল।

খাঁটুরা নিবাসী সুবিখ্যাত কথক ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে শ্মশান ঘাটের একটি ঘটনাসূত্রে দুর্ণাম "সুলভ সমাচার" সংবাদ পত্রে বাহির হয়। কথক মহাশয় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন, সুলভ সমাচার ব্রাহ্মদিগের কাগজ, নিশ্চয়ই এ লেখা পাঠানো ক্ষেত্রমোহনের কাজ। এই ধারণা করিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন ক্ষেত্রমোহনের মস্তক ছেদন করিবেন। অবশ্য ক্ষেত্রবাবু এই কথা শুনিয়া ভয়ে সাবধান হইলেন, এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, ঐ লেখার বিষয় তিনি কিছুই জানেন না। তখন ধরণী কথক মহাশয় সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলেন, "ব্রহ্মজ্ঞানী কখনই মিথ্যা কথা বলে নাই।" আর একটি ঘটনা ;—

খাঁটুরা-নিবাসী ৺দ্বারকানাথ আশ ধনবান সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে কথাবার্ত্তার মধ্যে বলিতেন, "তোমাদের ধর্ম্মমত যাহাই হউক, তোমরা যে সত্যবাদী হইয়া যৌবনকালে ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পার, ইহা তো সামান্য কথা নয়। আশ মহাশয় ক্ষেত্রবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা বশত অনেক সময় ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় আসিতেন।

বসন্তকুমার

পরিবার-মধ্যে ক্ষেত্রমোহন ও বসন্তকুমারের মত সৌহার্দ্দ আর কাহারো ছিল না। একত্র বাস, একত্র আহার, একত্র বিচরণ, একত্র ধর্ম্মসাধন, সমস্তই এক ছিল। এমন একতা ও অভিন্নতা ঐহিকার্থে প্রায় দেখা যায় না। পরমার্থই ইহার মূল ছিল। বিধাতা বসন্তকুমারকে তাঁহার পরম সুহৃদ ও সহায় করিয়া দিয়াছিলেন।

ক্ষেত্রমোহন পিতার নিকট হইতে যখন বিষয় পান নাই, তখন বসন্তকুমার

খুল্লতাতদিগের নিকট হইতে কিছু বিষয় পাইয়াছিলেন। ক্ষেত্রমোহনকে কোনো অভাবের কষ্ট তিনি বুঝিতে দেন নাই। তাঁহার অর্থের সকল অভাব তিনি মোচন করিতেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর বসন্তকুমার ক্ষেত্রমোহনের সহিত অভিন্নহৃদয় হইয়া সকল বিষয়ে তাঁহার সুহৃদ ও সহায় ছিলেন। পরে বসন্তকুমারকে চিকিৎসা ব্যবসায়ের জন্য কলিকাতা হইতে দূরে অবস্থিতি করিতে হইল। সেই-সময়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র ও তাঁহার পরম বন্ধুগণের সংসর্গ ছাড়িয়া নানাপ্রকার লোকের সঙ্গে তাঁহার মিশিতে হইত। বসন্তকুমার স্বভাবতই অত্যন্ত উৎসাহী, উদ্যমশীল ও কার্য্যতৎপর; কিন্তু সুখ-স্বচ্ছন্দতাপ্রিয় ও আমোদ-প্রমোদ-বিলাসপরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্রিয়সুখপ্রিয় বিলাসী ধনী লোকদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তিনি চিরদিনের ধর্ম্মসাধন ও ব্রাহ্ম বন্ধুগণের সংসর্গ হইতে স্বতন্ত্র হইতে লাগিলেন। পাপ পিশাচ সেই সুযোগ পাইয়া তাহার মোহিনী মূর্ত্তি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল। বহু বৎসর ধর্ম্মসাধন সাধুসঙ্গ ও ব্রহ্মোপাসনা করিলেও মানুষের পতন হয়। ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়া সর্ব্বক্ষণ জীবনযাপন করিতে না পারিলে কেহই একেবারে নিরাপদ হইতে পারেন না। সকল ধর্ম্মসমাজেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্ষেত্রমোহন যখন বসন্তকুমারকে হারাইলেন, মঙ্গলময় বিধাতা তখন লক্ষ্মণ-চন্দ্রকে আনিয়া তাহার স্থান পূরণ করিলেন। মাতুল ক্ষেত্রমোহনের সহিত ভাগিনেয় লক্ষ্মণচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের কিরূপ বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তাহা "স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র আশের জীবন-চরিত" পাঠ করিলে জানা যায়।

পিতাপুত্রে পুনর্মিলন

ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিন্নতা বশত পিতা কর্ত্তৃক একসময় নিপীড়িত হইয়া ক্ষেত্র-মোহন অনেক দুঃখক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, যথাসময়ে সেই পিতার মনে পুত্রের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার সকল দুঃখনিরারণ হইয়াছিল।

ক্ষেত্রমোহন বিমাতার প্রতি অতি সদ্ব্যবহার করিতেন। বৈমাত্রেয় ভাই-ভগ্নী-দিগকে সহোদর-সহোদরার ন্যায় ভালবাসিতেন। যখন বিষয়-বিভাগ লইয়া জ্যেষ্ঠতাত ও তাঁহার পিতার বিবাদ-কলহ হয়, তজ্জন্য ক্ষেত্রমোহন অতিশয় দুঃখপ্রকাশ করিতেন। তিনি পরিবারের মধ্যে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন। পারিবারিক, সামাজিক ও বৈষয়িক সকল বিষয়ে তিনি আপন বিশ্বাসানুসারে ন্যায় এবং সত্য রক্ষা করিতেন; কাহারো অনুরোধ বা সমাজের নিন্দা অপবাদ ভয়ে কখনো বিশ্বাসবিরুদ্ধ কপটাচরণ করিতেন না। তাঁহার

পিতা যাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, তিনি দেখিতেন, তাহারাও ক্ষেত্রমোহনকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে।

পরিবারস্থ ছেলে-মেয়েদের পুত্রের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া এবং জমিদার প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের নিকট পুত্রের আদর-সম্মান ও প্রশংসার কথা শুনিয়া তাঁহার পিতার চিত্তাকাশে গভীর বিষাদ-অন্ধকারের মধ্যে সুখময়ী উষার বিমল প্রভা গোপনে দেখা দিতে লাগিল। তিনি সময়ে-সময়ে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিলেন, "আমার এক কলসী দুধে একটু গো-চোনা পড়িয়াছে।" একসময় যে পুত্রকে ত্যজ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য একটি ভূসম্পত্তি পর্য্যন্ত হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, শেষে সেই পুত্রের সদ্ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ মতবিভিন্নতা সত্ত্বেও ক্ষেত্রমোহনের হস্তেই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি, পরিবার এবং নাবালক পুত্র যোগীন্দ্রনাথের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছিলেন।

পীড়ার সময় ক্ষেত্রমোহন পিতার নিকট গিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি যখন তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেন, তখন তাঁহার পিতা বলিতেন, "এখন আর আমার কোনো অসুখ নাই।" সে-সময় ক্ষেত্রবাবুকে কেহ ডাকিলে, তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিতেন, "ও যতক্ষণ আমার কাছে থাকে ততক্ষণ আমি ভাল থাকি, অন্যে গায় হাত বুলাইলে আমার অমন ভাল লাগে না।"

শেষ কথা

দেশহিতৈষী ধর্ম্মপ্রাণ ক্ষেত্রমোহনের জীবন-চরিতে নিতান্ত উল্লেখযোগ্য আরো অনেক বিষয় আছে, কিন্তু এই প্রবন্ধে স্থানাভাব বশত সেসকল বিষয় উল্লেখ করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। এখন তাঁহার শেষ জীবনের দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

শেষ বয়সে নানা কারণে অধিকাংশ সময় তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেন। তথাপি মধ্যে মধ্যে খাঁটুরায় আসিয়া খাঁটুরা ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ, ইস্কুল পরিদর্শন, বাটীতে আত্মীয়গণের এবং গ্রামস্থ সকলের সংবাদ লওয়া তাঁহার নিয়মিত কার্য্য ছিল। যখন আর একেবারে দেশে আসিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন, তখনো দেশের ইষ্ট-চিন্তায় দেশের কথায় কতই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ব্রহ্ম-মন্দির-সংক্রান্ত গোলযোগে পড়িয়া বৃদ্ধ বয়সে কত ক্লেশ পাইয়াছিলেন। একে-একে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-বিরহিত হইয়া, ভগ্নদেহে অর্থ-

কৃচ্ছ্র অবস্থায় কত দিন কাটাইয়াছেন, কিন্তু কখনো কিছুতেই তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস ও সত্যনিষ্ঠার ব্যতিক্রম কিম্বা মনে শান্তির অভাব দেখা যায় নাই। দেহত্যাগের ২।১ মাস পূর্ব্বেও দৈহিক উপসর্গ সত্ত্বেও তিনি যেপ্রকার শান্ত সমাহিতভাবে ছিলেন, তাহা দেখিয়া কাহারো কাহারো মনে সম্ভাব উপস্থিত হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে পরলোক-সম্বন্ধে সুগভীর বিশ্বাসের কথা সকল বলিয়াছিলেন। সে-সময় তাঁহার আত্মীয় স্বজন যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন, তাঁহারা তাঁহার সেই শান্তভাব দেখিয়া অন্তত ক্ষণকালের জন্যও যেন মৃত্যুর বিভীষিকা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

তিনি দেশের জন্য দুঃখ করিয়া শেষ জীবনে যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"দুঃখের বিষয়, এত বৎসর গত হইল তথাপি স্থানীয় লোকের মন সেরূপ উন্নত হয় নাই। স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় কুমুদিনীর ধর্ম্মবল পরীক্ষার স্থান খাঁটুরা চণ্ডীতলায় উপাসনা হইয়া থাকে। তাহাতে পুরুষদিগের মন কোনরূপ আকর্ষণ ও অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। বরং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কিছু কৌতূহল ও উপাসনার প্রতি অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের হইাতে যোগ দিবার ক্ষমতা না থাকায় মনের ভাবও ব্যক্ত করিতে পারেন না।"

তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন ;—

"সময়ের স্রোত এখন যেরূপ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মের সাত্ত্বিক ভাব দেখা যায় না। বিশ্বাস প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রকৃত ভাবের প্রতি নিষ্ঠা নাই। কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান আমোদ প্রমোদ ও আড়ম্বরই ধর্ম্ম হইয়াছে। চরিত্র যাহাই হউক, যখন যে-বিষয় ধর্ম্মের নাম করিয়া সকলে মত্ত হয়, সেই গণ্ডগোলে মিশিলেই ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে গণ্য হওয়া যায়। যাহাতে সত্যানুরাগ, বিশুদ্ধ জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম, সাধন এবং ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হয়, সে পথ কেহ আশ্রয় করিতে চাহে না। আত্মশুদ্ধি আত্মোন্নতি ও অধ্যাত্মপূজার আয়োজন নাই। বাহিরে সমারোহ পূর্ব্বক বাহিরের পূজা-অর্চ্চনা অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরপূর্ণ নাম কীর্ত্তন—স্বীয় নাম ধাম প্রচারই পূজার উদ্দেশ্য—ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া সমাজ আত্মপ্রতারিত। হিন্দু সমাজকে বর্ত্তমান দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবনের শিক্ষা আবশ্যক। ভারতের ভবিষ্যৎ আশা কৃতবিদ্য যুবকগণ যদি প্রকৃত ব্রাহ্ম জীবন দেখাইতে পারেন, তবেই সর্ব্বত্র ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতিতে ভারতের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে।"

যুগান্তর

—ঃ*ঃ—

গ্রামের ইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় এফ্-এ পড়িবার জন্য আসিলাম। পাড়াগেঁয়ে ছেলে বলিয়া ভয়ে-ভয়ে থাকিতাম। কাহারো সঙ্গে তেমন মিশিতাম না। কেবল ক্লাশে যাইয়া শান্ত-শিষ্ট হইয়া পড়া-শুনা করিতাম। আমাদের বাসায় অর্থাৎ মেসে আমার সমপাঠী কেহ ছিল না। কেহ বি-এ, কেহ এম-এ, কেহ মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। ২।১টি আপিসের কেরাণীও আমাদের মেসে থাকিতেন। অমৃতলাল নামক একটি যুবক কোনো আপিসে চাকরি করিতেন। আমি যে-ঘরে থাকিতাম তিনিও সেই ঘরে থাকিতেন। অমৃতলাল শান্ত বিনয়ী নম্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন। আমি যে-সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময় কলিকাতায় শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একদল মদ্যপায়ী উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী, একদল বিনয়ী নম্র শান্ত ছিল। শান্ত প্রকৃতির লোকগুলির মধ্যে অমৃতলাল একজন। অমৃতলাল প্রায়ই রবিবারে সন্ধ্যার সময় মেসে থাকিতেন না। একদিন আমি অমৃতলালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি রবিবারে কোথায় যান ? তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমি কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে যাই। সেই সময় কেশবচন্দ্র সেনের খুব নাম, চারিদিক হইতে দলে-দলে শিক্ষিত যুবকগণ কেশবচন্দ্র সেনের দলে মিশিয়া নানাপ্রকার সৎকার্য্যে উৎসাহের সহিত লাগিয়াছে। এই ঘাত-প্রতিঘাতে নব্য যুবক ও প্রাচীন রক্ষনশীল দলের সঙ্গে মহাসংঘর্ষ উপস্থিত হইল। নব্য তন্ত্রীরা বাল্য-বিবাহ জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ; আর রক্ষণশীল দল তাহাতে বাধা দিতে লাগিল। আমি সেই সময়ে উন্নতিশীল যুবকদলে মিশিয়া এইসকল কাজে যোগ ও যাহাতে জীবনে এইসকল পরিণত করিতে পারি তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কেশববাবুর দলে মিশিয়া যেন একটা নূতন জীবনের সূত্রপাত হইল।

২

বলা বাহুল্য আমি পূর্ব্ব বঙ্গের লোক। ঢাকা জেলার কোনো পল্লীগ্রামে আমার বাস। আমার পিতা একজন সামান্য-রকমের জমীদার এবং আমিই তাঁর একমাত্র পুত্র ও আমার একটি কনিষ্ঠা ভগ্নী মাত্র। সে বাল-বিধবা, তাহার বয়স ১৪

বৎসর মাত্র। পিতা খুব গোঁড়া হিন্দু অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বোক্ত রক্ষণশীলদলের লোক। আমাদের স্বগ্রামে আমাদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। আমি যে কলিকাতায় এই প্রকারে উন্নতিশীল দলে মিশিয়াছি, এ-কথা আমার পিতা-মাতা জানিতেন না, কেবল মাত্র আমার বিধবা ভগ্নীকে মধ্যে-মধ্যে যে-পত্র লিখিতাম তাহাতে কতক কতক আভাস দিয়াছি মাত্র। বলা বাহুল্য আমি দুই বৎসরের মধ্যে একবারও বাড়ি যাই নাই, পরীক্ষা দিয়াও বাড়ি যাইবার তত ইচ্ছা ছিল না। নানাপ্রকার সভা-সমিতির কাজে দিন-রাত্রি পরিশ্রম করিয়াও কাজ ফুরাইত না। আমার বন্ধু অমৃতলাল সকল কাজেই আমাকে উৎসাহিত করিতেন, প্রায় সকল কাজই তাঁর পরামর্শমত করিতাম। পরীক্ষার পর বাবার পত্র পাইলাম, আমাকে বাড়ি যাইতেই হইবে। সুতরাং রেল ষ্টীমার নৌকা ইত্যাদির সাহায্যে বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথম ২।৪ দিন কাটিয়া গেল, ক্রমে গ্রামের যুবক-দলের সঙ্গে মতের সংঘর্ষ হইতে লাগিল। ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হইতে লাগিল, আমি খৃষ্টান হইয়াছি। ক্রমে পিতার কানেও এ সকল কথা উঠিল।

৩

বাবা আমাকে কোনো কথা বলিলেন না। তিনি একটি বয়স্থা সুন্দরী পাত্রীর জন্য নানা দিকে ঘটক পাঠাইতে লাগিলেন। পাত্রীর অভাব হইল না। আমাদের গ্রামের নিকটেই ১টি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির হইল। আমি শুনিয়া চিন্তিত হইলাম, বাবা একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, রঙ্গলাল, তোমার বিবাহ নালন্দা গ্রামের গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয়া কন্যা লীলা-বতীর সহিত স্থির করিয়াছি। আগামী কল্য কন্যাপক্ষ তোমাকে দেখিতে আসিবেন। আমি কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাইলাম না। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! ধীর-নম্র-ভাবে বলিলাম, আমি এখন বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি নাই; বি-এ, পাশ করি তারপর বিবাহ করিব। বাবা এ প্রকার উত্তর আমার কাছ থেকে আশা করেন নাই। বাবা বলিলেন, রঙ্গলাল, লেখা পড়া শিখিয়া কি পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ভাল? আমি কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া বলিলাম, এখন বিবাহ করিলে পড়া-শোনার ব্যাঘাত হইবে, সেইজন্যই এখন বিবাহ করিতে চাই না, আপনিও এ-বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন। বাবা আর কোনো কথা না বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। এ বিপদে কার কাছে পরামর্শ গ্রহণ করিব, অমৃতলাল নিকটে নাই যে তাহার কাছে পরামর্শ গ্রহণ করিব।

যথাসময়ে গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী দুইজন লোক-সহ আমাদের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবা আমাকে পরিষ্কার কাপড় পরিয়া থাকিতে বলিয়া দিলেন। আমি অনিচ্ছা মতে তাঁর আজ্ঞা পালন করিলাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন বাবা আমাকে বলিলেন,—রঙ্গলাল, কাপড় পরিয়া আমার সঙ্গে এস। আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া বাবার সঙ্গে নালন্দা গ্রামে গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তীর বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের সঙ্গে চিন্তাহরণ নামক আমার একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন। চিন্তাহরণ এনট্রেন্স পাশ করিতে না পারিয়া দুইবৎসর যাবত বাড়িতেই বসিয়া আছে, বাবা চিন্তাহরণকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন, এতক্ষণ আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ি আসিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দেখিয়া আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। আমি অকূল ভাবনায় পড়িলাম। শেষে চিন্তা-হরণকে আমার মনের কথা বলিলাম। চিন্তাহরণ আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন, এখন তোমার বাপের মুখের উপর কোনো কথা না বলিয়া কন্যা দেখিয়া বাড়ি গিয়া তোমার মাকে সব কথা বলিলেই তোমার অভীষ্ঠ সিদ্ধ হইবে। আমি আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিশেষ আয়োজন করিয়া আমা-দিগকে আহার করাইলেন। তাঁহার আদর-যত্ন বিনয় শিষ্টাচার বড়ই মধুর বোধ হইল। অপরাহ্ন ৩টার সময় কন্যা লীলাবতীকে আমাদের সম্মুখে আনা হইল। যথারীতি কন্যা দেখা হইল। কন্যা সুন্দরী হইলেও আমি কোনো মতামত প্রকাশ করিলাম না। চিন্তাহরণ আমাকে বার বার মতামতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেও আমি ভাল মন্দ কোনো কথা বলিলাম না। সেইদিন অপরাহ্নে আমরা বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

৪

যথাসময়ে শুভদিনে লীলাবতীর সঙ্গে আমার শুভ-পরিণয় হইয়া গেল। আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইল। অমৃতলালের পত্রে জানিলাম আমি প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছি। এই সংবাদে বাড়িতে একটা খুব উৎসব পড়িয়া গেল। দুই চারিদিন পরে আমি বি-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। কলিকাতায় আসিয়া আবার যুবকদলের সঙ্গে মিশিয়া নানাপ্রকার সৎকাজে প্রবৃত্ত হইলাম। এ দুই বৎসরের মধ্যে আমি আর বাড়ী যাই নাই। আমার বড় শালী মধ্যে-মধ্যে পত্র লিখিতেন। লীলাবতীকে পত্র লিখিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, আমি তাঁর পত্রের উত্তর দেওয়া

৩

ছাড়া আর কিছুই করিতাম না। যথাসময়ে বি-এ পরীক্ষা দিলাম, পিতা ঠাকুর বাড়ি যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। নানা ওজোর করিয়া বাড়ি গেলাম না। যথাসময়ে দক্ষতার সহিত বি-এ পাশ করিলাম। এবং এম্-এ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পরীক্ষার আর একমাস বাকি আছে, এমন সময়ে বাড়ির সংবাদ আসিল, বাবার কঠিন পীড়া। পত্র পাইয়া আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ি আসিলাম। ডাক্তার কবিরাজ চিকিৎসা করিল। রোগের উপশম না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার শ্বশুরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চিকিৎসার জন্য বাবাকে কলিকাতায় আনিলাম। সঙ্গে আমার মাতাঠাকুরাণী, বিধবা ভগ্নী ও লীলাবতী। একখানি বাড়ি ভাড়া করিয়া চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু কোনো ফল হইল না। বাবা চিরদিনের জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত-ধামে চলিয়া গেলেন। অমৃতলাল বাবার চিকিৎসার সময় ক্রমাগত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পরেও সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে এম-এ পাশ করিয়া কোনো কলেজে প্রফেসারি পদে নিযুক্ত হইলাম। লীলাবতী ও বিধবা ভগিনী মোক্ষদার শিক্ষার ভার কখনো নিজে কখনো অমৃতলালের হাতে সমর্পণ করিলাম। প্রতি রবিবার লীলাবতী ও মোক্ষদাকে ব্রাহ্ম-সমাজে লইয়া যাইতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল। মোক্ষদার সঙ্গে অমৃতলালের বিবাহ, আমার উপবীত ত্যাগ, এইসকল লইয়া দেশে নানাপ্রকার হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।

শ্রীরসিকলাল রায়।

প্রেরিত প্রচারক

সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

আজ আর একটি সাধু জীবনের সমাচার দিতেছি। গত ২০শে মাঘ ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি কে, আমাদের দেশের জন্য ইনি কি করিয়া গেলেন? এখানে আমাদের দেশ বলিতে, কেবল পল্লীগ্রাম বা বঙ্গদেশ বলিলে চলে না, তাঁহার ভিতর হইতে যে জিনিয বাহির হইয়াছে, তাহা সমগ্র মানবজাতির সম্পত্তি বলিলেও বলা যায়। সুতরাং তিনি পৃথিবীর জন্য কি

করিয়া গেলেন এই কথাই আজ জিজ্ঞাসা করিবার দিন। এই মহাত্মার নাম ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, সাহিত্য-জগতে ইনি চিরঞ্জীব শর্ম্মা নামে খ্যাত।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন উপাসনা, প্রার্থনা, বক্তৃতার ভিতর দিয়া যখন নিত্য নূতন অধ্যাত্ম-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহযোগী ত্রৈলোক্য-নাথ তাঁহার ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া সেই তত্ত্ব সকল সঙ্গীতের দ্বারা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল রচনাগুণে এই সঙ্গীত হয় নাই; ইহা দেবপ্রসাদে দৈব-শক্তির ফল-স্বরূপ। সঙ্গীতের সংখ্যাও বড় কম নয়, সহস্রাধিক হইবে। এক ভক্ত রামপ্রসাদে এই জাতীয় শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। আজ বঙ্গসমাজে সকল সম্প্রদায়ের নিকট যে ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনের সমাদর দেখা যায়, তাহার অধি-কাংশ চিরঞ্জীব শর্ম্মার রচিত। তাঁহার সঙ্গীত অনাবিল স্রোতের ন্যায়।

তারপর তাঁর গ্রন্থাবলীর পরিচয়ও সামান্য নয়। তাঁহার ঈশাচরিত পাঠ করিয়া আমার মত কত বঙ্গীয় যুবকের প্রাণে বিকৃত খৃষ্টানী মতের পরিবর্ত্তে ঈশার পবিত্র জীবন-ছবি—ঈশার প্রেম, ও ত্যাগ বৈরাগ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সংখ্যা কোথায়। তাঁহার ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা (জগদীশ্বরবাবুর "চৈতন্যচরিত" শিশিরবাবুর "অমিয়নিমাই চরিত" তখনো হয় নাই) শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে বৈষ্ণবনামের অরুচি দূর করিয়াছে; গৌরাঙ্গসুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ফিরাইয়া আনিয়াছে। তাঁহার বিধানভারত—হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কবিত্বের সঙ্গে প্রেম-ভক্তি মিশাইয়া আর এক গাছি নূতন মালা বাঙালীর গলায় পরাইয়া দিয়াছে। তাঁহার কেশবচরিত, সাধু অঘোরনাথ কি সুন্দর! যাহা পাঠ করিতে করিতে অশ্রুজল সম্বরণ করা যায় না। তাঁহার নববৃন্দাবন নাটক—যাহার প্লট কেশবচন্দ্রের, রচনা চিরঞ্জীবের, আবার তাহার অভিনেতা কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র,—বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত। তাঁহার ইহকাল-পরকাল, বিংশ শতাব্দী, কলিসংহার যুগলমিলন, ব্রহ্মগীতা, পথের সম্বল -কতনাম করিব? আধ্যাত্মিক সাহিত্য-জগতে তাঁহার অতুল কীর্ত্তি! কিন্তু তাঁহার গান তাঁহার সংকীর্ত্তন, যাহা সম্পদে-বিপদে, দুঃখে-শোকে, সকলের মনে শান্তি দিতে পারে, তাহার তুলনা কোথায়! তাই আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত মহাশয়ের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়। "ভক্ত রামপ্রসাদের সকল গান জানা নাই, তথাপি তিনি অমর; চিরঞ্জীবের সহস্র সঙ্গীত আমাদের নিকট রহিয়াছে, তাহার ভাষা ভাব ও সুকোমল ভক্তি জগৎকে মুগ্ধ করিবে! কোথা হইতে আসিল সে ভাষা, বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও লালিত্যপূর্ণ, সে কল্পনা

সে কবিত্ব। ধন্য কেশবচন্দ্র, ধন্য করুণাময়ী বিধানজননী, যিনি এমন লোক দিয়া মহাপুরুষ গঠন করিলেন। সেই চিরঞ্জীবেরই ভাষায় বলিতেছি, 'তোমার দয়াল নামের এমনি গুণ, অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবা গীত গায়, বধির শোনে। শুষ্ক তরুচয় মুঞ্জরিত হয়। ঠিক তাহাই সম্ভব হইয়াছে।"

তিনি আত্মজীবনী সম্বন্ধে ইংরাজীতে কিছু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার ভাব হইতে তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃত করা হইল,—

ইংরেজী ১৮৪০সালে অক্টোবর মাসে নবদ্বীপের নিকট চকপঞ্চানন গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতার নাম রামনিধি সান্ন্যাল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠিতে তিনি কর্ম্ম করিতেন। অবস্থা ভাল ছিল না। গ্রাম্য পাঠশালায় দুইজন গুরুমহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন শেষ, ১৬ বৎসর বয়সেই বিবাহ। শ্বশুর এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ১৮ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি বলিতেছেন,—এইবারে উদরান্নের জন্য বিষয়কর্ম্ম করা প্রয়োজন হইল। বাল্যকাল হইতেই দেখি সন্ন্যাসী হইবার সাধ প্রবল। গেরুয়াবসন পরিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে এক প্রবল ইচ্ছা। প্রথমবারে এই ইচ্ছা-বশে দুইটি বন্ধুর সহিত বাটীর বাহির হইলাম। জামালপুরের নিকট আসিয়া দুইজন বেহারী জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া ও নানারূপে কষ্ট পাইয়া কয়েক দিনের মধ্যে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

ঘরে ফিরিয়া ব্রাহ্মণের ছেলে, সন্ধ্যা গায়ত্রী বিগ্রহাদির সেবায় মন দিলাম। তারমধ্যে রামমোহন রায়ের সঙ্গীত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিতাম। সেইসময় একবৎসর কলিকাতায় বাস করি। আদি ব্রাহ্মসমাজে গোপনে যোগ দিতাম, সেখানে প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুর গান, সভ্যদিগের সুকান্তি এবং সমাজের উপাসনা-পদ্ধতি প্রাণকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

এইবার বিদেশে কিছুদিন চাকরি করিতে হইল। হঠাৎ খবর পাইলাম মার মৃত্যু হইয়াছে। সেই থানেই প্রচলিত-প্রথা-মত মার শ্রাদ্ধ করিলাম।

দেশে ফিরিলাম। গ্রামের লোক বলিতে লাগিলেন মায়ের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। আমি বলিলাম, কতবার করিব, তাঁহারা ছাড়িবার পাত্র নন। অগত্যা রাজি হইলাম। কাল শ্রাদ্ধ। সংবাদ পাইলাম, 'নিকটবর্ত্তী শান্তিপুর গ্রামে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আছেন। অকূলে কূল পাইলাম, ভোর হইতে না হইতেই একেবারে ২০ মাইল রাস্তা চলিয়া শান্তিপুরে হাজির। বিজয়বাবু গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দিয়া গৃহে স্থান দিলেন। বিজয়বাবুর নিকট কয়েকদিন পরে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলাম।

গ্রামে ফিরিলাম। রামনিধির পুত্র ঘরে ফিরিয়াছে, গলায় পৈতা নাই, কি সর্ব্বনাশ! একদিন এক শ্যালক অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া মহা গালাগালি ও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শেষে এই বিধর্ম্মীর ঘরে তাঁহার ভগ্নীকে রাখা অনুচিত মনে করিয়া, একখানি ডুলি আনিয়া তাঁহার ভগ্নীকে লইয়া গেলেন। একটি বিধবা ভগ্নী গতিক দেখিয়া অন্যত্র আত্মীয় স্থানে গেলেন।

এইবার শান্তিপুরে গিয়া দেখি বিজয়কৃষ্ণসহ, অঘোরনাথের মিলন। তিনজনে বাহির হইলাম। প্রথমে বাগআচড়ায় আসিলাম। এখানে শিক্ষকতা আর নিজে পড়া বাংলা, আর একটু একটু ইংরেজী। ১৮৬৫।৬৬ সালে অঘোর নাথ সহ ঢাকায় আসি। এখানে ব্রাহ্ম স্কুলের শিক্ষকতা করি। তারপর অঘোরবাবুসহ প্রচারযাত্রা। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেট, কাছাড়, কুমিল্লা, চেরাপুঞ্জি পাহাড়, ঢাকা, ফরিদপুর ভ্রমণ করি। বিজয়বাবুর অসুখ সংবাদ পাইয়া ডাক-রাণার সহ ঢাকা আসি। তারপর ১৮৬৭ সালে ব্রহ্মানন্দ সহ মিলন। এইবার যেন জলের মাছ জলে পড়িলাম। তাঁহার প্রকৃতির সহিত আমার প্রকৃতির ঠিক আশ্চর্য্য মিল ছিল, যাহা তাঁহার অন্তরে প্রকাশ হইত আমারও তার অনুরূপ ভাব মিলিত।" ইহার পর জীবনের কথা আর তিনি নিজে কিছু লেখেন নাই।

তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি বন্ধু যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "কেবল পাঠশালার শিক্ষামাত্র সম্বল লইয়া ত্রৈলোক্যনাথ যখন দিনাজপুরে ৬৲ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তথায় গমন করিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ চাকুরী ছাড়িয়া বিজয়ের সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। যে-অবস্থায় ছিলেন, তাহা হইতে উচ্চতর জীবন লাভের জন্য প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা হইল, তাই পূর্ব্ব জীবনে ধিক্কার দিয়া তিনি কেশবচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। কেশবের ন্যায় হৃদয়দর্শী দেখিলেন,এই যুবার মধ্যে যে সরলতা ও প্রতিভা আছে তাহাতে কালে ইনি এক অদ্বিতীয় লোক হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ তাঁহার এমন একটি গুণ ছিল, যাহা কেশবের নিজস্ব প্রয়োজন। ইঁহার কণ্ঠস্বর জগতকে মুগ্ধ করিবে বুঝিয়াই তিনি তাঁহাকে সমাদরে আশ্রয় দিলেন।"

———

দুঃখে আরম্ভ, আনন্দে শেষ

ভগবান্ মঙ্গলময়, এ বিশ্বাস অনেকের আছে। "ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য" এ কথাও অনেকের মুখে শোনা যায়। সমস্ত জীব-জগতের স্বভাব লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, যাহা সুখকর তাহাই জীব চায়, দুঃখকর কেহ চাহে না। যাহা ভাল তাহাই মঙ্গল, যাহা মন্দ তাহারই নাম অমঙ্গল, ইহাই অধিকাংশের বিশ্বাস।

যাহা মন্দ—যাহা দুঃখের কারণ তাহা না চাইলেও তবু তাহা আসিবেই, কেহই দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

দুঃখ আমাদের পাপের ফলেই আসুক বা বিচিত্র জগত-বিধানুসারেই আসুক, প্রতেক জীবের নিকট দুঃখ আসিবেই। দুঃখের হাত এড়াইবার কাহারো হাত নাই। যে দুঃখ আমারা চাই না, তাহা আমাদিগকেও ছাড়ে না এ রহস্যের মূল কোথায়?

ভগবানকে আমরা মঙ্গলময়, আনন্দময় বা সুখ-স্বরূপ বলি, তিনিই কি আমাদের অমঙ্গল বা দুঃখদাতা। কিম্বা দুঃখ কেবলই আমাদের পাপের ফল-স্বরূপ।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে গেলে আমাদের দুঃখের মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

দুঃখের মূল তিনটি। (১) শারীরিক ব্যাধি হইতে (২) মনুষ্য এবং ইতর প্রাণীর দ্বারা। (৩) মানসিক বিকার জনিত। কিন্তু তিনটি কারণের কার্য্য হয় একমাত্র মনে। এজন্য মনই দুঃখের মূল কারণ বলিলেও দোষ হয় না।

দুঃখিত হই তখনই, যখন আমাদের অভিষ্ট পূর্ণ হয় না। সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হইলে আমাদের ইষ্ট এ কথা কে বলিতে পারেন? তবু অভীষ্ট ছাড়িতে কে চায়? এই স্বভাব মানব-শিশু হইতে আরম্ভ। ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য হইলেই শিশু কাঁদে। কিন্তু সকল ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া শিশুর পক্ষে মঙ্গল-দায়ক নহে, এ কথা যদি সর্ব্ববাদীসম্মত হয়, তবে অনন্তজ্ঞানময় মঙ্গলময় ভগবানের নিকট আমরা প্রত্যেকেই ত মানব-শিশু, সুতরাং মানবশিশুর সকল

ইচ্ছাই কি পূর্ণ হওয়া উচিত? কিন্তু কার্য্যত আমরা কি ভাবে চলি? ভাল মন্দ যাহাই হউক আমরা ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই ব্যস্ত। কোনো বিষয় বিফল হইলেই একেবারে হতাশ অবসন্ন অস্থির হইয়া পড়ি। এখানে কেহ বলিতে পারেন, আমাদের ইচ্ছা পূরণের দিকে যদি একটা গভীর আবেগ না থাকে, তবে আমরা কঠিন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব কিরূপে? কিন্তু কার্য্যতা দেখা যায়, আবেগ যতই থাক, সকল ইচ্ছা পূর্ণ কখনই হয় না। ভগ্নমনোরথ মানুষ কত অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। নিরাশ-ভগ্ন-চিত্তে কৃত মানুষ একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। আবার এক শ্রেণীর বিশ্বাসীমানুষ, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে যথোচিত প্রয়াস পাইয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াও তাহার মধ্যেও মঙ্গল দর্শন করিয়া আস্বস্ত হন। ইহাই বিশ্বাসীর লক্ষণ। মঙ্গলময় ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাসীমানুষ কামনা চরিতার্থ করিতে লালায়িত হইতে পারেন না, কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছা পালন করিতেই ইচ্ছা করেন। বিনা দুঃখে ঈশ্বর-ইচ্ছা পালন করা যায় না। তাই তাঁহাদের জীবনে ঐ "বাইবেল-বর্ণিত প্রবচনটি পূর্ণ হইতে দেখা যায়। "চক্ষের জলে বপন কর, আনন্দে শস্য কর্ত্তন করিয়ো।"

বিশ্বাসী মানুষ কর্ম্মযোগ সাধনার প্রারম্ভে অনেক দুঃখ-ক্লেশ বোধ করেন বটে, কিন্তু মঙ্গলময়ের কৃপায়, বিশ্বাসের বলে মানব জীবনে মঙ্গলস্বরূপের গূঢ় লীলা-রহস্য দর্শন করিয়া, শেষে সকল সুখ-দুঃখ হর্ষ বিষাদ-মঙ্গল অমঙ্গলের সমাধান করিয়া আনন্দেই কার্য্য শেষ করিতে সক্ষম হন। তাই দেখা যায়, ভক্ত বিশ্বাসীর জীবন দুঃখে আরম্ভ আনন্দে শেষ। কিন্তু সন্দেহবাদী অবিশ্বাসী অভক্ত জীবন দুঃখে বা অনিত্য সুখে আরম্ভ হইলেও শেষে দুঃখের যবনিকা টানিয়া মৃত্যুর ঘন আঁধারের মধ্যে অবসান হয়। বিশ্বাসী ভক্ত মানুষ, মৃত্যুঞ্জয় হইয়া ইহলোকের পরপারে ঊষার নব আলোক দর্শন করিতে করিতে আনন্দেই ইহ-জীবন শেষ করেন। মঙ্গলময় বিধাতা জীবের অবিশ্বাস দূর করুন।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৬ই ফাল্গুন সোমবার খাঁটুরা দত্ত-বাটীর বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় কলিকাতা সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ভবন হইতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল হইতে বাতরোগে

অপটুদেহে অবস্থিতি করিয়া ক্রমে ক্রমে যেন পরলোকের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। মৃত্যুর জন্ম এমনভাবে প্রস্তুত হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এবারকার কুশদহে তাঁহার শেষ অবস্থার একখানি চিত্রসহ তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল।

গত ৫ই, ৬ই, ৭ই চৈত্র খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬ই রবিবার দিবস প্রাতে বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্তের সমাধিস্থাপন—তাঁহার চিরপ্রিয় স্থান খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির-প্রাঙ্গণে হইয়াছে। অপরাহ্নে খাঁটুরা স্কুলগৃহে তাঁহার একটি স্মৃতিসভার অধিবেসন হয়। তাহাতে গোবর-ডাঙ্গার দেওয়ান বাটীর বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় উকীল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা হইতে আগত ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ ও আরো ২।৩টি প্রচারক এবং স্থানীর বাবু খগেন্দ্রনাথ পাল, কবিরাজ কালীপদ বিশারদ, অধ্যাপক মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতির্ম্ময়, কুশদহ-সম্পাদক, এবং সভাপতি মহাশয় ক্ষেত্রবাবুর জীবনী উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী ১৩২৩ সালের কুশদহে "কুশদহ-পঞ্জী" শিরো নামে ধারাবাহিকরূপে একটি বিষয় প্রকাশ করিকার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। তাহাতে কুশদহ-অধিবাসিগণের নাম ধাম, কে কোথায় কি কার্য্যোপলক্ষ্যে অবস্থিতি করেন এবং তাঁহাদের বংশাবলী—পুত্র-কন্যা পৌত্র-দৌহিত্রাদির পর্য্যন্ত বিবরণ-সহ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সমাবেশ থাকিবে। কিন্তু বিষয়টি যে-প্রকার গুরুতর এবং শ্রমসাধ্য তাহাতে কুশদহ-বাসিগণের একান্ত আনুকূল্যের প্রয়োজন। সকলে যদি নিজ নিজ বিবরণ লিখিয়া পাঠান তবেই আমরা এ-কার্য্যে সাফল্যের আশা করিতে পারি। বিবরণী-মধ্যে যদি কেহ কাহারো ফটো দিতে চান, তবে তাহা লিখিয়া জানাইলে তাহারো ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু—সম্পাদক।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট,
প্যারাগন প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।